সমান্তরাল

সান্ত্বনা মজুমদার

সুবর্ণরেখা
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড । কলকাতা ৯

প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২

প্রকাশক : শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার
সুবর্ণরেখা । ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড । কলকাতা ৯
মুদ্রক : শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দ প্রেস । ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট । কলকাতা ৬

আমার সেজদা শ্রীসঞ্জীব দত্তকে

১

টিচার্স রুম মানেই টিপ্পনী। ছুটির পর আজ সেদিকে না মাড়িয়ে সোজা রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। তাড়াতাড়ির দিন। হোস্টেলে ফিরে আবার বেরোতে হবে। মমতা আমায় ডেকে পাঠিয়েছে। দুদিন আগে তাড়াহুড়োর তোড়ে চিঠিটা মোক্ষদা এনে দিয়েছিল, কার চিঠি, কোথাকার, দেখার সময় ছিল না। কেননা, তক্ষুনি, মিনিট পাঁচেক আগে, রানাঘাট থেকে ফিরেছি। প্লেন থেকে নেমে সোজা রানাঘাটে মার কাছে চলে গিয়েছিলাম। রাত্তিরেই ফেরার ইচ্ছে ছিল! কিন্তু মা কি ছাড়ে? বিশেষ করে ছোটোমামা। তারই মাশুল দিতে হচ্ছিল তখন। চান খাওয়া শাড়ি ব্যাগ নিয়ে হিমসিম। স্কুলের সময়, তার উপর বছর দেড়েক বাইরে কাটিয়ে সময়ের জ্ঞানটা আবার তখন আমার বেজায় টনটনে। চিঠি দেখার সময় কোথায়? না তাকিয়েই মোক্ষদাকে ব্যাগে ফেলে দিতে বলেছিলাম। কাল ঐ ব্যাগে হাত পড়ে নি। আজ ব্যাগ হাতড়াতে চিঠিটা উঠে এসেছে, খুলেই চমকে উঠলাম, মমির চিঠি: 'দেখা করিস, ভয়ানক জরুরি!'

গেটের পাশে চন্দনা দাঁড়িয়েছিল। গাড়িতে উঠতে যাবে, আমায় দেখে একবার ইতস্তত, তারপর ডাকল, 'দিদিমণি আসবেন?'

ভদ্রতার ডাক। হেসে এড়াতে হয়। আমার তবু কী হল, গা ঝাড়া দিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলাম।

দেড় বছর পর মমিকে দেখব, কেমন দেখব? এতদিন একবারও এ কথা ভাবি নি। গাড়ি থেকে নেমে হোস্টেলের দোরে দাঁড়িয়েও তাই ভাবছিলাম, কী জানি দেখব! দমকা দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে যেতে মনে হল, যাঃ! চন্দনাকে তো কিছুই বলা হল না। এতক্ষণ একসঙ্গে ছিলাম, ছিঃ একটাও কথা বলি নি, ও কী ভাবছিল? হঠাৎ এমন করে কেনই বা ডেকেছিল? ডাকতেই গাড়িতে উঠে বসব, এমনটা কি ভেবেছিল? কী ভেবে মমিই বা আমায় ডেকে পাঠিয়েছে? দেখা করিস, ভয়ানক জরুরি। অনাড়ম্বর, সম্ভাষণহীন মিনতি ভরা শুধু চারটে শব্দ এ কেমন? এ আমার চেনা মমি কি? আমার চেনা মমি, লাফাতে লাফাতে কলেজে এসে ঢুকত। ঢুকেই আবদার, 'যাবি মেট্রোয়? ছবি দেখে আসি।' হাত টেনে বলত, 'চল ট্রামে চেপে চক্কর মেরে আসি'। আর

লক্ষ্মী মেয়ে যেদিন কলেজে রইল, গান গেয়ে হুল্লোড় করে চারটে বাজিয়ে দিল। সে ছটফটে মেয়ে আজ এত সংক্ষিপ্ত! এত মিনতি ভরা! এত দ্বিধাগ্রস্ত। এমনিতেই যে আমি যেতাম, এমনিতে যে যেতে হত না-ডাকতেই, মমি কি এ সহজ কথাটাও ভাবতে ভুলে গেল?

যাক গে। অবান্তর ভেবে লাভ নেই। সময়ও নেই। অনেকদূর যেতে হবে, গেট পেরিয়ে তাড়াতাড়ি হোস্টেলের সিঁড়িতে পা রেখেছি, কলঘর থেকে বালতি হাতে মোক্ষদা বেরিয়ে এল। সামনে পেয়ে গেলাম, বাঁচা গেল, আজ আর ওর ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে হবে না। একটা কথা বললে, একবার ডাকলে, হাজার কথার পাহাড় করে তুলবে, এমনি যার ধারা তার কাজের ফুরসৎ কোথায়? তার তত্ত্বাবধানে আমরা শুধু তার কাজের ছিটেফোঁটার ওপর বেঁচে আছি।

বললাম, 'মোক্ষদা আজ আমায় একটু তাড়াতাড়ি চা করে দেবে, এক্ষুনি বেরুব?' বলেই, উত্তরের সুযোগ না দিয়ে ঘুরে ওপরে উঠে গেলাম। ঘরে ঢুকে ব্যাগ রেখে, বালিশটা ঠিক করে সোজা বাথরুমে। দু মিনিটে বেরিয়ে আলমারি খুলে হলদে রঙের একটা শাড়ি পাট ভেঙে পড়ছি, মোক্ষদা চা নিয়ে এল।

চায়ে চুমুক দিতে জগৎ খুলে যায়। পাড়টার ওপর নজর পড়ল। খয়েরি হলদেতে জড়িয়ে আঁশ পাড়। সারা গায়ে খয়েরি টিপ্। চমকের ছোপ।

পুজোর কাছাকাছি মাসিমা ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রঙ বেরঙের শাড়ি ছড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোনটা তোর পছন্দ অদিতি?'

মমি সামনেই দাঁড়িয়েছিল। হাটু ভেঙে প্রায় লম্বা হয়ে শুয়ে খাটের ওপাশ থেকে এই শাড়িটা টেনে বের করল।

'ওকে জিজ্ঞেস করছ মা? তবেই হয়েছে, বলতে হয় আমাকে বল!'

মাসিমা হাসছিলেন, 'বাহাদুরি রাখ মমি, ওকে পছন্দ করতে দে।'

মমি ততক্ষণে শাড়ি আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে। ঠোঁট উল্টে বলল 'হুঁঃ! অদিতি করবে পছন্দ, ও কি শাড়ির মর্ম বোঝে? তুমিই বল, এর চেয়ে ভালো ওকে কোন শাড়িতে মানাবে? কালো মেয়ে, গায়ে একটু আলো লাগুক। তাই না মা?'

পিছিয়ে ঘাড় কাত করে মমি আমায় দেখছিল। হঠাৎ সুর করে গেয়ে উঠলো 'মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে?'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম; 'বাঁশি ডাকল কোত্থেকে?'

মমির কী হল, দমকা আমায় জড়িয়ে ধরে, কানে ফিসফিসিয়ে উঠল, 'আহ, আমার পীতাম্বর !'

মাসিমা হেসে বললেন, 'ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, তুই এইটে নে অতু।'

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কাপ রেখে শাড়িটা খুলে ফেললাম। শাদা আটপৌরে একটা শাড়ি টেনে, যেমন তেমন গায়ে জড়িয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

পরেশনাথের পরের স্টপ। নেমে সামনের গলিতে ঢুকে এগুচ্ছি। দেড় বছর পর এদিকে আসা। বিশেষ কিছু বদলায় নি। কোণের বাড়িটার লাল রকে সেই বুড়ো ভদ্রলোক তেমনি বসে আছেন। চোখ বোজা, ঘাড় ফেরালাম। তাকিয়ে আছেন। চলে গেলে এমনি তাকিয়ে থাকবেন, আগে নয়। নাম দিয়েছিলাম পরাঙ্ক। আমি তখন লুকিয়ে একটু আধটু লিখি। বৃদ্ধের গোপন দৃষ্টি বুঝতাম। লুকোচুরিতে আমার সহানুভূতি ছিল।

সামনে মোড় ফিরতেই ঢালা মাঠটা। মাঠে এখনও বেশ আলো। অনেকগুলো বাচ্চা বল নিয়ে ওদিকে একসঙ্গে জড়িয়ে ছুটছে। বেপরোয়া, তবু একটা রেখায় গিয়ে থেমে যাবে। খেলা, তবু কেমন ধাঁধা লাগে। যদি তা না হত, যদি বাঁধ না মানত, তবে মাঠের শেষ মাথায়, মমিদের বাড়ির খোলা গেট পেরিয়ে একদঙ্গল ছেলে কোথায় হারিয়ে···

গেট দিয়ে ঢুকছি। আগে রোজই এ সময় বাগানে মালি কাজ করত। আজ দেখছি, গেটে, বাগানে কেউ নেই। সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে কড়া নাড়লাম। ভেতরে হাসির হুল্লোড় চলছিল. দুড়দাড়. দৌড়ে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল।

রীনা !

অবাক, ঠোঁটের ফাঁকে অন্ধকার, চোখ খোলা রীনা তাকিয়ে আছে। এক মুহূর্ত। তারপরই মুখের ভাঁজ ভাঙতে শুরু করল। সূক্ষ্ম ছোটো ছোটো কুঞ্চন আর ঢেউ থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ধীরে ধীরে স্থির টান টান হয়ে এল। আমি দেখছি তিন বছর আগের আর একটি মুখ। মাসিমার মৃত্যুর পর দিন কয়েক মমির মুখোশ ! দেড় বছরে রীনা অনেক বড়ো হয়ে গেছে।

বললাম 'অতুদিকে ভুলে গেছিস রীনা ?'

দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, বলল, 'না অতুদি।'

'তবে ?' এবার বড়ো বড়ো চোখ দুটোয় জল ভরে এল। মুখ ঘুরিয়ে নিজেকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। পিঠটা কাঁপছে। জানি আমাকে দেখে দিদিকে আবার আঘাত নিয়ে দেখছে।

কাছে গিয়ে পিঠে হাত রাখলাম, 'মমি কোথায় ?'

আঙুল বাড়িয়ে বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা ঘর দেখিয়ে দিল। আশ্চর্য, জানার কথা ছিল, মমির সাবেক ঘর।

বসার ঘরে একদঙ্গল মেয়ে। এখন জটলা ছেড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কোথাও কোনো আওয়াজ নেই। গামলা হাতে মমির ঘর থেকে মাঝবয়সী এক মহিলা বেরিয়ে, এদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে পেছনের দিকে চলে গেল। বারান্দা পেরিয়ে মমির ঘরে যাচ্ছি, রাঁনা তার আগেই ছুটে দরজায় গিয়ে জানাল, 'দিদি অতুদি এসেছে।'

আধ ভেজানো দরজা খুলে দাঁড়ালাম। ডেটলের ঝাঁঝ নাকে এসে লাগল। ঘরের মেঝে তখনও ভেজা, শুকোয় নি।

মমি দু কনুই খাটের দুপাশে চেপে চাড় দিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করছিল। আমাকে দেখে তাড়াহুড়োয় হয়তো একটু বেসামাল হয়েছিল। ডান দিকের কনুই চেপে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেও কাত হয়ে সেদিকে এলিয়ে পড়ল। আমি ছুটে গেলাম, অজান্তে মুখ দিয়ে অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে গেল। মমি কিন্তু ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। একটু স্থির হয়ে কনুই ছেড়ে এবার হাতের চেটোতে চাপ দিয়ে হাতটা সোজা করতে লাগল, পিঠ টেনে তুলল। উঠে বসল। দু হাতের তেলো খাটে চাপা। শরীরের ভারসাম্য হাতের চেটোয়, বসে টেনে টেনে নিশ্বাস নিচ্ছে। খানিকক্ষণ জোর নিশ্বাসের পর ডান হাত দিয়ে পা দুটো টেনে কোলের কাছে জড়ো করল, হাতের পাতা শরীরের পেছন দিকে খাটে চেপে কোমর থেকে নীচটাকে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে টেনে খাটের মাথায় নিয়ে হেলান দিয়ে বসাল। এতক্ষণ পর এইবার ও আমার দিকে ফিরল।

দেখছিলাম। যুক্তি নেই, তবু মনে হয় কারো একজনের ক্ষতি যেন সমস্তকে নির্বিশেষে দায়ী বলে চিহ্নিত করে। যেন এ সকলের দোষ। এ মুহূর্তে আমার এ'ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটাও যেন অন্যায়।

মমি তাকিয়ে হাসছিল। কী বলবে হয়তো মনে মনে খুঁজছে। চিঠি দিয়েও প্রস্তুত হয় নি। বললে, 'তুই ফর্সা হয়ে গেছিস।'

প্রশংসা না পরিবর্তনের কথা? যেন একটা নিষ্ঠুর ইঙ্গিত হাসি দিয়ে চাপা দেয়া। অনেক জল গড়িয়ে গেছে, অনেক সাঁকোর নীচ দিয়ে, শুধু এখানে মমির পায়ের তলায় এসে, সব স্রোত স্থির, সব স্রোত স্থবির। এই দেড় বছরের আমার হৈ হৈ জীবন, ছুটিতে কন্টিনেন্ট ঘোরা, উইক এণ্ডে দল বেঁধে পিকনিক,

সব আমায় এখন আষ্টে পৃষ্ঠে চেপে ধরেছে। গলা বুজে আসছে। এক ঘূর্ণমান জগতের হাওয়া গায়ে জড়িয়ে, একই জায়গায় দাঁড়ানোর ভানে. একই ভাবে দাঁড়ানোর ভানে যেন ওকে দেখছি। প্রতারণা দিয়ে ওর অসাড়তা উপলব্ধি করছি।

হেলান দিয়ে বসা, মমি যোগ করল, 'কি রে, কথা বলছিস না যে? গল্প কর, ওদেশ কেমন লাগল বল!'

দরজার পাশে দেয়াল বরাবর চারপেয়ে একটা কাঠের ফ্রেম দাঁড় করানো। ওপরে লম্বালম্বি দুটো লোহার রড দেখছিলাম। মমির কথার টানে ফিরলাম। বিছানায় পাতা ওর পা দুটোর ওপর চোখ পড়ল। পাশাপাশি লম্বা সোজা করে ফেলে রাখা দুটো পা।

মমিই আবার জের টানল, 'কী দেখছিলি, প্যারালাল বার? ব্রেস পরে আমি ঐ বারে হাঁটি; মানে লাফাই। চেয়ারটা টেনে এখানে বোস দিকিনি! গল্প বল, বিলেতের গল্প।' ও কোণের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল।

ঘরটা অনেক বদলে গিয়েছে। রীনার খাট নেই। জায়গাটা ফাঁকা। সুইচ বোর্ড নীচে নামানো। ইলেকট্রিক তারের মোড়কে ঘরের রং অনুপস্থিত। কেসিং-এর এখানে সেখানে কাঠ হাঁ করা, তার খোলা, দেয়ালে আশেপাশে এবড়ো খেবড়ো হাতের দাগ, রংচটা ড্রেসিং টেবিলের পাশে চাকাওয়ালা একটা চেয়ার। ওদিককার দরজার পাশে টানা দেয়াল ঘেঁষে ওর সেই প্যারালাল বার। পাশে লোহার ফ্রেমে তৈরি কোমর থেকে দুটো পা। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো পা।

চোখ আটকে গেল। শরীরের একটা অংশ আলাদা করে এত যে বীভৎস, তা জানতাম না।

ঘরে আমি আর মমি। কিন্তু ঐ জুতোসমেত পায়ের ফ্রেম দুটো এমন করে দাঁড়িয়ে আছে, আমার সব কথা বন্ধ করে দিচ্ছে। চোখ টেনে আটকে রাখছে।

মমতাও ওদিকে তাকাল। 'কী দেখছিস? আমার ব্রেস? ঐ লোহার ফ্রেম পড়ে আমি সোজা হয়ে দাঁড়াই, প্যারালাল বারে এক্সারসাইজ মানে এমাথা ওমাথা করি। এসেছিস যখন সবই দেখতে পাবি। থাকগে ওসব কথা। এখন বোস তো। আজ তোকে ছাড়ছি না। প্রতাপ এলে খাওয়া দাওয়ার পর তোকে পৌঁছে দেব।'

আজও মনে মনে ও আমায় পৌঁছে দিচ্ছে। এমনি কত রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর রীনাকে লুকিয়ে আমরা গিয়ে গাড়িতে বসতাম।

বসেই মমি প্রতাপকে তাড়া দিত, 'প্রতাপ জোরে! ঐ গাড়িটা দেখতে পাচ্ছ না? ব্যাটা পালাচ্ছে!' ঝুঁকে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। 'প্রতাপ প্রতাপ আরো জোরে···যাঃ! তুমি কোনো কাজের নও!'

প্রতাপ স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে হাসত। 'মাকে শুধাব দিদি। মা বললে তবে রেস লাগাব।'

এবার মমি গম্ভীর। যেন গলায় আদেশও। 'তবে এখন ওয়েলিংটন হয়ে চলো তো।'

আমরা ক্রীক রো ধরে পার্কের কোণে দোতলা বাড়িটা অবধি গিয়ে ফিরে আসতাম।

'ওপরে গেলেই পারতিস? আমি না হয় গাড়িতে বসতাম।'

'ওপরে যাব বলে তো আসি নি।'

'তাহলে কি পাহারা দিচ্ছিস?' একদিন মুখ ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে ও সোজা হয়ে চোখ তুলে ধরল। 'ছিঃ! তোর মন এত নোংরা!' বলে হয়তো অনুতাপ হয়েছিল। পরে জবাবদিহির সুরে বলেছিল, 'কাউকে তো ভালোবাসলি না অদিতি কী করে বুঝবি?'

আমি কেমন ছোটো হয়ে গিয়েছিলাম। না-ভালোবাসার অপমান আমি মানি নে; তবুও।

চুপচাপ তেমনি দাঁড়িয়ে আছি। সেই মহিলাটি এসে ঘরে ঢুকল। মাঝ বয়সী, শাদা থান পরা থমকানো একটি মুখ। কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা ড্রেসিং টেবিল থেকে চিরুনি তুলে নিল, খাটের কাছে এল, বলল, 'এদিকে ফেরো চুল বেঁধে দি।'

মমি জানাল, 'এই দিদিমণি খাবেন; তুমি ঠাকুরকে বলে এসো, সুমতি।'

আমি ঠিক স্বাভাবিক হতে পারছি না। ওকে থামিয়ে বললাম, 'আজ থাকুক মমি। আমায় একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

এক ঝটকায় ওর চোখ আমায় দেখে নিল। সরে গেল। আবার ফিরে আমাকে স্থির ধরে রাখল। অনুচ্চ, ধীর স্পষ্ট বললে, 'তোদের অনেক কাজ থাকে, অদিতি।' যেন অন্য কেউ অন্য কাউকে বলল। অন্যস্বর।

চমকে থেমে গেলাম।

অরুণার চিঠিতে মাস ছয়েক অবধি ওর একটু আধটু খবর পেতাম। বিশেষ কিছু লিখত না, লেখা সম্ভবও ছিল না। আমার হোস্টেলের মেয়ে, মমিদের

বাড়ি আসা যাওয়া নেই। উড়ো উড়ো কারো কাছ থেকে যতটা জেনেছে, আমাকে জানিয়েছে। রীনাকে অনেক চিঠি দিয়েছি, জবাব পাই নি। তারপর নিজের কাজে, নতুন জায়গার আমেজে, ঝামেলায়, সব ঠিক আছে বলে নিশ্চিন্ত ভুলে ছিলাম। সেই দুর্ঘটনার প্রথম দিন ছাড়া আমার সঙ্গে মমির আর দেখা হয় নি। এমন ধারা যে দেখব, এ আমার কল্পনার বাইরে। অসাড় কাকে বলে, এই আমার যেন প্রথম জানা। আজ আমি পারব না। আজ আমায় সময় দিতে হবে।

বললাম, 'আজ আমি যাই মমি। কাল আবার আসব।'

ও মুখটা অবাক করল, 'তুই কী রে? লিখি নি বিশেষ জরুরি কাজ আছে। বিশেষ কাজ কি বিশেষ সময় না নিয়ে হয়? যাবি বলছিস কিরে?'

এই প্রথম দেখা, মৃত্যুর চেয়ে মর্মান্তিক জীবনের এই চরম ক্ষতি। এ অবস্থায়, এখন ওর ভেঙে পড়া উচিত। এইটেই স্বাভাবিক। আর এমনি সহজ স্বভাব ছিল মমির। দু-ক্লাশ নীচুতে পড়ত। ছোটো বলে সখ্যের সঙ্গে বরাবর খানিকটা স্নেহ জড়িয়ে ছিল। জীবন্ত, জেদি, স্পষ্ট। নিমেষের রাগ নিমেষেই জল। এই ছিল ধাত। আজকের এই প্রতারণা, হোক না বা আত্মপ্রতারণা, এই দুঃখ ঢাকার প্রয়াস, এই লুকোচুরি, এই স্খলন কী করে সে মেনে নিল, কী দুঃখে? আমার গলায় কী যেন ঠেলে উঠছে। কী করে এখান থেকে বেরিয়ে যাব, তার পথ খুঁজছি।

একটা গামলায় জল নিয়ে সুমতি এসে ঘরে ঢুকল। পাশের বাথরুম থেকে তোয়ালে এনে ওর মুখের কাছে গামলাটা ধরে বলল, 'মুখ ধুয়ে নাও।'

কথার জের কেটে গেছে। এখন বলার মতো বস্তু খুঁজে পাচ্ছি না। কথার অভাবে মমিও ঐ একটা প্রশ্নই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করছে। 'ঠাকুরকে বলে এসেছ?'

তোয়ালে বাড়িয়ে সুমতি আলতো ধ্বনি করলো, 'হ্যাঁ। একটু ঘুরে বোসো। চুলটা বেঁধে দি।' বলে নিজেই ওর হাতের নীচে দু-হাত দিয়ে ঠেলে তুলে ঘুরিয়ে দিল। মমি সোজা, সহজ হয়ে বসতে পারছে না। অনেক চেষ্টার পর সুমতিকে বলল হুইল চেয়ারে বসিয়ে দিতে।

ড্রেসিং টেবিলের পাশ থেকে চাকাওয়ালা চেয়ার এনে সুমতি বিছানা ঘেঁষে রাখল। মমির কোলের কাছে জড়ো, আসনপিঁড়ি ওর পা দুটো তুলে চেয়ারের পাশে খাটের নীচে ঝুলিয়ে দিল। ডান হাতে চেয়ারের হাতল ধরে বাঁ হাতে খাটে চাপ দিয়ে শরীরটাকে তুলে মমি চেয়ারে এসে লাফিয়ে পড়ল। সুমতি

চিরুনি তুলে নিয়েছে। জড়ানো চুল খুলে দিতে কাঁধ বেয়ে ওর কালো চুলের কফিন কোমর অবধি শবাংশকে ঢেকে দিল।

স্মৃতি নয়, মৃতে শোক নয়, মুখ ফেরানোর অজুহাত। পেছন ফিরে দেয়ালে টাঙানো মাসিমার ছবিটা দেখতে লাগলাম।

শবাংশই বটে। দেড় বছর আগে যেদিন ছুটতে ছুটতে মেডিকেল কলেজে ঢুকেছিলাম, খাটে শোয়ানো মমিকে দেখে প্রথম এ কথাটাই মনে হয়েছিল। সটান শুয়েছিল, ওর কালচে ফোলা শরীর নীল নখে ঢাকা আঙুলগুলো থেকে যেন ফেটে জল গড়িয়ে পড়বে। আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। দেয়ালে হেলান দিয়ে ওর পায়ের দিকে তাকিয়েছিলাম। খানিক আগে, দুপুরে, আমার সঙ্গে দেখা করে এসেছিল। আমার বাইরে যাবার ঠিক আগের দিন। বিদায়ের মহড়া আর এমনি সব যা কিছু, তারই পরম্পরায়। সেখান থেকে আমাদের দুজনের দুদিকে শুরু। মমি এখন বিছানায় শুয়ে। চারদিক ঘিরে নার্স ডাক্তারের ভীড়। এগুলো নিয়ম মাফিক। নিয়মের বাইরে মমি আর তার শবাংশ। আর শোকস্পৃষ্ট মেসোমশাই তার একপাশে। আর সবার থেকে সুমন্তর স্কন্ধ চওড়া শরীর জানালার আলো আড়াল করে এই বেলা চারটেতেই অন্ধকার করে রেখেছিল। অ্যাক্সিডেন্টের পর ঐ একদিনই দেখেছি। পরদিন আমি বাইরে চলে গিয়েছিলাম।

'অদিতি!'

যেন অনেকদূর থেকে মমির আওয়াজ ভেসে এল। নামকরণে নতুন করে পরিচয়।

পেছন ফিরে তাকালাম। খোলা জানলা দিয়ে সন্ধ্যার রক্তাভা দিনান্তে ওর ধোয়া মোছা মুখে নতুন আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। শ্রান্তি শেষে সলজ্জ রক্তিমাভা। অনেকদিনের চেনা মুখ কেমন অপরিচিত মনে হচ্ছে।

কাছে গিয়ে বললাম 'কিছু বলবি মমি?'

চুল বাঁধা হয়ে গেছে। সুমতিকে বলল, 'আমার পা তুলে দিয়ে তুমি যাও সুমতি। আমার আর কিছু চাই না।'

মেশিনের মুখ নেই। চেয়ারের পাদানিতে পা বসিয়ে, কাপড় টেনে, গামলা তুলে সুমতি চলে গেল।

দুজনেই চুপ করে বসে আছি। রীনাদেরও কোনো সাড়াশব্দ নেই। মেসোমশায় ফেরেন নি। কানে বাজছে মমির শেষ কথা 'আমার আর কিছু চাই না।'

'চুপ করে আছিস যে ?' মমি আড় ভাঙল।

ছল ভূমিকায় এলাম, বললাম, 'বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হচ্ছি।'

'ঠিক বলেছিস অদিতি। আমিও তৈরি হচ্ছি।' মমিও সমান গম্ভীর। পরে সলজ্জ হাসল, 'নতুন প্রেমে পড়েছি— অদিতি। বুঝলি ?'

বুক মোচড় দিয়ে উঠল। আমি তখন ইউনিভার্সিটিতে। ছুটির পর বেরোচ্ছি, দেখি তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে মমি ওপরে উঠছে। হাতে বইপত্তর, সোজা কলেজ ফেরত। আমাকে দেখে থামের ওপাশ থেকে প্রায় ছুটে এল। 'শিগগির চল, সুমন্ত অপেক্ষা করে করে এতক্ষণে তোর মুণ্ডপাত করছে।' আমি অবাক। সুমন্তটি আবার কে ? আমার মুণ্ডে কী তার অধিকার ?

'এও বুঝতে পারছিস না ? জানা কথাই যে একজন প্রগতিশীল শিক্ষিত সুদর্শন যুবক হবেন।' তারপর তৎপর হয়ে উঠল। 'ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলেই তো ডাকছি। হাঁদার মতো এমনি দাঁড়িয়ে থাকলে রেহাই পাবি ? শিগগির চল।'

তিন বছর, না প্রায় চার বছর হবে, মাসিমার মৃত্যুর আগে গরমের ছুটির পর মধুপুর থেকে ফিরে ও আমার সঙ্গে সুমন্তর আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

আবার প্রেমের প্রস্তাব ! টিপ্পনী কেটে বললাম, 'এ প্রেম কিন্তু নিষিদ্ধ !'

মমির মুখ কেমন গম্ভীর। হুইল চেয়ারে দু-হাত রেখে আমার দিকে সোজা হয়ে বসল। 'নিষিদ্ধ বলে নিষিদ্ধ, অদিতি, এতে আমার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই।'

অবাক লাগল। এ কোন দিকে কথার মোড় ঘুরছে ? তবু হালকা কথার জের টেনে বললাম, 'আমার শোনার দায়িত্বও যে বেজায় মমতা।' হেসে যোগ করলাম, 'না দূতীর ভূমিকায় নামব ?'

মমি সামনে ঝুঁকে এল ! 'ঠিক তাই। দায়িত্ব আর দূতীর ভার দুই-ই তোর। তাই তোকে ডাকা।'

খেলাচ্ছল আর থাকছে না। কাছে এগিয়ে গেলাম। 'কী হয়েছে মমি ? লক্ষ্মীটি আমায় বল।'

এতক্ষণে ওর হাসি মিলিয়ে গেছে। চোখে মুখে কেমন সলজ্জভাব। চেয়ার ঘুরিয়ে টেবিলের পাশে গিয়ে বলল, 'বাঁচতে হলে একটা পথ খুঁজে বের করতে হয়। যে কোনো পথ। একগোছা কাগজ টেবিল থেকে তুলে আমার দিকে ধরল। এই তোর সমস্ত দায়িত্বের বাণ্ডিল। তুই দেখে দিবি।'

কাগজগুলো হাতে নিয়ে ওর মুখে তাকিয়ে রইলাম।

মমি হাল্‌কা হতে চেষ্টা করছে। পিছলে পড়ে গেলে যেমন কেউ নিজেই হেসে ওঠে, তেমনি করে বললে, 'এ আমার জীবন।' থেমে যোগ করল, 'বলতে পারিস আমার মরণ। সব মিলিয়ে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' ওর মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে।

উৎসুক হয়ে কাগজগুলো খুলে ধরলাম। লাইন টানা। স্কুলের হোম টাস্কের একগাদা পাতায় লেখা। বোধহয় রীনার কাছ থেকে ধার করা। জায়গায় জায়গায়, তারিখ দেয়া। আমি পাতা উল্টোচ্ছি। তখন সন্ধ্যার আবছা আলো, হুইলচেয়ারে মমতা, কথা বলছে, কথা উপচিয়ে উঠছে, ভেজা গলায় এক অচেনা জগতের অভিব্যক্তি, সম্মোহিতের মতো কখন আমার পাতা উল্টোনো থেমে গেল।

'অদিতি জানিস তো ছ-মাস হাসপাতালে ছিলাম। ক্লোরোফর্মের মতো হাসপাতালেরও একটা ক্ষমতা আছে। অসাড়, স্তম্ভিত, স্থবির করে দেয়ার ক্ষমতা। আমিও রেহাই পাই নি। কেনই বা পাব? হাসপাতাল ছ-মাস আমায় সাপটে ছিল। ওখানে শুয়ে শুয়ে আমি ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ডবয় আর ওদের মেশিন মাফিক কাজ দেখতাম। সকালে স্পঞ্জের পর জ্বরের চার্ট, ডাক্তারদের স্টেথোসকোপের নলে কান, শাদা পোশাকে নার্সের ঘোরাফেরা, ওষুধের ট্রলির ঘর ঘর আওয়াজ, ফিনাইলের গন্ধ, ওষুধ আর এই ওষুধই সময়ের মেজার গ্লাস। সকাল দুপুর রাত এক দুই তিন রাতের ওষুধ খেয়ে চব্বিশ ঘণ্টার অবসান। দুঃখ নয়, কষ্ট নয়, প্রায় বোধহীন যান্ত্রিক একটা অনুভূতি। একটা দিনের সমাপ্তি। ছ-মাস এই মহাস্থবিরতায়, শরীরের চেয়ে মনে, বেদনার চেয়ে বোধে, আমার হাসপাতাল। বাড়ি এসে কিন্তু এ ফাঁকি আর টিকল না অদিতি। এখানে সুমন্ত রীনা বাবা, এই ঘর দোর প্রতাপ ঠাকুর রমেশ ওরা সব আমায় পুরোনো দিনে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এখানে সুমন্ত রীনা বাবা সবাই হাঁটছে, রীনা বড়ো হচ্ছে, আমার এই ঘর তেমনি আছে, ঠাকুর প্রতাপ রমেশ তেমনি সব। আর আমি? আমার এই অসাড় দেহ? ছ-মাস পর এই প্রথম আমি আমার এ জড়দেহের সঙ্গে যেন পরিচিত হলাম, আর কী সে পরিচয় অদিতি!'

আধো অন্ধকার ঘরে মমি নড়ে চড়ে বসল, ও নড়তে ক্যাঁ-চ্ করে একটা লম্বা আওয়াজ হল। লোহা আর রাবারে। হুইল চেয়ার ঘুরে ওর মুখ ওপাশে

সরে গেল। একটু পরে ও চাকা সোজা করে আমার মুখোমুখি বসে ভাঙা গলায় ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল, 'আমি এ সহ্য করতে পারি নি অদিতি। এ আমায়— কী বলব।' মমি অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকাল। হুইল চেয়ারের হাতলে দু-হাত ফেলে বলল, এ আমাকে থেঁতলে, থিতিয়ে দিয়েছে। আমি যা নই, তাই আমি হয়ে গেছি অদিতি। আমি ঠিক কী, তা যেন আমি বুঝতে পারতাম না, এমন দিন এখনো আমি মনে আনতে পারি। যে রিহেবিলিটেশন সেণ্টারে এখন ট্রিটমেণ্টের জন্য যাই, সেখানকার একটি ছেলে আমাকে একদিন বলেছিল, দিদিমণি প্রথম প্রথম যে শালারা হাঁটে ঐ শালাদের ঠ্যাং ভেঙে দিতে ইচ্ছে করত। নড়তে পারতাম না, তাই রক্ষে। সাধারণ, নিরেট, প্রায় রাস্তায় মানুষ সেই ছেলেটাই যথার্থ সত্যবাদী। আমি ওসব ভেবেছি কিনা ঠিক জানি না। কিন্তু অভিমানে মুখ ফিরিয়ে কাঁদতাম। শুয়ে শুয়ে কান পেতে শুনতাম রীনা হৈ হৈ করে স্কুল যাচ্ছে, গান করছে, হাসছে, খেলতে বেরিয়ে যাচ্ছে। বাবা মাথায় হাত রেখে শুধোচ্ছেন, ঘুমিয়েছিলে? ওষুধ খেয়েছ? এক্সারসাইজ দিচ্ছে তো সুমতি? কোনোদিনও কথার জবাব দিই নি, ফিরে তাকাই নি। সুমন্ত এলে দেখা করি নি। ঐ ছিল আমার একমাত্র প্রতিবাদ। তারপর সবাই চলে গেলে একা ঘরে শুয়ে ওদের মিলিয়ে যাওয়া পায়ের আওয়াজ শুনতে চেষ্টা করতাম। দ্রুত অনেক পা আমার চোখের সামনে ঘুরত। সব কটা পা তাজা, আমি ওদের ভেঙে দুমড়ে আমার মতো করে ফেলতাম। আবার রান্নাঘরে ঠাকুরের চলা, রমেশের রামপ্রসাদী, সুমতির ঘুরে ফিরে কাজের আওয়াজ শুনতে শুনতে আমার সব কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে যেত। ভাবতাম আমিই তো এ বাড়ির সেই মমি। তবু কে আমি? হঠাৎ আমার মন সব ভাবনার বাইরে কেমন অবশ হয়ে যেত, অবশ যেমন আমার শরীর। দুই-ই অসাড়। ভয়ে ভাবনায় যন্ত্রণায় ছটফট করতাম। কিন্তু কী করব? উপায় নেই। উঃ সে যে কী যন্ত্রণা! থাক্‌গে।

'একদিন বিকেলে বারান্দায় বসে আছি। রীনা আমার হুইল চেয়ার এক পাশে সরিয়ে রাখল। ওরা কানামাছি খেলবে। রুমাল বাঁধা ডলির চোখ। রীনা দুটো আঙুল ওর সামনে ধরল, বলতো কটা আঙুল?

'ডলি এদিক ওদিক ঘাড় ফেরাল। আঙুল তুলে একবার চোখের অন্ধকার স্পর্শ করল, তিনটে।

'ঠিক আছে!

'রীনা ওরা সবাই ছুটে এদিক ওদিক দাঁড়াল। ওদের খেলা শুরু হল : কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাস তাকে ছোঁ।

'আমি ধারে বসে আছি। দুহাত বাড়িয়ে ডলি খুঁজছে। হাতড়াতে হাতড়াতে এসে আমাকে ধরল—'মমিদি'। সে রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্ন দেখলাম শামিয়ানা ঘেরা মস্ত জায়গা চারদিকে আলো, লোকজন, ছুটোছুটি আর ঐ আলোর নীচে বরের বেশে সুমন্ত। হঠাৎ আলো নিভে গেল। চাপচাপ অন্ধকারে হুড়োহুড়ি, কান্না, ঝটপটানি—সবাই ছুটছে, আমিও ছুটছি। ছুটতে ছুটতে আমি আমাদের বাড়ি, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, মা, বাবা, রীনা, বরের বেশে সুমন্ত, সবাইকে পেছনে ফেলে কোথায় অন্য এক জগতে চলে এলাম। সেখানে শুধু আলো ঐ চোখ ধাঁধানো আলোয় আমি ধড়ফড় করে জেগে উঠলাম। ঘুম ভেঙেও অনেকক্ষণ বুঝতে পারি নি, স্বপ্ন দেখছিলাম। তারপর দিনের পর দিন শুধু ঐ ভেবেছি। এক সময় আমার মনে হল ভগবান আমার শৈশব, বর্তমান সব মুছে দিয়েছেন। আমার মৃত্যু হয়েছে। সারাদিন ঐ অনুভূতি আর ঐ চোখ ধাঁধানো আলোর জগতে কাটল। মনে মনে খুঁজলাম, ঐ আলোর রূপ কী? এ আলোর রূপ দিতে হবে। ঐ সন্ধ্যায় যখন কেউ কোথাও নেই, বাবা বেরিয়েছেন, রীনা পড়ছে, অনেক মাস পর আমার টেবিলে বসলাম। চোখ বুজে হাতড়ানো ডলির আনন্দিত আবিষ্কার, আমি মমিদি। শুরুতে সবই অস্বচ্ছ, একাকার, তারপর ধীরে ধীরে আমার সামনে এক আশ্চর্য জগৎ খুলে গেল। যেন আমাদের জগতের ওপিঠ, একটি কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা কি দুঃখ হাহাকার সেখানে নেই। সেখানে কেমন সব সন্ধ্যা, ছায়াছায়া প্রশান্তি। অদিতি আমি প্রাণ পেয়েছি। হয়তো ভুল বলছি, হয়তো এ শুধু প্রাণের প্রার্থনা, এ নিছক স্বস্তি, ত্রাণ। বাঁচা নয়, হাঁফ ছেড়ে বাঁচা। তবু তো বাঁচা। আমার সঙ্গে আজ আমার অন্য এক নতুন আত্মীয়তা। সেখানে আমার পুরোনো ছক নেই ছাদ নেই, হিসেব নেই। শোক, অহংকার, ব্যর্থতা, আকাঙ্ক্ষা সবই আজ আমার কাছে বাতিল। ওদের অর্থ নেই। চাহিদাও নেই। যে কাগজের বাণ্ডিল তোকে দিয়েছি হিজিবিজি ছাড়া হয়তো কিছুই নয়। তবু ওতেই আমি। আমার এ চামড়া যেমন মরা, খড়ি ছাড়া আর কিছুই এ চামড়ায় ওড়ে না, ব্যথা নেই বোধ নেই, এও কি কিছু ছেঁড়া কাগজের চেয়ে বেশি? তুই আমার কাগজগুলো দেখে দে। যদি ওতে কিছু থেকে থাকে, গুছিয়ে দে। আমি তো আর কিছুই গুছিয়ে করতে পারি নে।'

অনেকক্ষণ কথা বলে মমি হাঁফিয়ে পড়েছে। আমি উঠে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আশ্বিনের শেষ, হিম পড়তে শুরু করেছে, বাগানের পেছনে দেয়াল ঘেঁষে ঘোমটা মাথায় একটি মহিলা দাঁড়িয়ে। বুকের ভিতর ধ্বক করে উঠল, সুমতি এ বাড়ির একমাত্র মেয়েমানুষ, রান্নাঘরে। কে তবে ওখানে দাঁড়িয়ে? জানালায় ঝুঁকে পড়লাম। সজনে গাছের ডালটা হাওয়ায় নড়তে রাস্তার আলো এসে সোজা হয়ে পড়ল। হাসি পেল একটা কলাগাছ। লম্বা পাতাটা গাছের মাথায় ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে বেঁচে থাকার মতো, অন্তত ব্যাপৃত থাকার মতো এক সম্ভবপর পথ মমি খুঁজে নিয়েছে। যে অভ্যস্ত জগৎ আর তার ব্যবহার মমির জীবন থেকে ধ্বসে গিয়েছে, এতদিন সহজ সামর্থ্যে যে ক্রিয়াকলাপ সার্থক ছিল, অথচ আজ নয়, তার বহুলাংশ আজ ওর কাছে নিরর্থ নিরেট, ভার। এ বোঝা তাকে ফেলে দিতে হবে। যাক এতে তার স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যৎ, তবু। প্রয়োজনবোধে আজ নতুন এক পদ্ধতির সন্ধান সে খুঁজছে, হোক সে মিথ্যা, মায়া, বানোয়াট, যা তবু এ অসামর্থ্যের ক্ষুণ্ণতাকে পরিপূরণ করে দেবে। সন্ধ্যা আর পাতার ঘোমটার নীচে সেখানে তার বধূবেশ, কানামাছির অন্ধ হাতের নীচে ধ্রুবতার স্থির কেন্দ্ররূপ। মমতা দিয়ে নয়, মিথ্যাকে পরম প্রয়োজনে আজ সে মাংস করবে, তার অথর্ব হাড়ে থোকা থোকা মাংস লাগাবে। প্রাণ না আসুক, সেখানে তবু স্পন্দনের প্রত্যাশায় চেয়ে থাকবে। এ ফাঁকি, অলীক, প্রতারণা। এই তবু তার ধ্বংসের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিবাদ।

পেছন ফিরে তাকালাম। পাদানির বাইরে মমির পা দুটো পড়ে আছে। হাত দিয়ে পাটাতনের ওপর রাখবে বলে তুলে ধরতে আঙুলগুলো ও পাতা দুটো শূন্যে ঝুলতে লাগল। অসাড় তবু তো সঙ্গী তার।

এ অবস্থায় মানুষ কী হয়ে যায় আমার জানার কথা নয়। মমতা যদি বাতিল, মমতা তবু আমার কাছে বসে আছে, কথা বলছে, আমার জীবনে আবার জড়িয়ে যাচ্ছে। কী ভাবে নিজেকে ভুলিয়ে আমাকে সে ভোলায়, সে দায় তার। আমি কী করে বুঝব তা।

অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। জানালার ধার থেকে এসে সুইচ খুঁজছি। মমি বলল, 'আলো জ্বালাবি? ও তুই পাবি না।' চেয়ার ঘুরিয়ে পাশের দেয়ালে নীচে নামানো সুইচটা জ্বালিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রীনাও এসে ঘরে ঢুকল। একটু আগে ওর আওয়াজ পেয়েছিলাম। মমির খাটে বসে বলল, 'অতুদি তবে তুমি বিলেত ফেরত?'

ওর চোখে কৌতুক না উৎসাহ বুঝছিলাম না। ডাকলাম, 'এদিকে আয় রীনা, কত বড়ো হয়ে গেছিস।'

রীনা কাছে এগিয়ে এল। 'তুমি কিন্তু ফর্সা হয়ে গেছ। ওখানে খুব মজা করতে? ওদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলতে? ভয় করত না? বুঝতে পারতে?' অনেকক্ষণ অনেক কিছু বলে রীনা উঠে পড়তে চলে গেল।

এবার সুমতি এসে ঘরে ঢুকল। 'খুকু বিছানায় চল।'

মমি হেসে আমার দিকে ফিরল, 'শুনলি অদিতি, আমি ওর খুকু। অবস্থাটা হামাগুড়ির মতো কিনা, ঠিক বুঝেছে।'

সুমতি এই প্রথম আমাকে তাকিয়ে দেখল। একটু হাসলও যেন। মমির তবু অনুনয়ের সুর, 'আজ এক্সারসাইজ নাইবা করলাম সুমতি। এতদিন পর অদিতি এসেছে।'

চেয়ার থেকে মমিকে বিছানায় তুলে সুমতি বলল, 'তুমি শুয়ে শুয়ে কথা বল। আমি পাঁচ মিনিটে সেরে নিচ্ছি।'

'ক্যালিপার পরে আজ কিন্তু প্যারালাল বারে দাঁড়াব না, আগে থেকেই বলে রাখছি।'

মমি সোজা হয়ে শুয়ে আছে। সুমতি ওর পা হাঁটু ভেঙে পেটের কাছে দুমড়ে আবার লম্বা করে বিছানায় রাখছে। মমি এক্সারসাইজ নিচ্ছে, আমি বসে কী করব? ওর কাগজের বাণ্ডিল উল্টাচ্ছি।

রুলটানা ফুলস্কেপ কাগজ প্রথম চার লাইন লিখে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে। পাশেই লম্বা ডাঁটার ওপর একগুচ্ছ রজনীগন্ধা আঁকা। তারপর মোটামুটি পরিচ্ছন্ন টানা লেখা। এখানে সেখানে একটু আধটু কাটাকুটি, কখনো একনাগাড়ে লেখা।

৮ চৈত্র। রেড ক্রস অ্যামবুলেন্স। বুকে হাত, আলতো আড়াআড়ি। গাড়ির পাটাতনে স্ট্রেচার, চুপচাপ শুয়ে আছি। জানালার ফ্রেমে বাড়ির ওপরতলা, আলসে দেয়া ছাদ, ছাদে চৌবাচ্চা, ইলেকট্রিক তার, বাতি, দুটো বাড়ির মাঝে ফাঁকা, সব সরে যাচ্ছে, জড়িয়ে যাচ্ছে। নীল আকাশ, লাল বাড়িটার রেলিং, রেলিং ঘেঁষে হলদে শাড়ি, একটি মহিলা। সরে যাচ্ছে। আর এক আকাশে, আর এক জগতে, আর এক দিনে। ম-মি। ওপর থেকে মা রেলিং-এ ঝুঁকে ডাকলেন, জলের বোতল নিয়েছিস? স্ট্র্যাপে ঝোলানো বোতল উঁচিয়ে এক ঝলক দেখিয়ে বেপরোয়া বেরিয়ে যাচ্ছি। আমার তখন বেঁটে ফ্রকের কী যে বায়না, লুকিয়ে

শাদা পায়ের গর্ব দেখা। মমি, মোমের মতো পা, মমি, মোম। আমার পায়ের ঠিক ওপরে যদি মোমবাতি জ্বলত—খুশিতে কী উজ্জ্বল আমি। কী করছে আমার পায়ে ডাক্তারের হাতের বাতি। সুঁচ ফোটাচ্ছে? জানি না, আমি জানি ডাক্তার যাই বলুক, সুমন্ত যাই বলুক, আমার পা অচল, অসাড়। পা আর হাঁটবে না। সুমন্ত বলে, দেখো তুমি ঠিক সেরে যাবে। কোন্নগরের মাঠে আমরা 'আবার বেড়াতে যাব! তেমনি বৃষ্টি নামবে তুমি ঘোমটা মাথায় ছুটবে, তোমার ভিজে ঠোঁটে চুমু খাব। সুমন্ত পায়ের কাছে বসে, হয়তো আমার পায়ে ওর হাত, অসাড়, আমি জানতে পারব না। আগে জানতাম। জানি কোথায় ওকে দেখেছিলাম। মধুপুরে! মাঠ পেরিয়ে হনহনিয়ে আসছিল—'নতুন এলেন?' চার বছর থেকে ওকে জানি; জানতাম। এমনি অন্যমনস্ক বসে থাকতে কখনো দেখি নি। চুলে হাত বুলোচ্ছে। যখনই কিছু ভাবে, চুলে হাত বুলোয়। কী ভাবছে? আমি ভালো হব না? সব থেমে যাচ্ছে। চাকাটা ঘুরে ঘুরে থেমে যাচ্ছে। আর ঘুরছে না। চাকাটা বাঁকাচোরা, থেঁতলে গেছে। সাইকেল রিকশাটা কি থেমে গিয়েছিল? আমি মাটিতে পড়েছিলাম। সুমন্তর চুল উড়ছিল। শার্ট ফুলে কাঁপছিল। ছুটলেও কি তবে থেমে থাকা যায়? সুমন্ত কোথায় থেমে গেল, হারিয়ে গেল, আমি গড়িয়ে কোথায় চলে গেলাম, রিকশার সিটে আমি, ছিটকে গিয়ে আমি; চাকাটা পাশে পাশে, জড়িয়ে, সব থেমে গেল। অ্যামবুলেন্স থেমে থেমে মোড় ফিরে, বসতির বাইরে, কৃষ্ণচূড়ার চাঁদোয়ার নীচ দিয়ে চলছে। পাতাগুলো এ ওর গায়, শিরশিরে হাওয়ায় কাঁপছে, আমি কাঁপছিলাম না, স্থির পড়ে ছিলাম, বুক, পেট, পা ফুলে হাওয়ায় ভাসছিলাম, কোনো ভার নেই, সোজা হয়ে যদি দেখতে পেতাম, সুমন্ত কোথায়? নেই, আমার আর সাধ্যি নেই, ঝাঁকুনি দিয়ে পাক খেয়ে গাড়ি এবার সোজা রাস্তায় ছুটছে। উপরে নীল আকাশ, শাদা মেঘ, দূরে চিল ভাসছে। একটি একটি করে পাখিগুলি সরে যাচ্ছে। পাখা নাড়ছে, পাখা গুটোনো ছোটো চিল বড়ো হচ্ছে, কাছে আসছে, অ্যামবুলেন্স এগুচ্ছে, এ পাখিটাকে মিলিয়ে যেতে দেব না, সরে যাচ্ছে, অনেক দূর চলে গেছে, একে হারালে চলবে না, মিলিয়ে যাচ্ছে, দূরে সরে যাচ্ছে, যা-বে-না। চিৎকার করে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছি সমস্ত শরীর থেঁতলে থকথকে কাদার মতো পড়ে গেল। বাবা, সুমন্ত ব্যস্ত। আমি ওদের ভাবিয়ে মারছি। ওরা আমায় সোজা করে শুইয়ে দিল। একটা হাত চোখের ওপর। হাত সরাব না, কিছু দেখব না, চোখ চেপে রেখেছি। রোদ লাগছে মমি? বাবার

গলা। বলতে পারতাম, না। বলব না। রোদ আসছে মমি জানলা বন্ধ করে দে, মার আওয়াজ, ট্রেনের আওয়াজ, এদিন সেদিন সব এক হয়ে মিশে গেছে। মা যদি এখন বেঁচে থাকত? কী হত? চোখ দিয়ে জল পড়ত, কাঁদলে মাকে সুন্দর দেখাত। মা নেই, কোথাও নেই। রোদ আসছে মমি—জানলা বন্ধ করে দে, কোথায় যাচ্ছিলাম, মধুপুর? মনে পড়ছে না, তবু দেখছি ট্রেন, প্ল্যাটফরম, হকারের হাতে পটেটো চিপস, সরে যাচ্ছে। রীনার হাত বাড়ানো, একটা হাত হ্যাণ্ডেল চেপে ধরেছে, শরীর ঝুলছে। মার মুখ শাদা, মার মরা মুখ নীল কালচে ছিল। মরলে হয়তো ভয় থাকে না। আমার ভয় ছিল। মরি নি, সুমন্ত ভয় পেয়েছিল। কী যেন হয়েছিল। একা একা পড়ে যাচ্ছিলাম। গড়াচ্ছিলাম। আর সুমন্ত পড়লে কী হত? কী হত সুমন্ত পড়লে, গড়ালে, থেমে গেলে? কী আর হত। ভাসতে ভাসতে অনেকদূর চলে যেত। আমার মতো। চারদিকে পাখিগুলি পাখা নাড়ত, পাখি মিলিয়ে যেত, শূন্যে ঘুরপাক খেতে খেতে পাখি মিলিয়ে যেত। সব যন্ত্রণা শেষ হয়ে যেত। আবার যদি সব ফিরে পেতাম! সুমন্ত বলত মমি, মোম। আমার হাত ওর হাতে, পাশ ফিরতে সমস্ত শরীর ব্যথায় টন টন করে উঠত। আবার যদি ব্যথা ফিরে পেতাম? আমায় পায়ে, হাঁটুতে, কোমরে, বুকের নীচে ব্যথা নেই, বাবার চোখ ডাক্তারের চোখে, সুমন্ত ইনজেকশানের সুঁচ দেখত। আমার শরীর কেঁপে উঠত। পা তুলে ব্যথায় চিৎকার করে উঠতাম, আমি যদি আবার ব্যথা পেতাম। ব্যথা পাবার বর পেতাম। ব্যথা থাকত, নেই, কিছুই নেই। অসাড়।

অ্যামবুলেন্স থেমে গেল। হাত মুখ ঘামে ভেজা। বাবার মুখ ঝুঁকে আছে—জল খাবে মমি? বাবাকে দেখছি। মুখে এত ভাঁজ কেন? বাবাকে দেখছি বেড়াতে যেতে, বিকেলে। লিও আর স্পটি সঙ্গে। কুকুর দুটো আগে আগে। বাবার হাতে শেকল। বাবার মুখ আকাশে তোলা, আকাশের মতো চামড়া টানা, নিভাঁজ, বিকেলের যে আকাশ। হঠাৎ স্ট্রেচারে টান পড়ল। গাড়ির ভেতর দুজন বসেছিল, ওরা স্ট্রেচার টেনে আমায় শাদা বাড়িটায় নিয়ে গেল। সেদিন আমি বিহ্বল ছিলাম। কিছুই বুঝতে পারি নি। তারপর রোজ সেখানে গিয়েছি, এই শাদা বাড়ির আত্মাকে চিনেছি।

যেন ঘা খেয়ে এখানে এসে থেমে গেলাম।

এক্সার সাইজ শেষে সুমতি মমির জামাকাপড় ঠিক করে দিচ্ছে। সেবা না

নিয়ে যার উপায় নেই, সে মমি বাড়ির আত্মা খুঁজছে। বহুদিন থেকে ওকে জানি। স্বাভাবিক, ছটফটে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেয়ে, যাকে সব সময় নিজের সঙ্গে তুলনা করে মনে মনে হার মেনেছি। সে মমি আজ আত্মা খুঁজছে, হাসপাতালে, বাড়িতে, ইটে।

খুব বেশিদিনের কথা নয়। মাসিমা মারা যাবার মাসখানেক পর, বাড়িতে তখনও শোকের ছায়া। বিকেলে মমিদের ওখানে গিয়েছি। ঢুকতেই বারান্দায় শূন্য চেয়ারটায় চোখ পড়ল। চোখ ফিরিয়ে বাগানে তাকালাম। মেসোমশায় মালির সঙ্গে একটা গাছের তলায় বসে কথা বলছেন। আমায় দেখে উঠে এলেন। 'এসো অদিতি।' রমেশকে ডেকে দুটো চেয়ার আনিয়ে বললেন, 'বোসো। মমি বাড়ি নেই, এখনই ফিরবে।'

তাইতো! একদম ভুলে গেছি। মমি বলেছিল আজ সুমন্তর সঙ্গ নেবে। কলেজ থেকেই সোজা পালাবে। উনি তো পালিয়েছেন। এখন আমি করি কী? মেসোমশায়ের মুখোমুখি বসে থাকা—ভাবতেই হাত পা ঠাণ্ডা, হিম। এতদিন দেখলেই পালিয়েছি। মাসিমা মারা যাবার পর আমরা সবাই যেন হঠাৎ বড়ো হয়ে গেছি। পালাই না, এড়িয়ে চলি। সামনে পড়লে কথা আটকে যায়। রীনাকেও যে দেখতে পাচ্ছি না। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, 'রীনা কোথায় মেসোমশায়?'

'তুমি বোসো মা, ডেকে পাঠাচ্ছি।'

বোসো মা! ঝট্ করে মেসোমশায়ের মুখ আঁচ করে নিলাম। এ কদিনেই শরীর অনেক ভেঙে গেছে। কী বলব? চুপ করে আছি।

'তোমার মাসিমা তোমায় বড্ড ভালোবাসতেন।' যেন মেসোমশায় আমায় কাছে টানলেন।

কেমন হকচকিয়ে গেলাম। রাশভারি গম্ভীর মানুষ, মেসোমশায়কে বরাবরই বোবা হয়ে দেখেছি। যত আবদার ছিল মাসিমার কাছে। রোগা, পাতলা প্রায়ই অসুস্থ, নিস্তেজ মাসিমা। আর মেসোমশায়কে আমরা রেখেছি ঠিক তার উল্টো পিঠে। লম্বা, চওড়া, গম্ভীর, কাজে ব্যস্ত, সব কিছুই ছকে বাঁধা। কী জানি; হয়তো মৃত্যু এক একজনকে এক একভাবে বিচলিত করে। বুঝতে পারি নি, ভেতরে ভেতরে মেসোমশায় ভেঙে গুড়িয়ে বদলে গেছেন।

'তোমার মাসিমাকে মনে পড়ে অদিতি?' অনেকক্ষণ সময় নিয়ে আকাশে

আর সন্ধ্যার সীমারেখা, যেখানে সূর্যাস্তে টুকরো টুকরো মেঘে অনেক রঙের খেলা আর অন্ধকারের সূচনা, সেখানে তাকিয়ে নিজের মধ্যে ডুবে রইলেন। তারপর নিস্তব্ধ বাড়িটার দিকে। সেখানে বুঝি নিজেরই প্রতিচ্ছবি।

মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'মমি এসব বিশ্বাস করে না অদিতি। স্মৃতি ধরে রাখা, ওর কাছে দুর্বলতা।' হেসে যোগ করলেন, 'দুর্বলতা থেকে বাঁচতে গিয়ে তোমার মাসিমার সব চিহ্ন ও দু-হাতে মুছে ফেলেছে। বলতে দুঃখ পাই, ভেতরে গিয়ে দেখ তোমার মাসিমার কিছুই সে রাখে নি। কাপড়, জামা, সুতোর কাজ, পুজোর সামগ্রী সব কিছু নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এমন কি বড়ো ছবিটাও তুলে রেখেছে।'

পরে যেদিন দেখা, মমি ওর ড্রয়ার পরিষ্কার করছিল। একফাঁকে বললাম, 'মেসোমশায়কে দুঃখ দিচ্ছিস কেন ?'

নিমেষে বদলে গেল। কাজ বন্ধ করে সন্দেহ আর বিদ্রোহে কঠিন নিষ্করুণ, প্রশ্ন করল, 'কেন ? বাবা তোকে কিছু বলেছে নাকি ?'

'বলাটা কি অস্বাভাবিক ?'

অকেজো কয়েকটা কাগজ দুমড়ে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে, আবার ড্রয়ারে ঝুঁকে পড়ল, 'অস্বাভাবিক নয় বলেই তো আমায় সাবধান হতে হচ্ছে। সব কিছুরই বাড়াবাড়ি—আড়ম্বর। আর অহেতুক আড়ম্বরের আর এক নাম ফাঁকি। বুঝলি অদিতি, বাবা ফাঁকিতে বাস করতে চান। এ আমি হতে দেব না।'

সেই মমতা আজ বাড়ির আত্মা দেখছে।

দেয়ালে মাসিমার অয়েল পেন্টিংটার ওপর আলো পড়ে কেমন জীবন্ত দেখাচ্ছে। এতদিন কোথায় তোলা ছিল। আজ নেমে এসেছে। এক্সারসাইজ শেষে মমি চেয়ারে এসে বসেছে। কাগজগুলো ভাজ করতে করতে বললাম, 'জীবন কি কেবলই শ্যাম সমান, কান্না আর কালিন্দীর জল ? প্রতিভাস দিয়ে কি মেলে প্রশান্তি ? মুখোশ দিয়ে মূর্তি ? পারবি শুধু ক্ষমার সিম্বল দিয়ে, শ্যাম-সমানে, জীবনের সমস্ত ক্ষতি পূরণ করতে ? এ তো এক রাতের বিলাস নয়। এ যে রোজকার ব্যাপার,' বলেই নিজের এ রূঢ় কথায় লজ্জা বোধ করলাম।

আমার লজ্জা গায়ে মাখল না। কিছু না বললেও পারত, তবু মমি জবাব দিল, 'কতটুকু ক্ষতিপূরণ হল, এ খতিয়ে দেখতে আমি চাইছি না অদিতি। আমার

শরীর ভাঙা, আমাকে এখন দেখতে হবে, না যেন আমি ভেঙে যাই। হাঁটতে পারিনে। আমাকে গড়িয়ে যাওয়ার পথ কাটতে হবে। কাগজে হিজিবিজি কাটি, এও আমার এক ধরনের পরীক্ষা। লেখা হোক কি যা কিছু হোক, আমাকে আশ্বাস দিক। জানাক দেহের ক্ষতি, ক্ষতির চরম নয়—এ ক্ষয়কে মেনে নিয়ে জীবনের অন্য এক মানে পেতে হয়, একমাত্র অন্য এক জীবনদর্শন। সত্য হোক, মিথ্যে হোক, এ আমার সম্বল। নিজের সঙ্গে এ আমার এক ধরনের মোকাবিলা, আর এ কথাটাই লিখতে আমি চেষ্টা করেছি। কেবলই শুধু লিখতে না।' হুইল চেয়ার আমার কাছে টেনে আনল। আবার বলল, 'কিন্তু লেখার ক্ষমতা আমার কোথায়? তুই তো লিখিস, আমার এ অসংলগ্ন কথা তুই গুছিয়ে লিখে দে, এ দায়িত্ব এখন তোর অদিতি।'

২

ঘুম এমনই একান্ত ও একার যে অপরের ভাবনার ও শরিক হতে নারাজ। কী করে যে এক বিছানায় দু-জন প্রাণী ঘুমোয়, এ আমার আবিষ্কারের বাইরে। না, কে জানে আদৌ ঘুমোয় কিনা, না ভনিতায় রাত যায়। যেমন গিয়েছিল আমার আর বিপক্ষেরও—জ্ঞানত দুপক্ষেরই। রাত্রি আর জাগরণের ফল, কে জানে, স্মৃতি না ছাই। দুই সমান আমার কাছে। সে যাই হোক, বিদেশেই স্মৃতিটাকে ছেড়ে এসেছি। সুইজারল্যাণ্ডের ঠাণ্ডায় জমেছিলাম, পাহাড়ি শ্যালে-র দুটো বেডে দুজন, শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম ঠোঁটে ঠোঁট, গায়ে গা লেপটে, এক হয়ে গিয়ে শাদায় কালোয় ডোরা সাপ—বিচিত্র কম্বিনেশন। ভাবতেই গা শিউরে উঠেছিল। শরীর জ্বলছিল, অন্ধকার কাঁটা দিয়ে উঠছিল। চোখ বুজে শয্যা নিয়েছিলাম। পরে বিছানায়ও আর থাকতে পারি নি। উঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানালায়, ঐ শীতে। আজ অন্য ভাবনায় এখন এই রাতদুপুরে আমার হোস্টেলের চিল্‌তে বিছানায় সমস্ত সন্ধ্যার ভার মমতার মুখে ভর করে আমায়

জাগিয়ে রেখেছে। অথচ জানি কাল সকালে ওঠার তাগিদ আছে। দেড় বছর ঘুরে এসেছি, হেড মিস্ট্রেস মুখিয়ে আছেন, যদি পারতেন একদিনেই বাকি কাজ শোধ করে নেন। নিজের কয়েকটা টুকিটাকি কেনার বাকি, বিনতার জ্বর, স্কুলের পথে একবার ওকে দেখে যাওয়া উচিত। মাকে কয়েকটা ওষুধ কিনে পাঠাতে হবে। সব জমা হয়ে আছে। আর আমি এই এক-দুই-তিন জেগে জেগে অন্ধকারে শাদা ভেড়া গুনছি। কে এই মেষপালক যে আমাদের ঘুমের অভাবে তার শ্বেতশুভ্র যূথ চড়ায়! অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে ওদের নরম নরম লোম ধরতে চাইছি। ওরা লাফিয়ে হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়। নিষ্ফল শ্রমে হাত ক্লান্ত হয়ে আসে। দুপাশে দুটো হাত, বিনিদ্র বিছানায় শরীরটাকে ফেলে দিলাম। এ আঁধারে এখন আর আমার কোনো হাত নেই। এ অঙ্গ অজড়, অবশ, পাথর। সরু বিছানা এই অসাড় দেহকে আশ্রয় দিয়েছে। অসাড়। সব অসাড়। ঘুমে, জাগরণে, অসাড়, সব সময় ; তেমনি সে। মমি কি ঘুমোচ্ছে? রাস্তার তেরছা আলো টেবিলে রাখা ওর ছবিটার উপর। কলেজ পালিয়ে তোলা ছবি। ছবি তুলে ইডেন গার্ডেন হয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে হাঁটছি, পাশে চানাচুরওয়ালাও। মমি বলল, 'তুই গঙ্গার শোভা দেখ অদিতি। আমি চানাচুর খাচ্ছি।' দু-একটা ফুল পাতা ঝরার কবিতা এ লিখে আমার সর্বনাশ। সুবিধে পেলেই লিখিয়ে বলে খোঁচায়। আজ সেই কাঁটায় দু-জনেই যেন বিঁধে গেছি। পা নেই, হাতকে তাই আজ তার বড়ো মনে পড়েছে। হাতের লেখায়। অক্ষর দিয়ে ক্ষয় ভরাবে। আর আমাকে বিন্যাস করতে হবে। গুছিয়ে দিতে হবে, যে দায়িত্বে অনেকখানি খেলা। খেলার টানে অন্য এক দায়িত্বর কথা বার বার আবার মনে উঁকি দিচ্ছে। দেখাচ্ছে সন্ধ্যায় দেখা মমি। ভাবিয়ে তুলছে ওর সবকিছু, কেমন, মনে হচ্ছে এলোমেলো, এলোমেলো, গোলমেলে। এই যে সব-পাওয়ার নির্লিপ্ততা, এর তল খুঁজতে গিয়ে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এড়াতে গিয়ে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। দেহের ক্ষতি ওকে ক্ষিপ্ত করুক, কাঁদিয়ে মারুক, এ মানি। বুঝি। কিন্তু এই যে নির্লিপ্ত দেবী ভাব, এতে স্বভাব নেই, এর পিছনে ভয়, বিপদ। যেন মনে হয় হেরে গিয়ে সবাইকে সে হারাবে। অবাস্তবকে ফাঁপিয়ে তুলে জীবন থেকে ধীরে ধীরে সে উঠে যাবে, উপরের দিকে যেখানে হাওয়া নেই, শ্বাস নেই, প্রাণ নেই, একটা অলীক ফানুশ, কেবলই শেষে ফেটে যেতে। এক ভয়াবহ চরম অন্তিম ওই একটু উপরে ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ঐ সিলিং-এর কাছে, যেখানে

এখন আমি ঘুমের স্তরে অদৃশ্য কড়িকাঠ গুনছি। সেখানে মমির বিপদ আছে। বিপদ অপেক্ষা করছে। ঐ কড়িকাঠ থেকে ওকে নামাতে হবে। ওকে বাঁচাতে হবে। নামিয়ে শুইয়ে দিতে হবে, টেবিলের ওপর ওখানে, ঠিক ওর ছবির পাশে, যেখানে ও পুরোনো, জানা, সহজ। আমার জানার সঙ্গে, সবার জানার সঙ্গে, যেখানে তার মিল। ঐ লেখাটার বিপরীতে, বিরুদ্ধে, যেখানে সে সবার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। ছবির পাশেই যে লেখাটা, হাওয়ায় পাতা উড়ছে বন্ধ হচ্ছে। ঘুম নেই। উঠে বাতি জালিয়ে, বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে, লেখাটা নিয়ে বসেছি। মমিকে আমার খুঁজে পেতে হবে।

'জীবন দর্শন' বলে মমি যেভাবে কাগজগুলো আমার হাতে তুলে দিয়েছে, নিঃসন্দেহ ছিলাম দুঃখের পরিপ্রেক্ষিতে দিনে দিনে নিজের মর্মান্তিক কথাই হবে লেখার বিষয়বস্তু। সেদিক দিয়ে দেখছি ও আমায় হতাশ করেছে। শুরুর দিকটা ছেড়ে দিলে মনে হয় নিজের কথা সামান্যই। সবই রিহেবিলিটেশন সেণ্টার-এর ক্লেশ, কৌশল, কার্যকরিতার কথা। সমবেদনার যোগ্য, নিঃসন্দেহে। এখন তবু অপরকে নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থা আমার নয়। মন উন্মুখ, কোথাও যদি মমিকে খুঁজে পাই। ওর খুঁটিনাটি, ছিটেফোটা, তাও। পাতা উল্টোচ্ছি, পালিয়ে বেড়াচ্ছে, ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। এক জায়গায়, হোক না আভাসে ওকে যেন দেখতে পেয়ে উৎসুক থেমেছি।

১৩ই বৈশাখ সকাল। ফিজিওথেরাপির ঘর। জানালার ধারে সরু বিছানায় শুয়ে আকাশ দেখছি। ওয়ার্ডবয়রা রোজ আমায় এই খাটে শুইয়ে দেয়। এদের এ জানা হয়ে গেছে। এই জানালার ধারে এই খাটে আমায় শোয়াতে হবে। বেশ লাগে! পি-টি-র কোলাহলকে মিথ্যে করে দূরের আকাশে চোখ রেখে কত সব বিলাস করা যায়। স্বপ্নের, আশার, আকাঙ্ক্ষার। সুমন্ত বলতো বিয়ের পর এ বাড়ি খতম। ফুলশয্যা নবপর্যায়ে। বিয়ে বামে, বাড়ি বদল দক্ষিণে। সেই দক্ষিণ-খোলা ঘরে জানালার ধারে শুয়ে শুয়ে তুমি আমি আকাশ দেখব। রাত্তিরে জ্যোৎস্নায় ধোয়া তোমার শাদা বুকে মুখ ডুবিয়ে পরে থাকব। সুমন্ত এখন খিদিরপুরের বাসের রড ধরে ছাতে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছে। নয়তো দরজার পাশে। নির্ঘাৎ বসতে জায়গা পায় নি। পাওয়ার আগ্রহও সামান্য। হু হু হাওয়ায় চুল উড়ছে, ডান হাতে রড, বাঁ হাতে এক একবার পেছনে চুল ঠেলে দিচ্ছে। হাত উল্টে ঘড়ি দেখছে। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

এখানেও আজ সবাই ব্যস্ত। ঘড়ি দেখছে। কোথাকার এক স্বাস্থ্যমন্ত্রী

আসছেন। ফোটোগ্রাফার এসেছে, ছবি তুলবে। রুগীরা দর্শনীয়, ছবির যোগ্য। আমার ছবিও একদিন নিতে চেয়েছিল। দিই নি তুলতে। ডাঃ সেন দুঃখ করেছিলেন এত সুন্দর চোখ, স্ন্যাপ নিতে দিলে না মমতা!

ডাঃ সেন পি-টি-তে ঢুকলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে, চারদিকে চোখ বুলোচ্ছেন। ব্রেস, ক্রাচ, কৃত্রিম হাত পা, বিকলাঙ্গ রুগী, সব। যেখানে যে আর যা থাকার, আছে তো? নারায়ণকে ডাকলেন, এক নম্বরকে ব্রেস পরিয়ে প্যারালাল বারে দাঁড় করিয়ে দাও। আমিই সে এক নম্বর। এক পা নিয়ে আনন্দ ঘরে এদিক ওদিক করে বেড়াচ্ছিল। ও যেন প্লাস্টিকের পা পরে নেয়। ঘরের কোণে ভিড় করা হুইল চেয়ারের পেছনে নিতাই বসে নখ খুঁটছে। উরু খোলা, ঘাটা বেড়েছে। এক নজর দেখে ডাঃ সেন কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। আজ কিন্তু ঝগড়া বাধিও না। মন্ত্রী আসছেন, ঐ টুলে গিয়ে চুপ করে বোসো। বেরিয়ে যাবার আগে ডাক্তার চারদিক আর একবার দেখে নিলেন।

দয়াল পর্দা সরিয়ে দিল। ঘর আলোয় একসা। পি-টি-র পুব, পশ্চিম দু-দিক খোলা। সকাল বিকাল দু-বেলাই রোদ। রোদে আর রুগীতে পি-টি সরগরম। ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন! ওয়ার্ডবয়রা এ ওকে ভেংচি কেটে হাসতে লাগল। কেউ এক পাক ঘুরেও নিল। কোণ থেকে নারায়ণ হুইল চেয়ার বের করে ক্রাচ হাতে একপায়ে দাঁড়ানো বিশ্বম্ভরকে ধাক্কা মেরে, 'অ্যাকসিডেন' 'অ্যাকসিডেন' বলে হাত পা ছুঁড়তে লাগল। সবাই হো হো করে হাসছে। আমার খাটের পাশে হুইল চেয়ার রেখে বিছানায় হাত, নারায়ণ আমার মুখের উপর হাসছে। ঘেন্না লাগে। এ হাসপাতালের সবাইকে, নিজেকে, সব কিছুকে আমার ঘেন্না লাগে। এ পাশে মুখ ফিরিয়ে জানালায় তাকিয়ে অপেক্ষা করছি। শহরের এ দিকটা খোলা, আকাশে অনেক চিল, দুপুরে আরো বেশি পাখির ভিড়। দুপুরে সুমন্ত রেস্টুরেণ্টে চা নিয়ে বসে। চায়ের ধোঁয়ায়, সিগারেটের ধোঁয়ায় ওর মুখ কেমন অস্পষ্ট।

এক ঝটকায় পা দুটো শূন্যে তুলে দয়াল আমায় ব্রেস পড়িয়ে দিল। নারায়ণ ব্রেসের স্ট্র্যাপ বাঁধছিল, হঠাৎ জিভে তালুতে দ্রুত আঘাত দিয়ে শ্লীলতা ভাঙল, 'হুররের হুরী এসে গেছে।'

অজান্তে দরজার দিকে মুখ ঘুরে গেল। ফিজিওথেরাপিস্ট শীলা চমৎকার একটি শাড়ি পরে ঢুকছে। আমারও এমনি একটা শাড়ি আছে। তফাৎ যা রঙের। গোলাপি। বিকেলে শাড়ি কিনে পরদিন পড়ি মরি হাজির ওয়েলিংটনের

বাড়িতে। রোববার। সুমন্ত দিব্যি আয়েসে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। এলাম রোদে পুড়ে এতটা রাস্তা, উনি পড়ছেন কোন সাহেবকে, কার না রাগ হয়? একটানে বই ছিনিয়ে ফেলে দিলাম, 'এখনও শুয়ে, যাবে না?' পায়ের ওপর পা, ঢিলে পাজামা খালি গা, সুমন্ত হাত বাড়িয়ে দিল, 'কাছে এসো।'

'না, আসব না।'

ও তাকিয়েই রইল। চাহনি ঠেকে আমারও চোখ কেমন জড়িয়ে এল।

'এমনি করে তাকাবে না।' শাড়ি টেনে বললাম।

শুনতে চায় না। বলল, 'ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। কাছে আয় মম্।

শাড়িটা অদিতির খুব পছন্দ। আলমারিতে পরে আছে। ফিরে এলে ওকে দিয়ে দেব।

ব্রেস পরানো শেষ। এবার চ্যাংদোলা হয়ে হুইল চেয়ারে বসে পায়ে স্ক্রু এঁটে হ্যাঁচকাটানে প্যারালাল বারের রড ধরে দাঁড়ানো। তাও শেষ। দাঁড়িয়ে আছি। এধার থেকে পি-টি-র ওদিকটা সম্পূর্ণ আলাদা। এদিকটায় প্যারালাল বার, সিলিং-এ ঝোলানো শেকল, ট্র্যাকশন, ব্রেস, প্লাস্টিকের হাত পা, এক্সারসাইজের খোলা জায়গা, আর ওদিকটায় সরু সরু শাদা বিছানার পাশে আলট্রাভায়োলেট ক্রমিয়ম ইনফ্রা রে-র মেশিন, বিছানার ওপর লোহার জালিকাটা আচ্ছাদন, জানালায় সবুজ ভিনিশিয়ান গ্লাস। ছায়াচ্ছন্ন এক জগৎ। আচ্ছা এমনি যদি হত, এই প্যারালাল বার থেকে বেরিয়ে মাঝের সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটতে, হাঁটতে, এক এক করে বিছানাগুলো পেরিয়ে ওদিকের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এই শাদাবাড়ি থেকে যদি, এ শাদা বাড়ি থেকে পালিয়ে যদি, এ শাদা বাড়ি থেকে যদি···

ডাঃ সেন আরো পাঁচ ছ-জন একসঙ্গে এসে ঘরে ঢুকলেন। স্যুট, টাই, চক্‌চকে জুতো সবাই হাসিখুশি, এই উজ্জ্বল সকালে ওদের সব কিছুই চমৎকার মানানসই। রুগীরা যে যার জায়গায়, অনেক বেশি চুপচাপ। শীলা কাছাকাছি দাঁড়ানো, বাকি সব থেরাপিস্টরাও, সন্দীপবাবুকে দেখছি না। জানি ওরা আমায় প্যারালাল বারে হাঁটতে বলবে। কেউ এলেই ওরা তা বলে থাকে। আর ঐ বলার পর আমার চাই সন্দীপবাবুকে, সন্দীপবাবু না হলে আমার হাঁটা চলে না। ডাঃ সেন রুগীদের দেখতে শুরু করেছেন। সন্দীপবাবু তবু আসছেন না। আমি যথাসম্ভব বাইরে চেয়ে থাকতে চেষ্টা করছি। সুরমা হুইল চেয়ার থেকে লাফিয়ে বিছানায় উঠে গেল। ডাক্তার ওদের বিকলাঙ্গের বর্ণনা, রোগের

নাম, ভালো হবার সম্ভাবনা, চিকিৎসার পদ্ধতি, সব ব্যাখ্যা করছেন। ডাক্তার ঘুরে দাঁড়ালেন।

'কেমন আছ মমতা ?'

সন্দীপবাবু এল না।

ডাক্তার এগিয়ে আসছেন। নীচু গলায় পাশের ভদ্রলোককে বলছেন, অ্যাকসিডেন্ট। তারপর বর্ণনায় নামলেন। ট্রানসমেটিক পেরাপ্লেজিয়া, স্কিয়গ্রাম কমপ্রেশন্; ডি. এইট্ ডি টেন ভারটিব্রা।

সঙ্গের ভদ্রলোক এবার আমার দিকে ভালো করে দেখলেন। এক্ষুনি আমায় কাজে লাগাবে। প্যারালাল বারের রড শক্ত করে ধরে আমি তৈরি।

ডাক্তার আরো এগিয়ে এলেন। উঁচু গলায় বললেন, 'মমতা ইকনমিক্সের ছাত্রী, এম. এ. পড়ছে।'

ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন, আমি হাসব, কি হাসব না, ভাবছি। ডাক্তার বেশ গুছিয়ে ভদ্রলোককে বোঝাচ্ছেন, 'মমতা লাকি, ওর অনেক উন্নতি হয়েছে। আরো হবে। বাইরের ডাক্তারও কনসাল্ট করা হচ্ছে।

এবার আমি সবার দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

ভদ্রলোক প্যারালাল বারে হাত রেখে মন্তব্য করলেন যে এখানে আমি তো বেশ হাঁটি।

শক্ত করে রড ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার অনেকদিনের প্রায় ভুলে যাওয়া একটি ছবি মনে পড়ছে।

ডাক্তার সেন আমাকে হাঁটতে ইঙ্গিত করলেন। প্যারালাল বারের রড ধরে আমি লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে এলাম। ডাক্তার আমাকে উৎসাহ দিচ্ছেন। 'ফাইন'। তারপর নিজেই প্যারালাল বারে ঢুকে দু-হাতে রড ধরে স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, 'এমনি হাতে চাপ দিয়ে সামনে ঝুঁকে শরীরটা উচিয়ে আনো, দেখবে কত সহজ হবে, কত সহজে সব কিছু করতে পারবে।

মমির জবাব পড়ে আমি চমকে উঠলাম।

'ডাক্তারবাবু আমি সার্কাসও করতে পারব ?'

খাতাটা বন্ধ করে চোখ চেপে উপুর হয়ে শুয়ে পড়লাম। বাতিটা তেমনি জ্বলছে।

কলেজ ফিরতি। দুজনে হাঁটছি। তাড়াহুড়ো নেই। গল্পে মশগুল, আমি ও মমি। সামনে ফুটপাতে গোলমতো একটা ভিড়। সবাই একবার করে উঁকি মেরে জমে যাচ্ছে। পাশ কাটাতে ভিড়ের ফাঁকে দেখলাম, একটি বাচ্চা ছেলে শুয়ে আছে। মমির হাত টেনে দাঁড়াতে যাচ্ছি, ও মাথা নেড়ে জোর পায়ে এগিয়ে গেল। খেঁকিয়ে উঠল, 'চলে আয়।'

বাধ্য হয়ে বেরিয়ে এলাম। না দেখার দুঃখ ছিল. খোঁচা দিয়ে বললাম, 'মজা দেখতে বুকে বাজে, আ হা কী মহান বৈরাগ্য।'

এতোটুকুতেই রেগে টং। উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করে উঠল। 'জানিস ছেলেটা কী ভাবছে?'

'কী ভাবছ!'

'ভাবছে তোদের মতো পাপীদের ঈশ্বর ক্ষমা করুন।'

মমির রকমসকমে হকচকিয়ে গেলাম। তবু নিজের জেদ বজায় রাখতে হবে। পেশ করলাম, 'হ্যাঁ তা তুই বুঝি খুব জানিস। বটেইতো ক্ষমা বেশ ভালো, তাছাড়া ঈশ্বরের ক্ষমা, কিন্তু আমাদের অপরাধটা কোথায়?'

'অপরাধ নয় অবিচার।'

আমি চুপ মেরে গেলাম। বেদের খেলা থেকে ন্যায়শাস্ত্র কি নীতিশাস্ত্রে পাড়ি জমাতে আমি নারাজ। মমিও হয়তো এ ছোট্ট ঘটনার এমন পরিণতিতে লজ্জা পেল।

'চুপচাপ হাঁটছি, খানিকবাদে মমি হঠাৎ হেসে উঠল, 'রাগ করেছিস?'

হাসিমুখে ওর কাঁধে হাত রেখেছি, 'কী ছেলেমানুষ।'

'ছেলেমানুষ ভাবছিস?' এবার তার গলার গতি বুঝছি না। ভয়ে ভয়ে ডাকতেই চমকে উঠেছি। ব্যথা, বেদনা, লজ্জা, ঘৃণা জড়ানো চোখমুখ। ধীরে আমার দিকে ফেরাল, বলল, 'অদিতি ছেলেবেলার একটা গল্প শুনবি?'

যা বলেছিল দিনক্ষণ সব আজ আমার মনে নেই। তবে মনে আছে গরমের ছুটি। মমির মামাবাড়ি! আর সেদিন দুপুরে অনেক রোদ। দুপুরের রোদটা বিশেষ করে মনে পড়ছে, কেননা ও বলেছিল, 'দুপুরের রোদ্দুর আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছিল।' টিপ্পনী কেটেছিলাম, বাচ্চা বয়স থেকেই হাতছানির রোগ। রাগারাগি হয়ে গল্প বলা ওখানেই শেষ হওয়ার কথা, কিন্তু ওর অপার উত্তেজনার কাছে অভিমান টিকল না। কথাটা গায়ে না মেখে বলে চলল, 'গরমের ছুটিতে আমরা তখন মামাবাড়ি গিয়েছি। বোশেখ মাসের কাঠ ফাটা

রোদ। মার পাহারায় শুয়ে শুয়ে চোখ পিট্ পিট্ করছি। কখন মা ঘুমোবেন। দুপুরের ঐ থমথমে রোদ আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। আমি শুধু মার পাশে উস্‌খুস্ করছি, ক্ষণ গুনছি। এমনি সময় দূর থেকে ডুম্ ডুম্ করে একটি আওয়াজ ভেসে এল। কোথায় তখন মার সাজা আর শাসানি। আমরা সব ভাইবোন ছুটে গেটে গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়ালাম। আমিই নিশ্চয় প্রথম সারি।'

বাচ্চা মমতা গেটে হাত রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে রাস্তায় তাকিয়ে আছে, ভাবতে কেমন লাগে। বিশেষ করে যদি ভাবি এখন। এমনিতেই আমি ওর বাচ্চা বয়সটা দেখতে পাই না। দু-জন পাশাপাশি বড়ো হয়েছি, নিজেকে দেখে ওকে দেখেছি, দুজন সমান এইটেই শুধু সত্য, ছোট্ট এক মমতা আর আজ কোনো এক হাসপাতালের ভীড়ে প্যারালাল বারে ব্যাণ্ডেজ পরা মমতা, দুই-ই আমার কাছে অবাস্তব।

মমি বলে চলেছে, 'দূরে ঢাকাদেওয়া একটি কাঠের বাক্স ঘিরে আওয়াজটা এগিয়ে আসছিল। এসে আমাদের আমগাছতলায় দাঁড়াল, জনা চারপাঁচ লোক, রোদে চোখ কুঁচকে কপাল থেকে ঘাম ঝেড়ে হাঁফাচ্ছে। বাক্সটায় চোদ্দ পনেরো বছরের একটি ছেলে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে। হঠাৎ এক ঝলক চোখ ফেরাতে স্পষ্ট দেখলাম রাজ্যের ঘৃণা সেখানে।

তক্ষুনি তর্ক তুললাম, 'ঘৃণা ওর চোখে ছিল না মমি, ঘৃণা ছিল তোদের চোখে।'

'কেন, জিজ্ঞেস করি ?'

'তোদের অহংকারে ঘা লেগেছিল যে। চোদ্দ পনেরো বছরের গরীব ছেলে, তায় বিকলাঙ্গ, তোদের দিকে হাঁ করে না তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সত্যিই তো অহংকারে চোট লাগে। লাগার কথাই তো।'

মুখ লাল করে মমি বলল, 'বুদ্ধি জাহির করতে গিয়ে ছোটো হয়ে যাসনে অদিতি।'

সত্যি রাগ হল, যা ইচ্ছে তাই বলবে। কথায় কান না দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম।

মমি অনেকটা নরম হয়েছে। 'কথায় কথায় রাগ, মেয়ে বটে! যা সত্যি, তাই তো বলেছি। আবার বলব। একশোবার বলব। ছেলেটা তো নিজেই বলেছিল, আমাদের ঘেন্না করে। শুনতে হয় শোন নয়তো ভারি বয়ে গেছে।'

বলে নিজের মনে বলে চলল, 'দলের সর্দার বাবরি চুল, বড়ো বড়ো পুঁতির মালা গলায়, ডুগডুগি বাজিয়ে উঠানে দুলে দুলে নাচতে শুরু করল। আজব খেল, বাবা বিশ্বনাথের ভেল্‌কি, লাগ্‌ ভেল্‌কি লাগ্‌, ঈশ্বর মহাদেবের জটাছিড়ে ভূমিতে লাগ্‌। এমনি সব সুরেলা বুক্‌নি বলতে বলতে ছেলেটিকে বাক্স থেকে তুলে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল। গড়িয়ে গড়িয়ে ছেলেটি আমগাছের গোড়ায় গিয়ে আটকে রইল, আমি চিৎকার করে উঠলাম। সর্দার বড়ো লাল লাল দাঁত বের করে হাসছিল। ছেলেটিকে উল্টে পাল্টে, চিমটি কেটে বলল, 'খুকুরানী ওর কিছু লাগে না গো,' আবার চিমটি কাটল। আমরা আরো কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। তারপর চট্‌পট্‌ বাঁশের খুঁটিতে দড়ি বেঁধে ওরা ওকে দিয়ে সার্কাস করিয়েছিল। দড়ির উপর দিয়ে ডিগবাজি খাওয়াল।

বাঁদরের মতো এ মাথা ও মাথা করাল। ছেলেটির নড়বড়ে দু-পা ফাঁসিতে ঝোলা মরার মতো হাওয়ায় দুলছিল। খেলা শেষে ওকে নামিয়ে সব বিশ্রাম করছে। আমাদের ভীষণ মজা লাগছিল। ও খেতে পারে কিনা তাই দেখতে ওকে খেতে দিয়েছিলাম। ছুটে গিয়ে ঘর থেকে লুকিয়ে খাবার এনেছিলাম। ও খাবারে হাতও দিল না। এক নজর দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আমরা হাসছিলাম, চেঁচাচ্ছিলাম, হাততালি দিচ্ছিলাম। থামতে ছেলেটি আমাদের দিকে তাকাল, বলল, 'আমাকে নিয়ে মজা করছিস? তোদের মুখে থুথ্‌ দিই।' ওর গাল বেয়ে ফোঁটা ফোটা চোখের জল মাটিতে পড়ে শুকিয়ে যাচ্ছিল। হাত দিয়ে না মুছে, পড়তে দিয়ে, মাটির দিকে তাকিয়ে কালো কালো জলের দাগে সে ওর পরাজয় দেখছিল।'

বাতিটা তেমনি জ্বলছে। ভাবছি মমি কি নিজের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে? না আমাদের বিচারে বসেছে। মাটিতে কালো দাগ জমতে দিচ্ছে না। যেন না আমরা বুঝতে পারি, যেন না আমরা সাবধান হতে পারি। যেন না তাকে করুণা করি।

৩

কদিন খুব জোর ঘর সংস্কারে মন দিয়েছি। হোস্টেল বদলানো সম্ভব নয়। খারাপ ভালোর সবই এক। পয়সার হিসেব আছে। ফলে ফাইভ স্টার নেই। দক্ষিণে যেতে পারি, সে হবে স্কুল থেকে তেপান্তর। মেরুর ব্যবধান। অগত্যা ঘরের ভোল বদলেই বাড়ি-বদলের স্বাদ নিচ্ছি। পর্দা আর আসবাবের স্থান পাল্টিয়ে বেশ নতুন নতুন লাগছে। টেবিল সরে গেছে খাটের মাথা থেকে। ফাঁকটা ভরিয়েছি দুটো শান্তিনিকেতনী মোড়া দিয়ে। খয়েরি চামড়ায় আঁকা সাঁওতালি ছেলে মেয়ে। দরজার ঠিক মুখোমুখি। সেদিন আর্ট গ্যালারিতে গিয়েছিলাম। তিনটে জাপানি ঘোড়া মন কেড়ে নিল। কিনে ফেললাম। এখন দেখছি সে ঘোড়ার আস্তাবল তো এ ঘর নয়। বেঁধে-ছেঁদে রেখে দেব কি? হাসলাম। কেন? কোন আশায়? ভবিষ্যতের? মমি-সুমন্তর বাসর আর বাড়ি-বদল মনে এল। হাসি পেল। মোড়ায় দাঁড়িয়ে দেয়ালে ছবিটা আটকাচ্ছি, অরুণা এসে হাজির। 'মাই গড্, এ যে চেনাই দায়। আমরা এখন কোথায় আছি? বাঃ কী সুন্দর পর্দার কাপড়টা।' ও জানালার দিকে এগিয়ে গেল। রাস্তা দেখা ওর রোগ।

জানালার বাইরেই মাদার গাছ। ঘরের দোরে যে লাগিয়েছিল এ গাছ তাকে ধন্যবাদ। বড়ো বড়ো পাতায় গাছটা ঢেকে আছে। ছবি টাঙিয়ে আমি গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে দিলাম। গাছটা না দেখতে পেলে দম আমার আটকে আসে। ওর গুঁড়িতেই গলির মুখ। গলিটায় রিকশার টুং টুং আওয়াজ হয় আর গাছটায় চড়ুইগুলি কিচির মিচির করে অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে।

অরুণা জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। বলল, 'তোমার এদিকটায় তবু রাস্তার মুখ দেখা যায়। আবার ছোটো একটা বারান্দাও পেয়েছ। আমারটা জেলখানা। তোমার ভাগ্যই আলাদা।'

হাসলাম। ভাগ্য না ভাড়া? সে কথা আর তুললাম না।

গুছোনো শেষ। ছুটির দিন। অরুণা সিনেমার লোভ দেখাল। কিন্তু আজ আমার বেরোনো অসম্ভব। রানাঘাট থেকে এক ভদ্রলোক আসছেন। মা ঘি মিষ্টি না কী সব পাঠিয়েছেন। চিঠিতে জানান দিয়েছেন। কখন আসবেন কে জানে! সুতরাং বাড়ি আগলে বসে থাকো। অরুণা উঠে গেল, আমিও চানে গেলাম। অনেকদিন মমির ওখানে যেতে পারি নি। আসছে সপ্তাহে

আবার স্কুল-ইনসপেক্‌শন। যাওয়া দায়। একগাদা কাজ জমে আছে। কটা চার্ট করতে হবে। কাল হেড মিস্ট্রেস ডেকেছিলেন। অদিতি অনেকদিন তো ঘুরে এলে, সামনে ইনসপেক্‌শন। এবার একটু মন দাও।

বাইরে গিয়েছিলাম, তার মাশুল দিতেই হবে। তাও আবার কাজের তাগিদে যাওয়া। বলতে হয়, পাঠিয়েছিলে কেন? তবু মুখ বুজে থাকি। সব মিলিয়ে এমন জড়িয়ে পড়েছি যে স্কুল ফিরতিও মমিদের বাড়ি যাওয়া হয়ে উঠছে না। সেই কবে লেখা নিয়ে চলে এসেছি আর ওমুখো হই নি। মা প্রতি চিঠিতে লেখেন: 'যখনই সময় পাইবে মমতাকে দেখিতে যাইবে। ইহাতে অন্যথা করিও না।'

অন্যথা করছি আরো অনেক কিছু। মন থেকে একটা তাগিদ ও জিজ্ঞাসা উন্মুখ হয়ে আছে তবুও। রাত্তিরে ওর লেখাটা টেবিলে দেখি। প্রতিজ্ঞা করি আজ পড়ব। কাল নিশ্চয় যাব। ঐ পর্যন্ত। পড়া হয় না, কাল আর আসে না।

মমির পঙ্গুতার চেয়ে ওর পরিবর্তন আমার কাছে বড়ো প্রশ্ন। সেদিন বিকেলে যে মমতাকে দেখে এলাম সে মমতা, আমার পুরোনো মমতা বা ওর ডাইরির মমতা, কারো সঙ্গে যেন কারো খাপ খায় না। লেখার শেষ অবশ্য পড়ি নি। যতটা পড়েছি সেখানে বরং উল্টো সুর, অভিযোগ, অভিমান। আর সেদিন সন্ধ্যার মমতা। মুখে অপার প্রশান্তি, যেন সাধিকা। রাগ, বিরাগ, সুখ, দুঃখের বাইরে নির্লিপ্ত নির্জন। স্বভাববিরুদ্ধ ওর এই শুদ্ধ প্রতিমাভাব, দেখে কেমন অস্বস্তি হয়, ভয় ভাবনা হয়। এক দমকায় নিশ্চয়ই এ পরিবর্তন হয় নি। দিনে দিনে এই যে অবস্থান্তর, সূক্ষ্ম পট বদলানো তা মমির যারা নিকট, আশেপাশে যারা ছিল, হয়তো তাদের চোখে ধরা পড়েছে, হয়তো তারা জানতে পেরেছে। আমার সে সুযোগ ছিল না। জানতে হলে ওদেরই সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু বলবে কে? মেসোমশায়কে জিজ্ঞেস করা যায় না। রীনা ছেলেমানুষ। এক সুমন্ত। ওর সঙ্গে আমার তেমন অন্তরঙ্গতা নেই। ও মমির সম্পত্তি, অ্যাদ্দিন এই জেনে এসেছি; এই মেনেছি। সুযোগ পেলে এবার ওর কাছ থেকেই বোঝার চেষ্টা করব। মমিকে টানতে হবে; স্বাভাবিক করতে হবে।

ইনসপেক্‌শনের পরদিন ক্লাশ থেকে সোজা ওদের বাড়ি গেলাম। বাস থেকে নেমে কয়েক পা এগিয়েছি, রীনা স্কুল ফিরতি দূর থেকে আমায় দেখে

চ্যাঁচাচ্ছে, 'অতুদি!' পিঠে ব্যাগ ফেলে ছুটতে ছুটতে এল, কাছে এসে কিন্তু চট্ করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, 'কথা বলব না। এতদিন আসো নি কেন?'

আদর করে কাছে টানলেই সব ফুরিয়ে যায়। টানি না। অভিমান দেখতেই এক মজা।

কথা বলছে না। কী আর করা। আমিও উদাস আকাশ দেখছি। আড়চোখে তাকাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম। দুজনেই হো হো করে হেসে উঠেছি। তাইতেই কি রীনা হার মানবে? পা ঠুকে মাথা নেড়ে, ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'ভেবো না কথা বলছি। কখনো বলব না।'

কঠোর প্রতিজ্ঞা। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন। উল্টো দিক থেকে কয়েকটি মেয়েকে নজরে আসতেই আর তর সইল না। চ্যাঁচাতে লাগল, 'ডলি তোরা তৈরি থাকিস, আমি এক্ষুনি আসছি।' তারপরই আমাকে খবর দিল, 'জান অতুদি আমরা ক্লাব করেছি। থিয়েটার করব। তোমার কিন্তু টিকিট কিনতে হবে। তারপর নাটকের লম্বা ফিরিস্তি।

সামনে রাস্তার কল থেকে জল পড়ছে। তলায় এখানে, ওখানে, খাবলা খাবলা সিমেন্ট ওঠা, জল জমে আছে। একটা কাক ডানা ঝাপটিয়ে চান করছিল পাশ দিয়ে যেতে যেতে গিয়ে রীনা এক আঁজলা জল কাকটার গায়ে ছিটিয়ে দিল। ভিজে পাখায় কাকটা একটু দূরে বসে লাল জিভ করে বের তাকিয়ে আছে।

বেলা শেষের রোদ বড়ো বাড়িটায় আটকে গিয়ে রাস্তায় অনেকটা ছায়া ফেলেছে। মোড় ফিরতেই মাঠে ছোটো ছোটো বাচ্চাদের ভিড়, খেলছে।

রীনাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মমি সারাদিন কী করে রে রীনা?'

গম্ভীর মুখে ঠোঁট চেপে রীনা এখন অন্য এক মেয়ে। বলল 'অতুদি, দিদি অনেক বদলে গিয়েছে। আজকাল অবশ্যি অনেকটা ঠিক, কিছু বলে না, চুপচাপ; তবু দিদিকে আমি, বুঝতে পারি না।'

'কী রকম রীনা?' উৎসুক আমি প্রশ্ন করলাম।

রীনা ভাবছে, দু-একবার বলতেও চেষ্টা করছে। তারপর দিল হাল ছেড়ে, 'তোমায় ঠিক বোঝাতে পারছি না অতুদি। কী করে যে বোঝাব বুঝতে পারছি না। তুমি তো এখানে ছিলে না। প্রথম প্রথম দিদি খুব কান্নাকাটি করত; রাগ করত, তারপর হঠাৎ কেমন একদম দমে গেল, চুপ মেরে গেল। বাবা তখন বড্ড ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। আমায় শুধু বলতেন, মমি তোর সঙ্গে

কথা বলে রীনা? ও না বলুক, তুই কথা বলিস, কাছে কাছে থাকিস। সুমন্তকে আসতে বলিস। কত রাত যে বাবা দিদির ঘরে একঠায় কাটিয়েছেন। তখন যদি বাবাকে দেখতে। তবে আজকাল দিদি অনেক স্বাভাবিক, তা-ও কেমন যেন।' রীনা অন্যমনস্ক কী যেন ভাবছে।

মমি কী বলে, কী করে দিন কাটায় সে কথা জিজ্ঞেস করতে রীনা বলল, 'কী আর করবে! তবে আজকাল, বললাম না, অনেক ঠিক। আমাকে পড়ার কথা বলে, স্কুলের কথা। বাবার দেখাশুনা কোনো দিনও তো তেমন করত না, তাও করে। সুপ্রিয়াদির সঙ্গে মাঝে মাঝে বেড়াতেও যায়। কিন্তু—'কী যেন বলতে গিয়ে রীনা চুপ করল।

'অতুদিকে বলতে হয় রীনা।' ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'বলে ফেল।'

'কী করে তোমাকে বোঝাব অতুদি। নিতাই এলে দিদি এমন করতে থাকে। আরো বেশি সুমন্তদা যখন আসে। আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমার এত বিশ্রী লাগে।'

'নিতাই কে?'

রীনা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'ঐ হাসপাতালের একটা লোক, নোংরা, গেয়ো, সারাদিন বসে বসে দিদির যত সব রাজ্যের গল্প। সুমন্তদা এলে আদ্ধেক দিন দেখাই করে না। দেখা করলেও এমন ভাব।' রীনা সোজা আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'অতুদি তুমি দেখে নিও, আর কদিন বাদে সুমন্তদা আর আমাদের বাড়ি আসবেই না।'

'সুমন্তদা বুঝি রাগ করেন?'

রীনা দাঁড়িয়ে গেল। 'রাগ করবে না? দেখা হলেই তো দিদি শুধু ঝগড়া বাধায়।' রাগে দুঃখে রীনা মাঝখানটায় বেশ ব্যবধান রেখে হাঁটতে লাগল।

কাছে গিয়ে বললাম, 'মেসোমশায় এসব জানেন রীনা?'

'বাবা কী করে জানবেন? বাবা ভাবেন দিদি খুশি থাকলেই হল। বাবাও তাই নিতাইকে আশকারা দিতে ওস্তাদ।' আর কথা নয়, উদ্ধত প্রতিবাদে রীনা হাঁটছে।

রীনার মধ্যে মেসোমশায়ের আদল অনেকটা। তেমনি তেজী, উদ্ধত, অহংকার, আস্থা, কাটা কাটা চোখ নাক। কিন্তু মুখের যেখানটায় আত্মবিশ্বাসের স্থল, সেই চিবুকে এসে হঠাৎ ছাঁচ বদলে মিষ্টি মেয়ে ছন্দ এনে দিয়েছে। এখানটায় ওরা মাসিমার মতো। মমিও।

যতটা ভেবেছিলাম রীনা যেন আর ততটা ছেলেমানুষ নেই। এ বয়সেই মাসিমার অভাব, মমির অ্যাকসিডেন্ট বাড়ির গুমোট ওকে তাড়িয়ে বড়ো করে তুলেছে। ফিরে এসে মেসোমশায়কে দেখি নি। মমির এ অবস্থা, না জানি মেসোমশায় কী ভাবে নিয়েছেন। রীনা ততক্ষণে ভেতরে। মালি বাগানে জল দিচ্ছে, আমাকে দেখে পাইপ ঘুরিয়ে সামনে দাঁড়াল। 'অনেকদিন আসেন নি দিদিমণি, কেমন আছেন ?'

'এখানে ছিলাম না, তোমরা ভালো ?'

একমুখ হেসে মালি বলল, 'আপনাদের দয়া।'

মাসিমা সারাদিন মালি চাকর বাকরের পেছন পেছন ঘুরতেন। এ গাছের গোড়া, দেয়ালের কালি, ও ঘরের মেঝে সারাদিন ঐ করে বেড়াতেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিষ্কার করানো ছিল বাতিক। মাসিমা নেই, বাড়ি কিন্তু তেমনি চকচকে রয়েছে। লাল সুরকির রাস্তার দুপাশে বাগান, পেছনের দেওয়াল ঘেঁষে সজনের ছায়া। সিঁড়ির পাশে টবে ফুল, বারান্দায় তেমনি সাজানো বেতের চেয়ার, সব ছিমছাম। দেখছিলাম। কী এক বেদনা নিয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ থামের পাশে চোখ পড়তে গলা চিরে আওয়াজ বেরিয়ে এল। আঁৎকে উঠলাম। মাথা, ধড়, বুক, পেট, কোমর অবধি এসে থেমে গিয়েছে। চৌকো বাক্সের মতন একটি মানুষ, থামের পাশে বসে আছে। মুখ দেখতে সাহস হয় নি। এক ঝটকায় চোখ ফিরিয়ে প্রায় ছুটতে শুরু করলাম।

এক টুকরো ছবি, কোনো এক মুহূর্ত, মাঝে এমন করে চোখের সামনে ধরা পড়ে, জ্যান্ত হয়ে ওঠে যে সেই স্থান, রোদ, হাওয়া, মুহূর্ত, সব এক অসম্ভব অমর হয়। মনে হয় না সে বাতিল, বিগত। বাবাকে মাঝে মাঝে আমি এমনি করে পাই। বাবার কথা, হাসি সব যেন আবার আমায় তেমনি ছুঁয়ে যায়। আমায় চুমু খায়, কথা শোনায়, কথা বলায়। এক এক সময় আপন মনে কথার জবাবও আমি দিই। বাবার গাল ছুঁই। কলেজের পথে বাবা আমায় স্কুলে পৌঁছে দেয়। ছুটির দিন বাবার হাত ধরে খেলনার বালতি হাতে লেকে সাঁতার কাটতে যাই। পেটের তলায় বাবার হাত, আমি হাত পা ছুঁড়ি। জল ছিটকে বাবার চোখে মুখে পড়ে, মুখ ঝাপ্‌সা দেখায়, যেমন দেখায় দূরের মুখ। জন্মদিন, জামা জুতো পরে দুই বিনুনি ঝুলিয়ে বাবার হাত ধরে নিউমার্কেটে যাই।

'কী কিনবে সোনা ?'

'বই আর চশমা, আর লালপুতুল, আর চকোলেট আর জুতো।'

'চশমা দিয়ে কী করবে?'

'তোমার মতো চশমা পরে বই পড়ব।' বাবা হাসছেন। কালো ছিপছিপে, চশমা চোখে বাবা আমার।

জন্মদিনের লাল ফ্রক, গোলাপি হাত পা পুতুল, সারাদিন আমার কোলে কোলে। রাত্তিরেও বিছানায়। এক মিনিটও চোখের আড়াল হতে দিই না। একদিন পাশের বাড়ির কুকুর ওর পা দুটো টেনে ছিঁড়ে নিল। ঘুম ভেঙে দেখি পা নেই; পুতুলের ধড় বসে আছে। চোখ বুজে মাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। 'ওটা ফেলে দাও।'

আজ লিখতে বসে লোকটার সেই বীভৎস মূর্তির সঙ্গে ছেলেবেলাকার একটি ভাঙা পুতুলের কাহিনী মিলিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু সেদিনের সেই অকস্মাৎ আঘাতের মুখে এমনি কোনো সমান্তরাল ভাব, কি কোনো ছবি, মনে দাঁড়াতে পারে নি। সতত্ই আমার চোখ লোকটার বেয়াড়া চেহারার বিপরীতে এক ঝটকায় ঘুরে গিয়েছিল। রাস্তায় কুষ্ঠরোগী দেখে এমনি আমার পা অজ্ঞাতে অন্য ফুটপাতে চলে যায়। শাড়ির আঁচল নাকের ডগায় উঠে আসে। পচা গন্ধের সম্ভাবনায় নয়, এক দুরপনেয় ঘৃণা যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কুঞ্চন এনে দেয়, ঘাড় অন্যদিকে বেঁকে যায়। মাংসের বিকৃতি কিভাবে জানি মনুষ্যত্বের অবমাননার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বুদ্ধিতে তার বিচার নেই, সেখানে শুধু সমবেদনা আর অনুকম্পা। অথচ বুদ্ধির অন্তরালে মন ঘেন্নায় ভরে ওঠে, গা বমি বমি করতে থাকে। লোকটার উপস্থিতি অস্বীকার করতে অন্য কিছু দেখতে আপ্রাণ চেষ্টা করছি। রোদ্দুরটা তেরছা হয়ে বারান্দা থেকে সরে যাচ্ছে। ভাবলে কেমন হয় উঁচু ভিত থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ছে। এমনি কোনো রোদ্দুরে মমতার সেদিনকার দুর্ঘটনার ছবি পরিষ্কার ভেসে ওঠে। মুহূর্তে দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে যায়। লোকটার কাটা পায়ের বীভৎসতার ভিতর দিয়ে মমির শাড়ির নীচে তাকিয়ে থাকি। সেখানে ওর অসাড় পা বেঁকেচুরে খড়ি ওঠা চামড়ার সঙ্গে মিলেমিশে স্থির হয়ে আছে। এতদিন ভালোবাসায় এ বিকৃতি চোখে পড়ে নি। আজ লোকটাকে দেখে বুঝতে পারলাম সেখানেও সমবেদনার পাশাপাশি এক অজ্ঞাত ঘৃণা জায়গা করে বসে আছে। নিজেকে কি নীচ, ছোটো, দোষী মনে হচ্ছে না? মমিকে আমি কি ঘুরিয়ে প্রতারণা করছি না? এই লোকটাকে এড়াতে না পারলে আমি আর মমির মুখোমুখি দাঁড়াতে পারব না। বাগানটা তাড়াতাড়ি

এড়িয়ে যেতে হবে। থামের আড়ালে যেখানে লোকটা কাটা পা তুলে কী যেন খুঁটছে সেদিকে না তাকিয়ে ছুটে ভেতরে চলে যাব।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকছি, হুইল চেয়ারে মমি বসার ঘরে বেরিয়ে এল। পশ্চিম খোলা ঘর, বিকেলের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। ঐ আলোয় শাদা পায়জামা, ঢিলে জামায়, পা অবধি ঢাকা। চেয়ারের হাতলে দু-হাত। শান্ত মুখশ্রী মমিকে দেখে আমার সমস্ত যন্ত্রণা, ধুয়ে, মুছে, নিঃশেষ হয়ে গেল। আমার পাপবোধ ওর কাছে ক্ষমা চাইল। আমি খুঁটিয়ে ওর সমস্ত মাধুর্য দেখছি। হাতের মুদ্রার মতো মুখের আদল চন্দ্রাভ, অর্ধচন্দ্রাকার কপাল ঘিরে চুলের ঘের, চিবুকের কাছে টোল, সব যেন একটানে আঁকা, খুব সহজ ছন্দের গুণে, মনে রাখা সোজা। হঠাৎ কেবল দুচোখের তির্যক সবকিছুকে চমকে দেয়। আগে মুখের সুডৌল ছাঁচের সঙ্গে দৃষ্টির এ বৈষম্য আঘাতের মতো লাগত। মনে হত যতটুকু দেখছে, তার চেয়ে বেশি উদ্‌ঘাটন করছে। আজ বিস্ময়ে দেখলাম ওর দৃষ্টি অনেক শান্ত। নিভাঁজ মুখের সঙ্গে একাকার আর এই দুইয়ে মিলিত সারল্য একছাঁট জামার সঙ্গে এক হয়ে মিশে মুখে চোখে জামায় মাখামাখি হয়ে অন্য এক মমি বসে আছে।

আমার হতবাক মুখে তাকিয়ে মমি বলল, 'কী দেখছিস অদিতি?'

আমার ঘোর তখনও কাটে নি। বললাম, 'তোকে!'

'দেখাব কী আছে?' বলল না হেসে। তারপর এতদিন না যাওয়ার অনুযোগ নয়, রাগ নয়, এমনি সহজ স্বাভাবিক সে, যেন চিরকালই আমি এখানে থাকি।' বলল, 'স্কুল ফিরতি এলি, হাতমুখ ধুয়ে নে।'

সেন্টার টেবিলে বই ব্যাগ রেখে সোফায় বসে পড়লাম। না বলে পারলাম না, 'মমি আজ তোকে এমন আশ্চর্য দেখাচ্ছে। তোর এ পোশাক কে বানিয়েছে রে?'

মুখ নীচু করে মমি জামার দিকে তাকাল। শাদা পায়জামার ওপর শাদা জমিতে ছোটো ছোটো নীল ফুল, গলা থেকে ফ্রিল দেওয়া লম্বা কামিজ, কনুই অবধি হাতা। ও জামাটা টান করল, বলল, 'দর্জি।'

'ভেবেছিলাম তুই-ই করেছিস।'

'বলি নি তোকে, আমি আর কিছুই গুছিয়ে করতে পারিনে। আমি আর আমার নিজের কিছুতেই নেই। নতুন লাগছে, তাই না?'

'নতুনের কথা নয়, এতে ভারি ছেলেমানুষ আর কি জানিস, এমন পবিত্র দেখাচ্ছে।'

ও হাসল। 'কী যা তা বলিস।'

'যা তা নয় মমি সত্যি বলছি।'

বীনা এসে ঘরে ঢুকল। স্কুলের জামা কাপড় ছেড়ে পরিষ্কার হয়ে এসেছে, 'দিদি আমার খাবার ?'

মমি ঘুরে বলল, 'খাবার দেয় নি ? ঠাকুরকে বল, নয়তো সুমতিকে ডাক।'

'আমার সময় নেই, আমি চললাম। রোজ বলি খাবার ঠিক করে রাখতে, একদিনও যদি রাখ, আমি খাব না!' বীনা রেগে মেগে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মমি ওর হাত চেপে ধরল। 'অদিতি, শিগগির সুমতিকে ডাক, নয়তো চলে যাবে। আজকাল ও কি সাংঘাতিক রকম ব্যস্ত সে খবর তো রাখিস না।'

'ফাজলামো কোরো না দিদি। ছাড়ো বলছি।'

'ফাজলামো কেন করব ? ঠিক তো বলছি, তোর সময় কোথায় ?' আমাকে চোখ টিপল, 'ওকে এখন থেকেই তোয়াজ কর অদিতি, পরে আর নাগাল পাবি না, ও এখন একজন উদীয়মান অভিনেত্রী।'

সুমতি একগ্লাস দুধ নিয়ে এসেছিল। এক চুমুকে দুধ শেষ করে বীনা বেরিয়ে যেতে যেতে শাসাল, 'ফাজলামি করছ, দেখবে একদিন।'

মমিকে বললাম, 'কোথায় গেল ? ক্লাবে ?'

'নয়তো আর কোথায় ? সারাদিন ঐ করছে। তা তুই জানলি কী করে ?'

বলতে যাচ্ছিলাম একসঙ্গে এলাম। সুযোগ না দিয়ে মমি তাড়া দিল, 'এবার তোর কথা বল। অনেকদিন তো আসিস নি।'

এবার দোষ স্খালনে তৎপর হলাম; 'করি কী! অ্যাত্তো কাজ জমে ছিল। তার ওপর স্কুল ইনস্পেকশন। স্কুলের নতুন বাড়ি হচ্ছে। এত সব ঝামেলা। বিনতার টাইফয়েড। ওর ক্লাস নিতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে ওকে দেখতেও যেতে হয়। তার উপর বাড়ির হাজার ফরমাস,' বলতে বলতে মমির ওপর চোখ পড়ল, ওকি কিছু শুনছে ? না শুনুক। এত জবাবদিহির কী আছে ? আসি নি, আসা হয় নি, ব্যস্।

বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মমি আমার ওপর চোখ রাখল। 'থামলি কেন ? তোর কথায় আবার যেন সব দেখতে পাচ্ছিলাম। স্কুলের বিল্ডিং কোনদিকে উঠছে ? ওখানে ক্লাস হবে, না হোস্টেল হবে ? তোদের হেড মিস্ট্রেস কি আরো মুটিয়েছেন ?' মমি হেসে উঠল, 'মনে আছে অদিতি একদিন তোদের হেডের পায়ে পায়ে থপ্ থপ্ করে পেছন দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটছিলাম, হঠাৎ উনি পিছন

ফিরে চাইলেন। আমার তখন যা অবস্থা! এক পা সামনে, এক পা পেছনে স্লো মোশনের তালিমে দাঁড়িয়ে, তারপরই ছুট। বাব্বা!'

দুজনেই হাসতে লাগলাম। মনে রাখার কী আর কথা, তবু।

চেয়ারের হাতলে চাপ দিয়ে শরীরটাকে উঁচিয়ে মমি ঠিক হয়ে বসল। তখনও হাসছে, 'বাব্বা কী পাগলামিই তখন করতাম।' তারপর আচমকা চুপ। একটু পরে ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'লেখাটা পড়েছিস অদিতি?'

কী বলব? পড়েছি বললে মিথ্যে হয়। বড়ো জোর, মমতাকে খুঁজতে খানিকটা এদিক ওদিক হাতড়েছি। ঐ পর্যন্ত। বলতে বাধছে, ঘুরিয়ে উত্তর দিলাম, 'ওপর ওপর একবার চোখ বুলিয়েছি মমি। ভালো করে আবার পড়ব।'

মমির মুখ এখন বোঝার বাইরে, বেঁকে যাওয়া পিঠ সোজা করে বলল, 'হ্যাঁ পড়ে দেখিস। আলাদা এক জীবনের খোঁজ পাবি।' বলে সামনে এগিয়ে এল যেন মিনতি করছে, 'যাবি একদিন হাসপাতালে? দেখবি সম্পূর্ণ আরেক জগৎ ওদের কথাই আমি লিখেছি। একদিন চল জলজ্যান্ত ওদের দেখে আসবি।' তারপর কী মনে পড়তে বলল, 'দাঁড়া একজন এখানেই রয়েছে। ডাকছি।'

শিউরে উঠলাম। যে আতঙ্ক থেকে এক্ষুনি পালিয়ে এলাম, বুঝতে পারছি মমি তাকেই ডাকতে চাইছে। তাড়াতাড়ি বাধা দিলাম, 'না, না, ডাকিস্ না আমি দেখেছি।'

ওর চোখে মুখে উৎসাহ, আমার কথায় কানই নেই। বলল, 'দেখেছিস? কোথায়? বাইরে বসে আছে নিশ্চয়। অদিতি, অতি জটিল চরিত্র। কারণ অবশ্য খুব সহজ। দাঁড়া ডাকছি, কথা বলে দেখ। আজ কদিন থেকে আবার কাজ ঠিক করে দিতে বায়না ধরেছে। দেশে নাকি আর যাবে না, কী করি বলতো?'

আমি কী বলব? কোথাকার একটা খোড়া লোক, যাকে মনে করতেই অস্বস্তি জানা নেই, শোনা নেই, তার কথা শোনার আমার কি আগ্রহ থাকতে পারে? তার ঐ মূর্তি! কী করে এড়াব ভাবছি, রমেশ এসে ঘরে ঢুকল, হাতে পাউরুটি, কলা, ঠোঙায় যেন কী। রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে।

মমিকে বলল, 'দিদিমণি দাদাবাবু আসছে।'

মুহূর্তে মমির মুখ থম্‌কে গেল। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। হুইল চেয়ার ভেতর-মুখো ঘুরিয়ে আবার চাকা সোজা করে বসল। একবার যেন অস্ফুট কিছু বলল। তারপর বেপরোয়া দরজার দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

হাতে ব্রিফকেস্ সুমন্ত এসে ঘরে ঢুকল। অনেকদিন পর দেখা, হাসপাতালে দেখেছিলাম জানালা ঢেকে দাঁড়ানো, আর আজ। যেন আজও সেই স্তব্ধতা কাটে নি। গম্ভীর মুখে এখনো ঘোর, সুমন্তর ছায়া আমাদের ওপর। যদি বলি মমির এই ব্যাকুল অস্থিরতা, সুমন্তর ছায়া, রানার সব রাগের কথা, সব মিলে আমারও গা ছম-ছম করতে লাগল—তাও ভুল হবে না।

আমাকে দেখে সুমন্ত মুহূর্ত দাঁড়াল তারপর পিছিয়ে সোফায় বসে বলল, 'আপনি? কবে ফিরলেন?'

সৌজন্যে সত্তত্তর দিলাম।

মমি উসখুস্ করছে। কী করবে যেন ভেবে পাচ্ছে না। সুমতিকে ডাকতে লাগল।

টেবিল থেকে সকালের কাগজ তুলে নিয়ে সুমন্ত বাধা দিল, 'ব্যস্ত হয়ো না। আমি চা খেয়ে এসেছি।' সিগারেট জ্বালিয়ে সুমন্ত কাগজ পড়তে লাগল।

কাগজে ঢাকা সুমন্তকে কয়েক মুহূর্ত দেখে মুখ ফিরিয়ে মমি আবার আরম্ভ করল, 'কী বলছিলাম অদিতি হ্যাঁ, দেশে নাকি আর যাবে না। ও বলে কি জানিস? বলে কোথায় যাব দিদি! অন্ধকারে সবাই ভূত দেখে ভিরমি যায়। দিনে দল বেঁধে সং দেখতে আসে। তার চেয়ে এই ভালো আছি। বাবুকে বল দিদি আমাকে একটা কাজ ঠিক করে দিক।'

আমার জানার কথা নয়, এ ভান না ভাব না। মমি শুধু নিতাইয়ের কথায় মশগুল। ওর কথার মাঝে সুমন্ত কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে, ওর ডান হাত সোফার কোণটাকে চেপে ধরেছে। বুড়ো আঙুল ছেড়ে চারটে আঙুলই নীচে, আঙুলগুলো এত জোরে চেপে ধরেছে যে সমস্ত কোণটা কুঁচকে আছে। সোফার কোণ ও আঙুলগুলো দেখতে দেখতে মনে হল সুমন্তর মুখ কিংবা মুখপ্রতিম মনেও কি এমন কোনো কুঞ্চন? অবাক লাগছে সুমন্তর মুখ আমি কখনো খেয়াল করে দেখি নি। মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। দুর্ঘটনার দিন দুপুরেও সুমন্ত মমি এসেছিল। পরদিনই আমার কলম্বো প্ল্যানে টিচারস্ ট্রেনিং-এ বিলেত যাওয়ার কথা। আমার কার্ডিগানটা মমির কাছে ছিল। দিতে এসেছিল। তাছাড়া চলে যাচ্ছি, যতক্ষণ দেখা যায়, একসঙ্গে থাকা যায়।

মমি অবশ্য বেশিক্ষণ থাকতে পারছিল না। ওকে সেদিন সুমন্তর কী এক বিশেষ দরকার। সুমন্ত তাই সঙ্গেই এসেছিল।

লাগেজে বিশ কিলোর বেশি পাব না। এদিকে মেয়েদের যা হয়, ম্যাচিংয়ের ব্যাপার, কোনো কিছুই ছাড়তে পারছি না। একবার গুছিয়ে সুটকেস হাতে তুলে দুবার নাচাই। হয় কম, নয় বেশি, মনে ধরে না। ক্ষেপে গিয়ে মমি হাল ধরল নিজেই এবার। বললে, 'দাঁড়া আমি ঠিক করে দিচ্ছি।' বলেই গুঁজতে শুরু করে দিল কিছু এ কোণে, ও কোণে, কিছু পকেটে, ল্যাপে সব জায়গায়। স্তূপ কমছে, আমিও মুগ্ধ।

হঠাৎ উঃ বলে মমি আঙুলটা চেপে ধরল। নখের কোণ বেয়ে মেঝেতে টপ করে লাল একটি ফোঁটা টলটলে দানা, গোলাকৃতি, মাটিতে পড়ে চেহারা বদলাচ্ছে চারদিকে সুতোর মতো কয়েকটা লাইনে মাকড়সা সাঁড়াশি বাড়াচ্ছে। আরো কয়েকটা ফোঁটা। ইস্ এতটা কেটেছে! ডেটল তুলোয় আঙুলটা চেপে ধরলাম।

ভারি চোখে লাগছিল সুমন্ত তবু নড়ছে না উঠছে না, দ্রুত এক নজর দেখে তাড়াতাড়ি ম্যাগাজিনের আড়ালে মুখ ঢেকেছে। ওষুধ দিয়ে বাঁধা ছাঁদা যখন শেষ হল, তখনই শুধু মুখ খুলল।

আমার মনে হল যেন বানানো। আমাকে শোনাতে বুঝি বলল, 'রক্ত আমি একদম সহ্য করতে পারি না। রক্ত দেখলে আমার গা গুলোয়, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, বলতে কি রক্ত দেখলে আমার মাথায় খুন চাপে।' নাটকীয়, মমির হাসিও নাটকীয়, 'ওহ আমার বীরপুরুষ!' তখন সুমন্তর মুখ ম্যাগাজিনের আড়াল থেকে মুক্ত। তবু আমি তাকাচ্ছিলাম না। কী রকম বিরূপ হয়ে গিয়েছিল আমার মন।

কথা ছিল মমিদের বাড়ি থেকে পরদিন আমি এয়ার পোর্টে যাব। প্রতাপ নিয়ে যাবে। ওরা বেরিয়ে গেল, আব তার পরেই ঘটনা কোন দিকে যে মোড় নিল!

এমনি মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, বাস, ফুরিয়ে গেছে। কোনোদিনও সুমন্তকে খুঁটিয়ে দেখি নি। বিশেষত্বের খোঁজ করি নি। সত্যি বলতে সুমন্তর সম্বন্ধে আমার কখনো কোনো কৌতূহলই হয় নি। এ রাগ বিরাগের কথা নয়। আমার কাছে ওর মূল্য পরোক্ষ এমনকি মূর্তিও, যা কিছু সব মমিই আড়াল করে রেখেছে। বিকেলে রীনার কথায় বরং একটু কৌতুহল বোধ করেছি, এতদিন পর একবার ভালো করে দেখব ভাবছি, তাকিয়ে দেখি আমার ভাবনার ফাঁকে কখন উঠে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখ ফেরানো। আমি চুপ করে, সুমন্ত বাইরে তাকিয়ে; মমি নীরবতা ভাঙল, 'সুমন্ত তোমার ফ্যাক্টরিতে নিতাইয়ের কাজ ঠিক করে দেবে? পা নেই, কিন্তু প্লাস্টিকের পা আছে, তা পড়ে বেশ

ভালো হাঁটতে পারে। তাছাড়া বসে কাজ হলে তো কথাই নেই। দেবে ওকে একটা কাজ ?'

মুখ ফিরিয়ে গভীর নিবিষ্টতায় সুমন্ত মমির কথা শুনছিল। সিগারেট বাইরে ছুঁড়ে এখন এসে মমির মুখোমুখি সোফায় বসল। বসে ঠোঁটের কোণ মুছল, হাত দিয়ে পেছনে চুল ঠেলে দিল, সোজা তাকিয়ে বলল, 'থামলে কেন ? তোমার নিতাইয়ের জন্য আর কী উপকার করতে হবে, আর কী ভাবে আমায় ব্যবহার করবে, সব ঠিক করে নাও। আমি বসছি!'

হঠাৎ এমন রূঢ় কথায় আমি কেমন হক্‌চকিয়ে গেলাম। মমি কিন্তু স্তব্ধ হয়ে রইল। আগে হলে প্রত্যুত্তর সুমন্ত ঠিকই পেত। কিন্তু আজ মমি অন্য। কিছুক্ষণ হয়তো ভাবনা গুছিয়ে নিল। তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'এ সামান্য কথায় কেন এত রাগ করছ, তা আমি কি বুঝি না সুমন্ত ? কিন্তু এ তোমার মিথ্যে রাগ। তুমি কি ভেবেছ, তোমায় দুঃখ দিয়ে, দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে আমার লাভ ? আমার দুঃখের অভাব কী ? তবু তুমি কিছুতেই বুঝতে চাইবে না। এই যে হুইল চেয়ারে বসে আছি, বসে বসে তোমাদের চলাফেরা দেখছি, আর আমি চলছি না, রাত্তিরে সুমতিকে পাশ ফিরিয়ে দিতে ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছি, তুমিও আজ আমায় বুঝবে না। আমার যা বোঝা, তোমার কাছে আজ তা অসাড়, আমার যা ভাব, তোমার কাছে তা একটা ভার, তাও কি আমার দুঃখের যথেষ্ট নয় ?'

মমির হুইল চেয়ারের দিকে সুমন্ত এগিয়ে এল। 'তাহলে আমার এখানে বসে থাকাটাও নিশ্চয় নিরর্থক, তেমনি অসার। আমার ছায়াও তোমার কাছে তেমনি দুর্বহ ভার।'

সবই যেন মমি পূর্বাহ্নে ভেবে রেখেছে। অবলীলাক্রমে সুমন্তকে বলতে লাগল, 'তুমি এভাবে ভাবছ কেন ? আর তুমি বসে থাকবেই বা কেন ? তোমার আমার মাঝে তো আর কোনো অভিযোগ নেই, কোনো দাবি দাওয়া নেই। কবে কী ছিল, কবে কী হয়েছিল, কী হতে পারত, তার দায় নেই দাবিও নেই।'

সুমন্ত বিদ্রূপে আঘাত হানল। 'তাহলে বল নতুন পাতা উলটোচ্ছ ? কনগ্র্যাচুলেশন্‌ !'

মমি সুমন্তর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভাবে হাসল। ঠোঁট দুটো খুলতে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে থেমে মুখের ভাঁজ, চোখ মুখ নাক সব স্থির করে দিল, আধ

খোলা ঠোঁট দুটো ওকে এত দুঃখী, এত অসহায় করে দিল, আমি ওদিকে তাকাতে পারছিলাম না, অনেকক্ষণ এমনি মমি বসে রইল, যেন সব ভুলে গেছে, সুমন্ত; আমি, এই ঘর সব। তারপর কোনো একসময় নিজেকেই যেন শোনাল, 'ঠিক বলেছ, একবছর, না কি তারও বেশি, মনে হচ্ছে কতবছর থেকে যেন এই হুইল চেয়ারেই আমি। খাটে শুয়ে দেখি সুমতি চেয়ারটাকে এখান থেকে ওখানে সরাচ্ছে। চাকাটা ঘুরছে। আমার ভাবনাও যেন থেমে যায় নি সুমন্ত। শুধু জায়গা বদলেছে।'

সুমন্ত বুঝি আজ সব হিসেব নিকেশ করতে বসেছে। দাঁড়িয়ে উঠে অন্ধ আঘাত করল, 'তাহলে বলতে চাও চলতে পারো না বলেই তুমি আজ আমার কাছ থেকে সরে গিয়েছ?'

মমি ওর হাত চেপে ধরল, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো? কেন এমন অবুঝের মতো করছ?'

সুমন্ত অসহিষ্ণু, ওর হাত ছাড়িয়ে নিল। সরে গেল, বলল, 'নিজেকেই জিজ্ঞেস কর। তুমিই বা কোথায় বুঝতে চাইছ? আজ একবছর ধরে তোমাকে যা বলছি, আর ক্রমাগত বলেই চলেছি তুমি কি তা শুনছ? তাছাড়া মা তোমাকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছেন। তুমি আমার। তার কি কোনো মূল্য নেই? তার কী উত্তর?'

চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত করে ধরে মমি ঢোঁক গিলল, তারপর একটানা বলতে শুরু করল। যেন অগ্রিম, সব চিন্তা, অনেক আগেই নিষ্পন্ন। 'অনেকদিনই জিজ্ঞেস করেছ আর তার জবাবই তোমাকে দিচ্ছি, যা স্বাভাবিক নয়, যা হয় না, তা করতে বোলো না, পারব না। রাগ কোরো না। আমাকে যে আজ বিয়ে করবে, তার কত কিছু চাই, দায়িত্ব, কর্তব্য, অনুকম্পা, আদর্শ—নয়তো ধরে নাও ভালোবেসেই আমায় বিয়ে করলে। তারপর? দিনের পর দিন আমি শুয়ে থাকব। অফিস ফেরত তুমি একা চুপচাপ বারান্দায় বসে থাকবে। সেখানে তোমার ভবিষ্যৎ। আত্মত্যাগ তখন তোমায় বাঁচাবে না, না ক্ষমা দেখাবে ভালোবাসা। তখন শুধু দেখবে চাপ চাপ অন্ধকার আর সব শেষ হোক, এমনি কামনা, আমার মৃত্যু কামনা।'

সুমন্ত মমির দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে। এগিয়ে গেছে কয়েক পা, বলছে, 'আচ্ছা চলি!' তারপর হঠাৎ ঘুরে, যেন বিষ ঢেলে দিয়ে বলল, 'নিজেকে দিয়ে অপরের বিচার করতে যেও না মমি!'

অনেক আগেই আমার উঠে যাওয়া উচিত ছিল। আমার উপস্থিতিতে সুমন্তর এই যে নাটুকেপনা এ যেন দর্শকের হাততালির অপেক্ষায়, দেরি হলেও আমি ইতস্তত করে উঠে দাঁড়ালাম, চকিতে মমি হুইল চেয়ার ছুটিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরল। 'না অদিতি তুই যেতে পারবি না। আমি আর পারছি না, কবে থেকে যে শুরু হয়েছে, দিনের পর দিন, চলেছে তো চলেছেই। তার নিষ্পত্তি আজ তোর সামনেই হয়ে যাক।'

বলতে বলতে, ও কেমন বেপরোয়া হয়ে উঠল। আঙুল বাড়িয়ে সামনের সোফা দেখিয়ে যেন সুমন্তকে আদেশ করল, 'বোসো! আজ তোমাকে সব শুনে তবে যেতে হবে।'

দ্বিধাহীন স্পষ্ট গলা, যেন রুলটানা কাগজে লেখা, উঠানামা নেই, খাদ নেই, সরল সোজা, আমার ঘরে যে ওর কাগজের বাণ্ডিল যেন তারই প্রস্তাবে বলা, 'ঠিক তুমি যা বলেছ তা সত্যিই। অনেক আগেই আমাদের বিয়ে হয়ে যেত। আজও তুমি আমায় বিয়ে করতে চাইছ, জানি না কী তার দায়। সবাই বলবে উদারতা। তবু আমি জানি না। কেননা আমি আমাতে নেই। হয়তো স্মৃতি, প্রায়শ্চিত্ত, কি অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা, তবু আমাকে যদি তুমি টেনে আনো, তবে তা হয়ে দাঁড়ায় নিছক খেলা। এ খেলায় কোনো সঙ্গী নেই। এ খেলা কেবলই একতরফা। সরল হিসেব মানলেও এ কোনো অপরাধবোধের প্রায়শ্চিত্ত নয়। বিরাট আদর্শের উদারতাও নয়। এ রোজদিনকার জীবন। অতি সাধারণ আটপৌরে জীবন। আর সে সহজ সাধারণ জীবনে অসম্ভবের খেলা। প্রতিনিয়ত নিষ্ঠুর প্রতারণা। আজ তোমায় আমি যা বলতে চাইছি, যা হয়তো আমার প্রকাশের ক্ষমতার বাইরে, তুমি যা বুঝবে, কিংবা তোমার যা বোঝার সাহসের বাইরে, তার সব কিছুর যুক্তি তর্ক অর্থ মীমাংসা এতে নেই, এতে থাকতে পারে না। কেননা এ অসম্ভব। আর তাই আজ তুমি শুনে যাও। বিয়ের অধিকার সামর্থ্য প্রয়োজন, চিন্তা, যুক্তি, অর্থ, আদর্শ আজ কোনোটাই আমার নেই। বিয়ের যা কিছু চাহিদা, সব আমার ফুরিয়ে গেছে। যার একচুল নড়বার ক্ষমতা নেই, তাকে দিয়ে সাত পাক ঘোরানো, কোনো দূর অরুন্ধতী নক্ষত্রের কাছে তাকে নিয়ে দাঁড় করানো, এর চেয়ে হাস্যকর, নিষ্ঠুর, অপমানকর কী আর হতে পারে। আমি নিজেই আজ আমার কাছে এত অসহায়, এত ব্যস্ত, এত নির্ভরশীল, কোথায় আমার সময় অন্য একটি জীবনের কথা ভাববার। আর সেকথা ভাবার দায়িত্বই বা আমার

কী ? আজ নিজ দেহই আমার কাছে অপর এক দেহ। সত্যি বলতে এই অসহায়, নিঃসম্বল, দেহের সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আর তুমি যদি বলতে চাও ভালোবাসা, ভালোবাসার প্রশ্নেও আজ আমি বলতে পারব না কতটুকু ভালোবাসা আমার এ পঙ্গু পায়ের ওপর ? কোন সে সুমতি, যে আমার ভালোবাসাকে হুইল চেয়ারে ঠেলে তোমার কাছে নিয়ে যাবে সুমন্ত। আর যদি বলি ভালোবাসি বলেই তোমায় সরিয়ে দিচ্ছি, তাহলেও মিথ্যে বলা হবে। ভালোবাসার এই উৎস যে আমি, ভালোবাসার স্থল যে আমি, যাকে ভালোবেসেই ভালোবাসার শুরু. সেই আমাকেই—আজ আমি দুচোখে দেখতে পারছি না। আমার এ বিকলাঙ্গ দেহ, যে দেহ দেখে মমতা হয়, করুণা হয়, তাকে ভালোবাসার ক্ষমতা আমার নেই। ভালোবাসার ভিত্তিই আজ আমার ভেঙে গেছে। আজ আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন বেঁচে থাকার প্রশ্ন। যেভাবেই হোক আজ আমাকে বাঁচার পথ, বাঁচার অর্থ, কলাকৌশল খুঁজে পেতে হবে। নিছক এই বেঁচে থাকাই আমার কাছে আজ সবচেয়ে অর্থবহ।'

যেন মীমাংসার শেষ, মমি থামল। আমি জানলার শক্ত লোহার রডগুলো দেখছি। ভাবছি, মমিকেও তো আমার বহুদিন বহুভাবে দেখা। অভিমানে আত্মবিস্মৃত, কি দীপ্র-শাণিত অভিযোগে। দুদিকেই একগুঁয়ে। স্পর্শে সে থমকে যায়, এগোয় যুক্তি দিয়ে। যখনই ওর এমন দুমুখো চরিত্র আমার চোখে পড়ে, কেমন দুঃখ হয়। ভাবি এইতো সব নয়। হিসাব মাফিক চলাই কি সব ? গতিব কি এই একমাত্র পথ ? বুদ্ধি আর যুক্তি, কার্য আর কারণ ? আবেগে কি কোনো বেগ নেই ? শুধু বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নেই। মমিকে দেখলে মনে হয়, বুঝি তাই। এদিক দিয়ে ও দুভাগা।

মনে পড়ে মালবিকাব কান্নার কথা। কমন রুমেব টেবিলে মাথা রেখে গুমরে গুমরে কাঁদছিল। একগাদা মেয়ে, চারদিকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, সোহাগ দেখাচ্ছে, দোষারোপ করছে নচ্ছার এক হতভাগাকে। আর তার মাঝখানে মালবিকা কান্নায় ভাসছে।

হঠাৎ মমি এসে এক নজর দেখে আমায় টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে এল। নাক সিঁটকে বলল, 'ছিঃ এই ন্যাকা মেয়েদের দেখলে আমার বমি আসে, এত বেহায়া। প্যানপ্যানে। ওদের চবিত্র বলে কিছুই কি নেই ? এক ফোটা অহংকার নেই ?'

সেদিন মমিদের ওখানে আমার রাতের নেমন্তন্ন। পাশাপাশি দুই খাটে শোবার ব্যবস্থা। একটা হাতের আড়ালের মতো মাঝখানটায় আড়াআড়ি মশারির রঙের ছায়া। মাসিমা মেসোমশায় শুয়ে পড়েছেন। রাঁধাকে সরিয়েছে পাশের ঘরে। রান্নাঘরের আওয়াজও শেষ। আমি জানালা খুলে খাটের মাথায় পা গুটিয়ে বসে তুলোয় ক্রিম লাগিয়ে মুখ ঘষতে ঘষতে বললাম, 'প্রেমে পড়েছে, পরিণতি না হয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। কাঁদবে না?'

মমি হাঁটু মুড়ে ওর খাটে বসল। তেজে বলল, 'তাই বলে হাটের মাঝখানে ঢাক পিটিয়ে?'

তখনও সুমন্তর সঙ্গে ওর দেখা হয় নি। জ্ঞানদাত্রী আমি, বললাম, 'ভালোবাসার দুঃখ যে কী দুঃখ, তুই তা কী করে বুঝবি? কোনোদিন কাউকে কি ভালোবেসেছিস না কারো ভালোবাসা পেয়েছিস?'

মমি মেঝের ছায়াটার দিকে অনেকক্ষণ উপুর হয়ে রইল। তারপর এক সময় উঠে মুখ তুলে বলল, 'গল্প শুনবি?'

এই ছায়া ছায়া ঘর, কোথায় কোনো সাড়াশব্দ নেই। ভূতের গল্প আর প্রেমের গল্প, দুইয়েরই উপযুক্ত সময়। আমি উৎসুক হয়ে নড়েচড়ে বসলাম।

দেয়ালে হেলান দিয়ে কোলের উপর বালিশ টেনে বসে মমি তখনও মেঝের ছায়াটাই দেখছিল। বলল, 'বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখ। কোণের বাড়িটার একটা জানালা ঠিক এ ঘরের মুখোমুখি। ও বাড়ির ছেলে সুব্রত। এলোমেলো মুখ ঢেকে দুহাতে জানালার দু-পাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকত। হাত নাড়ত। মাধবীকে দেখেছিস তো, ওর দাদা। বিকেলে আমরা সবাই মাঠে খেলতে যেতাম, দেখা হত। দেখা হলেই অনেক অভিযোগ, বলত, 'হাত নাড়লাম। একবার হাতও তুলতে পারলে না?'

ক্রিম মাখা থেমে গিয়েছিল। গালে আমার হাত, আমার রাগ হচ্ছিল চাপ দিলাম, 'আর তুই চুপ করে রইলি?'

মমি মুখ ফেরাল, হেসে ফেলল, 'ওহ্, খুব ইনটেরেস্ট দেখছি। কিন্তু কী বলেছিলাম ছাই মনে কি আছে তাছাড়া কী বলেছিলাম, কেন বলেছিলাম, তুইই বা কী তার বুঝবি?'

আমার ভালো লাগছিল না। কেমন অস্বস্তি লাগছিল। বললাম, 'থাক আর শুনতে হবে না।'

মমতা তখন ভাবছিল। হয়তো শুনতে পায় নি। খুব আস্তে বলল, 'আবার

কতদিন মাধবীকে ডাকতে এসে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছে। মুখে ওর কথা জোগায় নি। আশ্চর্য!'

আমার আশ্চর্য ঠেকছিল, মমি কোনোদিন ঘুণাক্ষরে আমায় বলে নি। আশ্চর্য।

'তারপর একদিন মাধবী ছুটে এসেছিল। দাদার বড্ড অসুখ। কাঁদো কাঁদো বললে, 'তোকে একবার ডেকেছে মমি। আয় না মমি।'

'গিয়েছিলি?'

মমি খানিক চুপ করে রইল, 'আমি যাব যাব করে যাই নি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি? একদিন ভোর রাত্তিরে ওদের বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ উঠল। সুব্রত মারা গেছে।'

বাড়ানো হাতের ছায়াটা স্থির হয়ে মেঝেয় পড়ে আছে। ওদিকে তাকিয়ে আমার এবার কেমন মনে হল, ওর অনেক দুঃখ আছে। বললাম, 'তোর অনেক দুঃখ আছে মমি।'

লম্বা করে টান হয়ে মমি তাড়া দিল, 'শুয়ে পড়ে অদিতি। অনেক রাত হয়েছে।'

কতক্ষণ কেটেছে বলতে পারব না। শেষ রোদের সরু একটি রেখা জানালার শিকে লেগে আছে। সুমন্ত উঠে দাঁড়াল, বলল, 'তবে তাই হোক। চললাম।'

লহমায় হুইল চেয়ার সামনে এনে মমি ওর পথ আগলে রইল। হাত বাড়িয়ে বাধা দিল, 'না, এভাবে তুমি যেতে পারবে না।'

'কেন বিরক্ত করছ? সরো।' সুমন্ত পাশ কাটিয়ে চলে আসতে চেষ্টা করল।

মমি তেমনি পথ আগলে বসে রইল। দুর্বার চেষ্টায় বলল, 'বলো আজ এই এক বছর পরে কবে একটা না একটা ঝগড়া না বাঁধিয়ে তুমি যেতে পেরেছ, বলো? আজ তা হতে দেব না।' সুমন্তর একটা হাত ও কাছে টেনে নিল।

সুমন্ত চেয়ারটা ঠেলে দিতে দিতে নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'তা হবে, এখন হাত ছাড়ো।'

মমি আদুরে গলায় হাসছে, 'না, ছাড়ব না।'

'কি ন্যাকামি করছ, মমি!' ভুরু কুঁচকে সুমন্ত ওর হাত ছাড়িয়ে নিল।

চেয়ারের হাতলে দুহাত ফেলে মমি আর্তস্বরে বলে উঠল, 'আমায় ভুল বুঝো না সুমন্ত।'

কথাটা শেষ হয় নি। সুমন্ত ফেটে পড়ল। অতর্কিত চিৎকারে আমি আতঙ্কে ওর দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। পরে ভেবেছি, এ এক সম্মোহন, যেখানে নিষ্ঠুরতায় আকর্ষণের মিশ্রণ। সংস্কার শিক্ষা সভ্যতা, সামাজিকতার বাইরে সুমন্ত তার আহত অহংকার আর আক্রান্ত অস্তিত্ব যা আজ কত নিবিড় বছর পর মমি অস্বীকার করতে চাইছে, তাকে নাকচ করতে চাইছে। ভয়ের উৎস থেকে অন্য এক ভয়ে, ঝড় আর পশু এমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুর্বল মিডিয়ামে, মধ্যবর্তিতায়, একে মনে হবে ভাঁড়—যেমন সে সময় আমার মনে হচ্ছিল সুমন্তকে। লজ্জা ছাপিয়ে চেঁচিয়ে সে জাহির করছে, 'এত স্পষ্ট তুমি মমি, আর ভুল বুঝব আমি তোমাকে? ভালোবাসায় সন্দেহ তোমার, আর ভুল বোঝাবুঝির দায় বুঝি থাকবে আমার? যে যুক্তির দোহাই দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চাইছ, বাহবা খুঁজছ, সে ধাঁধায় আমায় ঠেকাতে পারবে না, মমতা। বিয়ের অর্থ যে শুধু দেহের সামর্থ্য নয়, এ জানতে প্রকৃতির প্রসারতা চাই। দুঃখ এই তুমি তা জানলে না, হয়তো তোমার জানার কারণ নেই, হয়তো জানা তোমার সম্ভবও না। কোন সাহসে তবে তুমি আমার বিচার করছ? পাপবোধে আমি ভেঙে পড়ি নি, আদর্শের কাঙালও নই আমি, আমি সামান্য সোজা মানুষ। পাঁচ জনের সং আমার সং। আমি আছি, থাকব, পাঁচজন যেমন আছে, থাকে। সাধারণ। আর তুমি? সবার হাতে হাততালির পাত্রী তুমি, বাহবার হাতিয়ার। সে হাতে তুমি কী ভাঙছ আমি তা জানি। আমার সব। স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ। সব তুমি ভাঙছ। একমাত্র আমি জানি, তুমি প্রতারক। তোমার সুযোগ এই যে দুষতে তোমায় কেউ নেই। আমিও তোমায় দোষারোপ করব না। তোমার জন্যেও তত নীচে আমি নামব না। মমি, তোমার জন্যেও না। কদিন লাগবে তোমায় ভুলতে, কতক্ষণ? ভেবো না তা বলে ভাবব কী বলেছিলে, কি ভালোবেসেছিলে, ভাবতে খালি চোখের জল ফেলব। তোমায় ভুলে, ভুলতেই আমার প্রায়শ্চিত্ত।'

সুমন্ত হনহন করে বেরিয়ে গেল। সবাই চুপ টিকটিক করে ঘড়িটা চলছে। সময় কেটে গেল।

রীনা আর মেসোমশায় বাড়ি নেই। এ প্রহসন মেসোমশায় জানলেন না ভেবে আমি স্বস্তি পেলাম। একই ভাবে বসে আছি, নড়তেও সাহস নেই। হুইল চেয়ারের হাতলে দুহাত ফেলে মমি এখন পাথর। বুঝতে পারছি রমেশ, ঠাকুর, সুমতি, সবাই দরজার আড়ালে। রুদ্ধশ্বাস। কারো সাড়াশব্দ নেই।

খানিকপর নিস্তব্ধ বাড়িটায় খট খট আওয়াজ শোনা গেল। বারান্দা পেরিয়ে নিতাই আসছে।

এসে ঘরে ঢুকল। ঐ চৌকো শরীরের নীচে কাঠের পা পড়ে, প্যাণ্টে পা ঢাকা অনেকটা স্বাভাবিক নিতাই। ঢুকে কেমন হকচকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখে, মমির পাশে গিয়ে দাঁড়াল, 'দিদি কী হয়েছে?'

এক ঝটকায় মমির পা দুটো লাফিয়ে পাদানি থেকে ছিট্‌কে শূন্যে থর থর করে কাঁপতে লাগল। মমি আপ্রাণ দুহাতে ওর চেয়ারের হাতল ধরে আছে, আর কাঁপতে কাঁপতে পা দুটো আবার পাদানিতে পড়ে স্থির হয়ে গেল মমি মুখ তুলল না। তেমনি চিবুক বুকে এক, মাথা নত, বললে, 'আমি ভেতরে যাব।'

এক এক করে সবাই চলে গেল। ঠাকুর, রমেশ, নিতাই।

৪

একা ঘর থেকে পালিয়ে আমি আধো অন্ধকারে বাগান পেরিয়ে রাস্তায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সবে আলো জ্বালা হয়েছে। সন্ধ্যার ধূসরতা পানসে, ফ্যাকাশে। দ্রুত বড়ো রাস্তায় এসে উঠলাম। ট্রাম, বাস, কোলাহল, লোকজনের ভিড়ে যেন অনেকটা স্বস্তি পেলাম। ভিড় কাটিয়ে বাস ধরব বলে এগুচ্ছি দূর থেকে দেখি ফুটপাতে সুমন্ত দাঁড়িয়ে। একটা ট্যাক্সি এদিক থেকে যাচ্ছিল, হাত নেড়ে থামাতে গিয়ে আমার দিকে চোখ পড়ল। দেখতে পেয়ে, ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে সোজা এগিয়ে এল, সামনে এসে বলল, 'হোস্টেলে ফিরছেন?'

বিরক্তিতে মন ভরে ছিল, নিতান্ত পাশ কাটাবার পথ নেই তাই উত্তর দিলাম। শুনে সুমন্ত প্রস্তাব করল, 'চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক।'

স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে গেলাম, আরো অবাক হলাম গলার আওয়াজে। যেন নিবিড় সখ্য যেন দুবেলা দেখা, গন্তব্য দুদিক হলেও যেন একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যায়, এমনি অন্তরঙ্গতা।

দাঁড়াই নি, এগিয়ে যেতে যেতে বললাম, 'ধন্যবাদ। আমি একটু ঘুরে যাব।'

আমার অনিচ্ছা স্পষ্ট তবু যেন গায়ে মাথার নয়. বলল, 'ঠিক আছে। আমারও কাজ নেই আমিও ঘুরে যাচ্ছি।'

সিগারেট ধরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। বিরক্তির সঙ্গে কৌতূহল, আড়-চোখে দেখলাম আপন মনে হাঁটছে। অজুহাত ছিল ঢের। বলতে পারতাম বন্ধুর বাড়ি যাব। কিন্তু বললাম কোথায়! বেশ তো পাশাপাশি হাঁটছি।

দুজনে হাঁটছি, হাওয়ায় ঘূর্ণিতে ফুটপাতের যত ছেঁড়া কাগজ, খড়কুটো, নোংরা সব গোল পাকিয়ে এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে, আবার ছড়িয়ে পড়ছে। একটা কাগজ ঘুরতে ঘুরতে আমার শাড়িতে আটকে গেল। আমি থেমে নীচু হয়ে কাগজটা ফেলতে চেষ্টা করছি।

সুমন্ত বলল, 'কিছু বললেন?'

মাথা নাড়লাম, 'না!'

এগোতেই ছোটোখাটো একটি রেস্টুরেন্ট। সুমন্ত ভিতরে পা দিয়ে কথায় টানল, 'চলুন, একটু চা খাওয়া যাক।'

কৌতূহল আছে, কিছু কি বলতে চায়? কখন দেখি নিজের অজান্তে অনুসরণ করে বসে আছি।

এ মহল্লায় জাঁকজমকের বালাই নেই। ছোটোখাটো সাধারণ, চায়ের স্টল। ঘরময় ছোটো ছোটো টেবিল পাতা। দু-চারটে ছেলে ঘুরে ঘুরে কাপ প্লেট তুলছে, মুছছে, আনছে, কোণের টেবিল বেছে নিলাম। মুখোমুখি না, ইচ্ছে করেই আড়াআড়ি বসলাম।

দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে সুমন্ত চেয়ার টেনে সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, মনিব্যাগ, চাবির রিং টেবিলে রেখে বসল। চশমা খুলে একবার চোখে হাত বুলিয়ে আবার পরে নিল।

'কিছু খাবেন?'

'ধন্যবাদ।'

আর কিছু কথা না, বাইরে তাকিয়ে বসে রইল।

ছেলেটি টি-পটে চা দিয়ে গেল। আমি কাপে লিকার ঢালছি। সুমন্তর দুধ চিনির হিসেব নেয়ার কথা, নিলাম না। কিছু কি বলার নেই? ভেবেছিলাম অভিযোগ শেষ হয় নি। রাগ ঝাড়তেই ধরে আনা। কিন্তু ওর বসে থাকার ভঙ্গিতে এমন কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। নিবিষ্ট হয়ে একটা কুকুর দেখছে।

কুকুরটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ; হুস করে এক একটা গাড়ি যায় ; শরীর কুঁকড়ে পিছু হটে, ফের ঘুরে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বড়ো একটা গাড়ি গা ঘেঁষে হুস করে বেরিয়ে যেতে বেপরোয়া হয়ে ঘেউ ঘেউ করে গাড়িটার পেছন পেছন খানিক ছুটল, তারপর ছুটে এসে এ ফুটপাতে উঠল, যেন, গভীর তাৎপর্যময় এক দৃশ্য দেখা শেষ হল। কুকুরটাকে আর একবার আড়চোখে দেখে হাঁফ ছেড়ে নিজের মনেই বলল, 'বেঁচে গেল!' হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিল, চিনি মেশাতে মেশাতে প্রশ্ন করল, 'সন্ধেটা আপনি কী ক'রে কাটান?'

সন্ধেটা কী করে কাটাই! বাইরে তাকালাম। কুকুরটা ফুটপাত ধরে চলে যাচ্ছে। রাস্তা ভর্তি রকমারি লোক। ভাবছি সন্ধে কাটানোর প্রশ্ন আবার কেন? ছেলেবেলায় বিকেলে বাবার সঙ্গে বেড়াতে যেতাম। আমাদের সুইনহো স্ট্রীটের বাড়ির রাস্তাটা বেশ নির্জন ছিল। বড়ো বড়ো গাছের নির্জনতা, বর্ষায় ঐ গাছে ফুল ফুটত। মাটিতে হলদে গোলাপি ঝরাফুল, আমি দেখে দেখে ফুলের ওপর পা ফেলতাম। ঐ ছিল মজা। আর একটা মজা সন্ধেবেলায় আমরা, আমি মা বাবা, আমরা লুডো খেলতাম, বেশিক্ষণ ঐ মজা টিকত না, মা হেরে গিয়ে আমায় পড়তে বসিয়ে দিতেন। তারপর বাবা মারা গেলেন। যুগ কেটে গেল। সেই স্কুল থেকে হোস্টেলে। আমি অনেকের সঙ্গে, অপরের আবদারে, নিজের মনে, আপন খেয়ালে। তাই একা একা সময়কে যেতে দিতে আমার অসুবিধে নেই।

বললাম, 'সময় কাটানোর প্রশ্ন কোথায়? বরং সন্ধে যে কোনদিকে পালায় তারই হদিস পেলাম না।'

টুকিটাকি টেবিলে পড়েছিল। চাবিটা তুলে নিয়ে সুমন্ত হিজিবিজি কাটছে। কয়েকটা লাইন, সমান্তরাল আরো কয়েকটা তার মাঝে লাইন টেনে টেনে, রেখা-গুলোকে দস্তুর মতো জটিল দুর্বোধ্য করে তুলল, আড়াআড়ি লিখন, হদিস পেলাম না। পরে তির্যক, সোজা, দাগ কেটে কেটে লেখাটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

আমি চায়ে চুমুক দিতে দিতে দেখছিলাম।

চাবি, দেশলাই, সিগারেট, মনিব্যাগ সব পকেটে পুরে সুমন্ত উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চলুন।'

নিরাশ হলাম বৈকি। বেরিয়ে বাসস্টপে এসে দাঁড়ালাম। বললাম, 'আমি বাসে যাচ্ছি। আপনি?'

হাত তুলে বিদায় জানিয়ে একবারও পেছন না ফিরে সোজা চলে গেল।

দূরে ভিড়ের মধ্যে সুমন্তর উঁচু মাথা আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। কেন ডেকে এনেছিল? ঐদিকে তাকিয়ে আমি একটা বাসের আশায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

৫

বাড়াবাড়ি তো বটেই। তবে মনে হয় না একদিনের অভিযোগে এতখানি তিক্ততার সৃষ্টি। বহুদিনের জমানো দুঃখ, নৈরাশ্য, হতাশা, হয়তো সুমন্তকে এমন অসংলগ্ন, উচ্ছৃঙ্খল করেছে। আমার কারো কিছুতে যায়ও না আসেও না। না সুমন্তর, না মমির। বড়োজোর আমি মমির পক্ষ। সেদিনের সেই মমির অসহায় চেহারায় সহজেই আমার দুঃখ। রোজই প্রায় আজকাল ওদের বাড়ি যাই, আর রোজই সুমন্তর দেখা পাই না, মাস চলে যায়। বিকেলে দেখি হাসপাতাল ফেরত মমি হুইল চেয়ারে বসে আছে। ক্বচিৎ ওদের পাশের বাড়ির কেউ থাকে, নয়তো নির্জন একা। সুমন্তর দেখা পাই না। আজ রীনা কাছে ছিল। মমি ওকে হুকের ঘর করতে শেখাচ্ছে। সুমতি ঠিক করছে বিছানা। ঢুকতেই রীনা চেঁচিয়ে উঠল, 'এই তো অতুদি। জিজ্ঞেস কর, পারি কিনা? হ্যাঁ অতুদি আমি একদিন তোমার ব্লাউজে হুকের ঘর করে দিই নি?'

শুনে আমার তো চক্ষুস্থির। দিয়েছিল, একদিন অবিশ্যি সুঁচ সুতোয় আমার ব্লাউজে কাঁথা সেলাই করে দিয়েছিল। তা বলে তো সে কথা ফাঁস করা যায় না। রীনারও একটা মর্যাদা রয়েছে। বানিয়ে যখন বলবই, অতিরঞ্জনই ভালো। বললাম, 'হ্যাঁ। শুধু একটায় নয়। ভুলে গেছিস দুটো ব্লাউজে আর ছ ছ-টা করে বারোটা।'

রীনা লম্বা ঘাড় ফেরাল, 'শুনলে তো!'

দাঁতে সুতো কেটে জামাটা রীনার দিকে এগিয়ে দিয়ে মমি বলল, 'খুব ভালো কথা। বাকি কটা লাগিয়ে ফেল।'

রীনা আঁতকে উঠল, 'তাই বলে নিজের জামায়? তবেই হয়েছে। ঐ উঁচু নীচু হুক লাগিয়ে আমি ঘুরতে পারব না। সবাই কী বলবে! এত কাজের বোন থাকতে দেখ, দেখ মেয়েটার কী দশা।' রীনা গিন্নিদের মতো মুখ করে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল। 'আহা গো আহা।' তারপর চোখ টিপে বলল, 'অতুদি মস্কা পলিশ।'

সুতোর রিলে সুঁচ গেঁথে মমি বলল, 'তোমার মস্কা পলিশ বার করছি।' তারপর মুখ তুলে হঠাৎ ধমকে উঠল, 'এত রাত অবধি কোথায় থাকিস রীনা?'

কী কথা থেকে কী কথা। রীনা অবাক হয়ে বলল, 'কেন, তুমি জানো না রিহার্সেল হচ্ছে?'

'কে তোদের শেখায় ?'

'অশোকদা।'

'রোজ অশোকদা আসে ?'

রীনা তখনও অবাক। 'হ্যাঁ আসবে না! অশোকদা না এলে কে আসবে ? রোজ আসে।'

মমি কেমন রেগে গেল, বলল, 'রাত করে বাড়ি ফেরা, পরীক্ষায় লাড্ডু পাওয়া, সব আমি বাবাকে বলছি।'

রীনা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, 'আহা রেগে যাচ্ছ কেন দিদিভাই। মস্কা পলিশ বলছি বলে ? ও কি তা আমি জানি নাকি ছাই ? রাস্তায় শুনতে পেলাম, অতুদিকে দিলাম। হল, আর দেব না।'

আমিও গম্ভীর হয়ে বললাম, 'বড়োদের সঙ্গে মস্করা, আর রেহাই নেই। মস্কা পলিশ। মেসোমশায়কে সব বলছি।'

রীনা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভারি গলায় বলল, 'আর বাবা যখন বলবেন, রীনা, এদিকে এসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? এসো বলছি। তখন দিদিই প্রথম ভ্যাঁ।'

হেসে উঠলাম, 'রীনা থিয়েটারে তুই সোনার মেডেল পাবি।'

রীনা নিশ্চিন্ত, বলল, 'জানি সুমন্তদাও তাই বলেছে।'

খেলার মাঠে বাচ্চাগুলো একজোটে চেঁচিয়ে উঠল। মাথা হেঁট, মমি সেলাই করতে লাগল। সুমতি জামাকাপড় পাট করতে ব্যস্ত। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা চড়ুই উড়ে এসে ফ্যানের পাখায় বসে খানিকক্ষণ ফরর্ ফরর্ করে এদিক ওদিক ঘুরে বেরিয়ে গেল।

রীনা এক সময় বলল, অনেকদিন সুমন্তদা আসে নি, না দিদি ?'

কাজের অতিরিক্ত কথা সুমতি বলে না। আজ কিন্তু রীনাকে তাড়া দিয়ে বলল, 'ডলিদের বাড়ি যেতে হয়, তাড়াতাড়ি চলে যাও রীনা। বেলাবেলি ফিরে এসো, নয়তো বাবু রাগ করেন।'

'দিদি এত দেরি করো তুমি, হয়েছে ?' রিনা জামা হাতে বেরিয়ে গেল, বলে গেল, 'অতুদি তুমি কিন্তু যেও না। আমি যাব আর আসব।'

বিকেলের দিকে বেশ ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। মমির অসাড় দেহে ঠাণ্ডা বেশি না কি কম, জানি না। মমিকে কেমন আর জানি না। বাইরে বসবে বলে মোজা পরিয়ে পাতলা চাদরে গা ঢেকে দিয়ে, সুমতি চাকা ঘোরাতেই মমি ব্রেক কষে ঝট করে গাড়িটা থামিয়ে দিল। বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি সারাক্ষণ আমাকে

নিয়ে খেলছ সুমতি। তুমিই আমায় পঙ্গু করছ। সুপ্রিয়া যদি দেখত বুঝতে তখন।

সুমতি আজও হঠাৎ মুখ খুলল, 'সুপ্রিয়াকে এসে থাকতে বোলো।' বলেই বেরিয়ে গেল।

রীনার মুখেও প্রিয়াদির কথা শুনেছিলাম। 'সুপ্রিয়া কে রে?' জানতে চাইলাম।

মমি অবাক হয়ে বলল 'তোকে বলি নি? আমার মানে আমাদের হাসপাতালের থেরাপিস্ট। খুব বন্ধু আমার।' বন্ধু কথাটা কেমন অনেক টেনে লম্বা করে বলল। বলল, 'খুব ভালো মেয়ে, হাসপাতালের সবাই ওকে ভালোবাসে। তুই তো ওখানে যেতে চাস না, গেলে দেখতিস। অবশ্য আমার মন দিয়ে আমি বলছি। তোর চোখে হয়তো এর মানেই নেই। আমরা তো সব বাতিল হয়ে গেছি। একটা পঙ্গু জগতের একান্ত নিজস্ব খুঁটিনাটি। তোর এতে কী এসে যায়? কিন্তু ঐ তো আমার জগৎ। অনেক বেশি আপন।'

সব সময় অভিযোগ। কথা বলতে বলতে ওর সমস্ত শরীর খাড়া হয়ে উঠেছে। বসার সহজ ভঙ্গির চেয়ে শরীর অনেকটা সহজ হয়ে গিয়ে কঠিন, শক্ত হয়ে রইল। চেয়ারের হাতলে হাত চেপে চুপ করে মমি চোখ বুজে নিজেকে এখন শান্ত করতে চেষ্টা করছে। আমার কিছু করার নেই, বিচ্ছেদ ছাড়া। একদিন ওকে দেখে বুঝতে পারছি আবেগ কি উত্তেজনায় ওর সর্বাঙ্গ শক্ত হয়ে ওঠে, পা ছিটকে যায়, রগ টানায়, দম বন্ধ হয়ে আসে। বিরক্ত লাগে সারাক্ষণ ওর কী যে হাসপাতাল, নার্স, ওয়ার্ডবয়, নুলো, গোঁড়া, কাঠের না প্লাস্টিকের নকল হাত, পা, ব্রেস আরো কত কী সব ঘুরিয়ে ভাবা, দেখা, বলানো নিজের কী যে দীনতার বুনোট।

বলে ফেললাম, 'মমি সারাক্ষণ নিজেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কাকে খোঁটা দিতে চাইছিস? এ কেমন ধারা কাঙালপনা!'

ওর শরীর শান্ত হয়ে আসছিল। হঠাৎ এক ঝটকায় পা ছিটকে অনেকটা শূন্যে উঠে ধপ করে নীচে পড়ে গেল। আঙুলগুলো বেঁকে পাদানি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। দু-হাতে ডান পাটা চেপে মমি হাঁটুটা বেঁকিয়ে দিতে চাইছে, যেন চেয়ারের ছাঁদে সে থাকতে পারে। একটু ঠিক হতে মমি আবার আরম্ভ করল, 'কী বলছিলি অদিতি? আমার কাঙালপনা? কেন, তোদের কাছে কোনো ভিক্ষে চাইছি আমি? তবে কী তোদের ভয়? আমি যা, দয়া করে আমাকে তাই থাকতে দে। নিজেকে আমায় মানতে দে, তোদের হিসেবে আমাকে মেলাস

নে। সত্যি বলতো তোরা কি আমায় সহজ ভাবে নিতে পেরেছিস? তা যদি হত সুমন্ত এমন পাগলামি করত না, তোদের চোখে মুখে এমন করুণা উথলে উঠত না, আমার অসহায়তায় সুমতি তার তৃপ্তি মেটাত না। এ আমার কাঙালপনা নয় অদিতি, এ তোদের দাক্ষিণ্যের দেমাক।'

সুস্থ, সমর্থ, সমবয়সী, যাকে এতকাল মমি সমপর্যায়ে জেনে এসেছে, যাকে দেখে করেছে নিজেকে উপলব্ধি, অথচ যাকে আজ আর সম্ভব নয় সহজ ভাবে নেয়া আক্রোশ মেটাতেই যে এখন একমাত্র আকর্ষণীয়, সেই আমাকে এক প্রথম সোজাসুজি আঘাত করল মমতা। আদিতে সেই অপ্রাকৃত দেবীভাবের অন্তর্ধানে আমি গভীর স্বস্তি পেলাম।

স্বভাবে যে ফিরে এসেছে, সহজেই তাকে সরল কথা বললাম, 'তোর কী হয়েছে মমি?'

মমি হেসে উঠল, 'তুইও যে ঠিক সুমন্তের মতোই কথা বলছিস। আমার আবার কী হবে?' তারপর হাসি বন্ধ করে কী রকম বিহ্বল হয়ে গেল, 'কী জানি অদিতি, আমরা বোধহয় সবাই বদলে গেছি। নিজেদের আর ঠিক মতো চিনতে পারছি না, এই যে তুই আসবি বলে এতদিন পথ চেয়ে থেকেছি, ভেবেছি তুই এলে সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছুই কিন্তু হল না, আমরা কেউ কাউকে আর বুঝতে পারছি না। রাগ করিস না, তোর চেয়ে বরং সুপ্রিয়াকেই যেন আমি বেশি বুঝতে পারি, সুমন্তর চেয়ে নিতাইকে। 'ও ঢাকা ঘুরিয়ে সামনে এগোতে এগোতে বলল, 'ও সব কথা থাক। চল, বাইরে গিয়ে বসি।'

বারান্দায় বেতের চেয়ার টেনে, আমি ওর পাশে। ভাবছি আর নয়, আজ আমরা খুব সহজ হব। সুমন্ত এলেও যেন আজ হত। এমন সব ভাবছি।

পা টান করে আঙুলগুলো মুড়ে আবার খুললাম। বড্ড টনটন করছে। সকালে আজ অনেক হেঁটেছি। বাস আসতে এত দেরি হল যে অন্য বাসের আশায় অনেকটা হেঁটে ফেললাম। কোনো লাভ হল না, ট্যাক্সি নিতেই হল শেষ পর্যন্ত। পা টান্ টান্ করে বেশ আরাম লাগছে। স্যাণ্ডেল কিনতে হবে। এ স্যাণ্ডেলটা একদম গেছে। আজকাল বেশ সুন্দর কাঠের স্যাণ্ডেল বেরিয়েছে। সেদিন শো-কেসে দেখলাম। মমিকে নিয়ে একদিন বেরিয়ে কিনে আনব। ওর বেড়ানোও হবে। কথার মোড় ফেরাতে বললাম, 'চল একদিন কোথাও বেড়িয়ে আসি।'

মমি আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল, বলল, 'তোর পায়ে ঐ দাগটা কিসের ?'

আমি নীচু হয়ে পা বাড়িয়ে দিলাম। হাঁটুর কাছে শাড়ি, বেশ সুডৌল, ডিমের চিহ্ন নেই। লম্বা পাটা অনেকটা এগিয়ে গেল। প্রায় মমির হুইল চেয়ারের পাশে। হাঁটুর নীচে একটা কাটা দাগ, বললাম 'এইটে ? ছেলেবেলায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

'পা ভেঙেছিলি ?

'না, শুধু কেটে গিয়েছিল।'

'ও, ভাঙে নি।' আমার পা থেকে মমি চোখ সরিয়ে নিল।

একটানা বসে থাকতে মনে হয় ওর কষ্ট হয়। প্রায়ই পা নেড়ে দেয়, শরীরটাকে তুলে ধরে। এখন চেয়ারের হাতলে চাপ দিয়ে উপরের অংশ তুলে আবার বসল। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যেতে চাস ?'

'এই, এমনি লম্বা অনেকটা ঘুরে আসব।'

রমেশ চা নিয়ে এসেছিল। মমি ওকে বলল, 'রমেশ সুমতিকে একটু ডেকে দে। আমি ভেতরে যাব। তুই চা খা অদিতি। আমি এক্ষুনি আসছি,' বলে ভেতরে চলে গেল।

একা বসে আছি। মেসোমশায়ের গাড়ি এসে ভেতরে ঢুকল। মেসোমশায় বেরিয়ে এলেন, সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, কতদিন পর এই প্রথম দেখা, এত পরিবর্তন হয়েছে যে বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। এতখানি লম্বা মানুষ পিঠ বেঁকেচুরে ছোটো-খাটো এতটুকু হয়ে গিয়েছেন। বারান্দায় উঠতে আমি উঠে প্রণাম করলাম। খানিক তাকিয়ে বললেন, 'অদিতি না ? মমি বলছিল তুমি এসেছ। ভালো তো ?'

চেয়ার টেনে মেসোমশায় বসলেন। বসে টাই ঢিলে করতে করতে, এতদিন কোথায় ছিলাম, কী করে এলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব প্রশ্ন করতে লাগলেন। কলম্বো প্লেনের মেয়াদ কদিন, টিচারস্ ট্রেনিং-এ কজন ছিল, লণ্ডনে কোথায় ছিলাম, সব এমনি করে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। হোক চলচ্ছক্তিহীন মমি, মমিকে এসব কথা বলার সুযোগ কোনোদিনও না আসুক, আমার ওপর দিয়ে মেসোমশায় মনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিচ্ছেন, প্রবোধ পাচ্ছেন, আগ্রহ মেটাচ্ছেন।

জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে গেরোতে হাত রেখে একটু সময় কী যেন ভাবলেন, তারপর এদিক ওদিক দেখে সামনে ঝুঁকে, প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ওকে কেমন দেখলে অদিতি ? মানে, মনের দিক দিয়ে কেমন বুঝলে ?' বলে

চেয়ারের দু-দিক চেপে আমার মুখে চেয়ে রইলেন। রেখায় রেখায় সমস্ত মুখে গভীর ফাটল, চেয়ে আছেন যেন আমার এ জবাবের ওপর মেসোমশায়ের সমস্ত ভবিষ্যৎ ঝুলছে।

বড়ো রাস্তায় আচম্‌কা একটা ট্রাম থামল, লোহায় লক্করে তার গোঙানি এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে। আমিও এ প্রশ্নের জবাব খুঁজছি। মেসোমশায়ের মুখে তাকিয়ে কিন্তু মমির সেদিনকার দেবী ভাব, সারাক্ষণ এই বেদনা, এই মুহূর্তের আক্রোশ, আর সব মিলে এক পাঁচ মিশেলি বিভ্রান্তি যা কিছু সব ভুলতে হল।

বললাম, 'মমি নিজেকে বুঝিয়ে শান্ত করে নিয়েছে, আপনি ওর জন্য ভাববেন না।'

হাত দুটো দুদিকে মেলে মেশোমশায় চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে বসলেন। চোখের তারা দুটো সামনে স্থির। অনেক দূর কোনো অদৃশ্যে যেন দৃষ্টি মেলে বললেন 'তাহলেই ভালো অদিতি। ওদের মা নেই, বড়ো দুঃখ, ছিল, আজ মনে হচ্ছে চলে গেছে ভগবান বাঁচিয়েছেন।

গাড়ির আওয়াজ পেয়েই রমেশ এসে ব্যাগ নিয়ে গিয়েছিল। চটি হাতে বেরিয়ে এল। মমিও আসছে।

ফেরার সময় মেসোমশায় গেট অবধি এলেন। মাঠ পেরিয়ে বড়ো রাস্তার মোড়ে দেখি লাঠি খট্ খট্ করে নিতাই আস্‌ছে। না দেখার ভান করে চলে এলাম।

৬

কাল স্কুলের স্পোর্টস ছিল। খেলার মাঠেই বলে দেওয়া হয়েছিল আজ ছুটি। বাড়তি ছুটি জুটে গেছে, পুরোপুরি উশুল করতে চাদর মুড়ি দিয়ে চোখ বুজে পড়ে আছি। শুয়ে শুয়ে আওয়াজ পাচ্ছি, অরুণা অফিস যাচ্ছে। বেচারি! ঘুম ভাঙতেই দৌড়োতে হয়। কাল এত রাত করে শুয়েছে তাও। রাত প্রায় নটায় আমার ও অরুণার যুগপৎ ইচ্ছা হল সিনেমা দেখব। সেজে-গুজে ট্যাক্সি ডেকে হলে পৌঁছুতে

পৌঁছুতে ছবির বেশ খানিকটা হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং হা-হুতাশ তো করতেই হবে, ফলত পাশের ভদ্রলোকের কাছ থেকে গলার বিশেষ অভিব্যক্তিতে জব্বর ধমক। সত্যি ঐ অন্ধকারে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠেছিলাম। সুমন্তর ঘনিষ্ঠ কেউও যদি ভুল করে ওকে সুমন্ত ভেবে এনতার পিঠ চাপড়ে দিত, তবে বিস্ময়ের ছিল না। অন্তরঙ্গতা থাকলে আমিও হয়তো ডেকে উঠতাম, ইন্টার-ভ্যালে অবিশ্যি ভুল ভেঙেছিল। প্রায় দেড়মাস হয়ে গেল সুমন্তর দেখা নেই। সেই মমিদের বাড়ি তার পর চায়ের স্টলে, চাবির গোছা, রাস্তার কুকুর একটা, ভিড়ে একমাথা উঁচু হাঁটা। আর দেখা নেই।

মোক্ষদা ঘর ঝাঁট দিতে এসে বলল, 'শুনতে পাচ্ছ, না কানের মাথা খেয়েছ?' এত বকর বকর ও করতে পারে। ভালো করে চাদর মুড়ি দিয়ে চোখ বুজলাম। বললাম, 'শুনিটা কী?'

'হায় কপাল! এই যে বললুম কাল বিকেলে এক বাবু এয়েছিলেন।'

লাফিয়ে উঠে বসলাম 'কোন বাবু?'

'শোন কথা, কোন বাবু তার আমি কী জানি?' 'খুব কি লম্বা? চশমা চোখে? শ্যামলা? চুল সোজা হাতে ব্রিফকেস্। রাগ রাগ ভাব, এই রকম?'

ও আমার ব্যাখ্যা শুনে কাজে মন দিল, 'না বাপু, মুখ্যুমানুষ, অতশত জানিনে, ঐ পাশের বাড়ির ভদ্দরলোক যে এদিক পানে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, আ-মরি, মুখপোড়া বলে কি আমায়, তা তুমি তো আর শুনবে না। সেই তেমনি গোলপানা বাবু।'

ধপাস্ করে শুয়ে পড়লাম। রানাঘাটের কেউ হবে, কলকাতা কেউ আসছে শুনলেই মা ঠেলে পাঠাবে মেয়ের খোঁজে, হাতে হাঁড়ি ছানার মিষ্টি নেবুর আচার নয়তো ঘি। ঘুষ যে কিসের।

'মিষ্টি দিয়ে গেছে কি?'

মোক্ষদা বেরিয়ে যাচ্ছিল, ফিরে বলল, 'হয়েছে। তাহলে যে পয়সা লাগে! তবে শোনো। ওই গোলমুখো মুখপোড়া বলে কি, তা বাবা আমি কারও পাঁচে সাতে নেই।'

'বেশ বেশ থেকো না। পালাও তো এখন।'

আমি শুয়ে রইলাম। শুয়ে শুয়ে গুনগুন করছি। এ গানের সুর আছে, কথা নেই। মমি গান গাইত। লাফাতে লাফাতে এসে কলেজে ঢুকত। দেখেই বুক দিয়ে টেবিলে খাতাটা ঢেকে রেখেছিলাম। ঠিক আঁচ করল, লুকোনোর

কিছু। হঠাৎ ছোঁ মেরে খাতাটা ছিনিয়ে নিয়েছে, ততক্ষণে সে ঘরের মধ্যখানে, যেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে, চোখ দুটো মজা পেয়েছে, কৌতুকে নাচছে, আড়চোখে আমাকে দেখে নিল। আমি চেঁচাচ্ছি, 'এই মমি কী হচ্ছে?' সুর করে সে পড়তে শুরু করল, 'করিডর পেরিয়ে যেতে যেতে সমস্ত অন্তর আমার ভৈরবীর সুরে গুনগুন করে উঠল। যখনই সুর ঝরে মনে কোথায়ও রাত্রি ভোর হয়। নীলফল নিঃসৃত শ্বেতরসধারা বাষ্পের লঘুতায় চুঁইয়ে পড়ে। কুয়াশার মতো সকল আবৃত করে। সর্বাঙ্গ নিদ্রার স্তম্ভনে মহাযোগীর পদতলে পার্বতী নারী প্রাণদায়িনী সুরের ঝংকার তোলে, মহাকাশে প্রথম গুঞ্জন মূর্ত হয়, ধ্বনি প্রাণময় হয়, প্রেমময় হয়। প্রভাতে সহাস্য হয়, হাসির অন্তর্গত আনন্দ আমায় সম্ভাষণ করে।'

ঐটুকু পড়ে চুপ করল। মুখটা গাঢ় তবু হাসিতে ভরা। ওর গান আমায় ভাষা দিয়েছে, ভালোবাসায় লিখিয়েছে এ কথা জানে। হাসি থামতে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। পারছে না আর আমার দিকে তাকাতে। নীচ থেকে তখন ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। কী যে বেঁচে গেল! সিঁড়ির দিকে ছুটতে ছুটতে মমি বলছে, 'ছুটির পর গেটে দাঁড়াস অদিতি।'

রোজ একসঙ্গে বেরোই, তাও রোজই বলা চাই, 'দাঁড়াস কিন্তু।'

বিকেলে বড়ো রাস্তা পেরিয়ে বিডন স্ট্রীট ও হেদোর মোড়ে এসেছি। রেলিং-এ হেলান দিয়ে মমির বুড়ি, মমি ওকে নিজের বলে জাহির করে, আমরাও সায় দিই আমাদের কী যায় আসে। এমন সে ফ্যালনা, কেননা, মাথা নীচু করে বুড়ি ঝিমোচ্ছে। ওর থালায় দশ পয়সা ফেলে দিয়ে মমি বলল, 'অদিতি অ্যাদ্দিন গান শিখছি আমি, আর তুই কী করে ভৈরবীর রূপ এমন করে দিলি?'

মুখ তখন ওর শান্ত, স্থির। হেদোর জলে তাকিয়ে ছিল, বলল, 'এই সুরকে মনে করতে গিয়ে আমার মাকে মনে পড়ে, তাই না অদিতি?'

অনেক টুকরো ছবি। হোস্টেলে থাকি, মামদের বাড়ি, প্রায় রোজই দেখা হলে মাসিমা হাত বাড়িয়ে দিতেন, 'এদিকে আয় তো অদিতি।' রোগা পাতলা হাত কপালে রাখতেন, 'জ্বর হয় নি তো? এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন রে? ভালো করে খাসনে বুঝি?'

মৃত্যুর পর স্বামীর খাটে মাসিমা শুয়ে ছিলেন। শীতের সকাল, গলা অবধি শাদা চাদরে ঢাকা। ভোরের আলো নীল মুখে কুয়াশার জাল বুনছে। চোখ বোজা, ঠোঁট চেপে গিয়ে চিবুকে খাঁজ পড়েছে, একটু নীচে বুকের উপর হাত দুটো আলতো

জড়ো করা, যেন ধ্যান করছেন, ঘরে ধূপের গন্ধ। এক কোণে পিলসুজে প্রদীপ জ্বলছে।

মমির দিকে তাকালাম, ঠোঁট চেপে চুপচাপ হাঁটছে। ওর মুখের নীচটা ঠিক মাসিমার মতো।

ভাবব না। আজ সারাদিন শুধু শুয়ে থাকব। কী বার আজ? শুক্রবার। শনিবার হলে পর পর দু-দিন ছুটি মিলত। রানাঘাট যাওয়া যেত। দেশে ফিরেই রানাঘাট গিয়েছিলাম। দুদিন ছিলাম। কী ব্যস্ত মা, সঙ্গে আবার সমীহভাব। যেন আমি অতিথি। যত্ন করে রান্না, ধবধপে বিছানা, কাছে বসে দূরত্ব রেখে কথা বলা। উঠোনের পেয়ারা গাছটা, কাঁচাপাকা পেয়ারায় ভর্তি। মিঠুকে গাছে উঠিয়ে ফলের আশায় দাঁড়িয়ে আছি। ছোটো মামা ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন, 'অতু এখানে দাঁড়িয়ে কেন? পোকামাকড়ে ভর্তি, চলে আয়, চলে আয়।' গাছে মিঠু, বেচারা বাবার ভয়ে চুপচাপ। ছোটো মামা দেখতে পায় নি। সবে বিলেত ফেরত আমি। আমায় নিয়েই একসা। মিঠুর মতো যখন ছিলাম, তখন ছুটিতে বাড়ি এলে এই পেয়ারা গাছটাই ছিল সর্বস্ব। বাবাও মাঝে মাঝে ছুটিতে এখানে আসতেন। সব ছাপিয়ে বাবার গলা শুনতে পাই, 'এবারে ওপরের ডাল ধর, এখানে পা, হ্যাঁ হ্যাঁ উঠে যা, হ্যাঁ এমনি করে। শাবাশ মেরা বিটিয়া।' বাবা কলেজে পড়াতেন, আমি স্কুলে পড়তাম। দুজনেরই একসঙ্গে ছুটি। দুজনই বেড়াতে পাগল। পশ্চিমে বেড়াতে পেলে আর কথা নেই। বাবার শুধু হিন্দি বাত্। 'শাবাশ মেরা বিটিয়া!' তারপর পুকুরে সাঁতরানো। আমরা পুকুর তোলপাড় করতাম। ছোটো মামা চিরকেলে বুড়ো। বলতেন, 'মেয়েকে কি ডানপিটে তৈরি করছেন রঞ্জিতবাবু?' বাবা হো হো করে হাসতেন। আমি আরো একটা ডিগবাজি খেয়ে মাঠে মাঠে ছুটতাম। বাবার পর সবশেষ। আমরা রানাঘাটে চলে এলাম। কত তফাৎ। মা সারাক্ষণ হাউ হাউ করে কাঁদতেন। ছোটো মাসিমার নির্দেশ, আমাকে সারাক্ষণ মার কাছে কাছে থাকতে হত। ভালো লাগত না, ইচ্ছে হত ছুটে দূরে কোথাও পালিয়ে যাই।

একদিন পাশে শুয়ে মা বলছিলেন, 'অতু তুই ছেলে হলে আমার দুঃখ ঘুচত।' মার গলায় হতাশা। মা আমায় চায় নি, মা আমার ভালোবাসে না। বাবার পর সব শেষ। আমি দূরে সরে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ছেলে আর মেয়ে একই। মোটেও তফাৎ নেই।'

মা রাগ করলেন না, তেমনি রুগ্নগলায় বলেছিলেন, 'না, ছেলে মেয়ে এক হয় না।'

আমি উঠে বেরিয়ে গেলাম। উঠোনে কেউ নেই।

পেয়ারা গাছটায় কয়েকটা কাক বসে ঝিমোচ্ছিল। মণ্ডলদের পুকুরপাড়ে কালোজাম গাছের তলায় গিয়ে বসলাম। ঝাঁ ঝাঁ রোদ, এখানে ওখানে ছোটো ছোটো বাড়ি। ঝোঁপ থেকে একটা গিরগিটি মুখ বের করে এদিকে তাকিয়ে আছে। একটা কাঠবেড়ালি ছুটে জামরুল গাছটায় গিয়ে উঠল। দূরে আরো অনেকগুলো গাছ জড়াজড়ি করে অনেক বেশি হয়ে গেছে।

আমার জানালার মাদারগাছের গায়ে কাঁটা। মাদারগাছে কেউ ঠেস দেয় না, কেউ আসে না। মাদারগাছে কেউ না। কেউ জড়ায় না। মাদারগাছের গায়ে কাঁটা। কেউ আসে না।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। এই যা! অনেক বেলা হয়ে গেল। টেবিলে ঝুঁকে ঘড়িতে চোখ রাখলাম। না, এখনও এগারোটা গড়ায় নি। বাথরুম থেকে বেরিয়ে একবার নীচটা ঘুরে এলাম। অফিস ঘরে প্রতিমাদি আমাদের সুপারিনটেনডেন্ট কী একটা কাগজ দেখছেন। নীচের এই বড়ো ঘরটা আমাদের ভিজিটার্স রুম। পার্টিশন করে ওপাশটায় অফিস। চেয়ার টেবিল পর্দা টর্দা সব মিলিয়ে ঘরটা বেশ সাজানো গোছানো, যেমন নখে পালিশ, আঁকা ভুরু, দোকানে বাঁধা চুল ছিমছাম সুরুচিময় বয়সের ভাটায় প্রতিমাদি আমাদের। উপরে উঠে এলাম। কী করব ভাবছি। মোক্ষদা সেদিন বলছিল ওর না ওর কার কে এক মেয়ে নাকি দুটো বাচ্চা নিয়ে বিধবা হয়ে শাঁখা সিঁদুর খুইয়ে ফিরে এসেছে। পুরনো কাপড় চেয়েছিল। 'তোমার যা তা, ছেঁড়া ফাটা রঙিন শাদা শাড়ি টাড়ি হলেও হবে দিদি।' বলছিল, 'গরিবের আবার আচার বিচার।' ট্রাঙ্ক খুলে বসলাম। একটা অব্দি কাপড় চোপড় ছড়িয়ে ধোপার কাপড়, মোক্ষদার না কার মেয়ের শাড়ি, আমার রোজকার শাড়ি সব আলাদা করে, অকেজো কাগজ ছিঁড়ে ঘরটাকে আস্তাকুড় বানিয়ে ফেললাম। ছ-মাসের জন্য নিশ্চিন্ত, বছরে দু-একবার এই হয়। মমি দেখে দরজা থেকেই চেঁচাতে থাকত, 'তবে না বলে লিখিয়ে। আঁতালে-কচুয়েল ডেন্! সিগ্রেট ধর অদিতি। ছাই না হলে ছাই কবিত্ব। না ওড়ে না পোড়ে!'

বাড়ি ঘরদোর এমনি যে প্রত্যেকের তাদের বিশেষ বিশেষ ছক। এমনি বিশেষ হাসপাতাল, রিহেবিলিটেশন্ ঘর। আমার যে মন নেই হাসপাতালে, সেদিন মমি তাই ভয়ানক রেগেছে। আজ একবার হাসপাতাল ঘুরে এলে হয়। আচমকা দেখে খুশি হবে। মেজাজ ঠাণ্ডা হবে।

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে কিন্তু মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। এমন ছুটির দিনটা বাসে নষ্ট করব? সামনে বুড়ো সর্দারজি ট্যাক্সি আস্তে করে বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছে। চোখ বড়োই করুণ। নেব কি? যাকৃগে—মাঝে মাঝে একটু বিলাসিতা করা ভালো। উঠে বসলাম।

দুপুর, ফাঁকা রাস্তা। বেশ লাগে ঝাঁ ঝাঁ রোদে একা গাড়ির কোণে গা এলিয়ে বসে থাকতে। পিচে রাস্তা চকচকে, চাকার নিচে রাস্তার দৌড়। ছুটছে শহর ছাড়িয়ে। মারাঠা খাল পেরুতেই দোআঁশলা দেহাতি ঢঙ। কলাবাগানের আড়ালে ছাউনির ঘর, জলায় হাঁস, শহরের এত কাছেই ঘোমটার দেশ। এখানে পাকা রাস্তা, পাকাপাকি কিছুই এখানে মানায় না। এখানে কেন রিহেবিলিটেশনের বাড়ি, ভাবতে হাসছি। এত মন খুলে যাচ্ছিল, হাসছি। বললাম, 'সর্দারজি তুমারা গাঁও কোথায়?'

সর্দারজি মুখ ঘুরিয়ে পেছন ফিরল।

অন্তরঙ্গতা। দাড়ির ভেতর হাসি ছড়িয়ে বিলাপ করল, 'বেহেনজি মেরে সোনেকা গাঁও দুশমননে কলিজাঁসে ছিন্ লিয়া।' সমঝদার পেয়ে গেছে আর পায় কে? স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে সর্দারজি আর এক কোথায় বসে আছে—'বেহেনজি লাহোর কি বাজুমে ছোটাসা গাঁও লবিত। ওহি হামারে গাঁও, উঁহা কি গেহু বিলকুল শক্কর যেইসা মিঠা, ভৈস কা দুধ দেখেত মলাইকা টুক্‌রা, বকরি কা মাস্—আহা রোহু যেইসা মোলায়েম, ঔর আনাজ ফল। অহো কেয়া বাতায়েগা শর্ষু কা শাক্, লস্যি অ্যাহা কেয়া কেয়া কেয়া…'

সর্দারজির সামনে এখন নির্ঘাৎ পুরো রাস্তা জুড়ে শুধু হলদে গমের ঝাড়। কালো পাহাড়ের মতো মোষের দঙ্গল গা-এলিয়ে, নাক উঁচিয়ে জলায় পড়ে আছে। বড়ো বড়ো কানে ঢাকা ছাগল শুকনো খট্‌খটে কাঁটায় ভর্তি ধূ ধূ মাঠে লাফিয়ে লাফিয়ে কোথায় কোন দূরে, কালো-শাদার খেপে ছটফটে পা হয়ে ঘুরছে।

ঝটকায় গাড়ি ঘুরিয়ে ব্রেক কষে সর্দারজি লাফিয়ে নামল। আমিও বেরিয়ে এলাম। চাকা ঘেঁষে বারো তেরো বছরের একটি ছেলে হাঁপাচ্ছে। সর্দারজি টেনে ওকে দাঁড় করাল। শুকনো সরু পায়ের উপর ভর, ছেলেটি উঠে দাঁড়াতে সর্দারজি গাড়ির অদূরে ছিটকে পড়া একটা ক্রাচ্ ওর হাতে তুলে দিল। ভালো করে দেখে নিল কোথাও লেগেছে কিনা। না, লাগে নি।

এবার রাস্তা কাঁপিয়ে সর্দারজি ধমকে উঠল, 'কেয়া দেখতা নেহি, চলতা হায় উল্লু কাঁহাকা, যানেকা কাঁহা হ্যায়?' ধমকেই জিজ্ঞেস করল।

ছেলেটি হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পরিষ্কার জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাবে, হাসপাতালে ?'

ছেলেটি মাথা নাড়ল।

সর্দারজি সামনের দরজা খুলে, ছেলেটিকে ভেতরে গুছিয়ে দিয়ে, ঘুরে স্টিয়ারিং-এ গিয়ে বসল। ঘড়ি দেখলাম, দুটো বেজে গেছে।

ভুল করার জো নেই। গেট খোলা। পাশের থামে, বোর্ডে ব্রাসের কোলাজে বড়ো বড়ো করে সরকারি রিহেবিলিটেশনের নাম লেখা। মনে হবে খ্যাতির এখানেই শেষ। ভেতরে কম্পাউণ্ডের অর্ধেক জুড়ে ইট চুন সুরকি লোহালক্করের জঞ্জাল। পুরোনো বাড়ির উদ্বৃত্ত কি নতুন বাড়ির সরঞ্জাম। এক পাশে দুটো অ্যাম্বুলেন্স, গোটা কয়েক নিজস্ব গাড়ি, ভাঙা একটা ভ্যান। ট্যাক্সি থামতেই ছেলেটি নেমে সোজা সামনে একটা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। আমাদের দিকে একবারও ফিরে দেখল না। ওকে অনুসরণ করে আমি বাড়িগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেললাম। খোলা জায়গায় পর পর তিনটে শাদা বাড়ি। এই বাড়ির আত্মাকেই কি মমি খুঁজছে ?

খটাখট, খটাখট, ওপাশের টিনের ছাউনি দেওয়া দালান থেকে অনবরত একটা আওয়াজ কান ঝালাপালা করছে। বাড়িটার বারান্দায় স্তূপাকৃতি হাত পা, বুকের পিঠের ছাঁচ। বাইরেটা মোটামুটি খালি। সামনের ভ্যানে ড্রাইভার সিটে পা ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ রোদ কাঁপিয়ে হু-হু করে হাওয়া দিতে কয়েকটা মরা পাতা আমার বুকে পিঠে মাথায় এসে পড়ল। একটা হলদে পাতা শাড়ি থেকে ঝেড়ে বাড়িগুলোর দিকে কয়েক পা এগিয়েছে, দড়াম করে ওপাশের বারান্দা থেকে একটা পা ছিটকে এসে নীচে পড়ল। থেমে, ফের স্লোপের ওপর দিয়ে পাশের বাড়িটায় গিয়ে ঢুকলাম। মেঝেতে কাঠের শব্দ করতে করতে পাশের ঘর থেকে ক্রাচে করে ছ-ফুট লম্বা একটি লোক বেরিয়ে এল। আমাকে একনজর দেখে অদ্ভুত কৌশলে একপায়ে একসঙ্গে দুটো সিঁড়ি ডিঙিয়ে দোল খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠে গেল লোকটি উঠে যেতে আমি চোখ নামিয়ে এদিক ওদিক তাকালাম, মমি কোথায় ? যে ঘর থেকে লোকটি বেরিয়ে এসেছিল, সেখানে উঁকি মেরে পিছিয়ে আসতে হল। মমিদের বাড়ির থামের পাশের সেই বীভৎস বিকৃতির প্রদর্শনী ? হাত নেই, পা নেই, মস্ত মাথা, কারো লিক্‌লিকে হাত পা—সব বসে ধুঁকছে। ঘর ভর্তি নুলো খোড়া বিকলাঙ্গ। এত সব ভাঙাচোরা, হতভাগা এই শহরে কে কবে ভেবেছে ! মমি এখানে নেই। শুধু এক মহিলা সিঁড়ির নিচে

টেলিফোনে কান ঠেকিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে অপেক্ষা করছিল। ভাবছি অপেক্ষা করি, এখনই এসে যাবে। এসে, নিশ্চয়ই ওপরে যাবে। হয়তো উপরেই আছে। আশ্চর্য ঐ কথাটা আগে মনে আসে নি। এতক্ষণ পরে তাই দোতলায় উঠে এলাম আর উঠতেই নিতাইয়ের মুখোমুখি। খোলা চাতালের মতো জায়গা, চারপাশে ঘর। একপাশে বেঞ্চে বসে নিতাই ছোটো একটি বাচ্চা ছেলের আর্টিফিশিয়াল হাত লাগিয়ে দিচ্ছিল, সিঁড়ির মাথায় আমায় দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

ওকে এখানে দেখব একথা আমার ভাবা উচিত ছিল। বোঝা যাচ্ছে আমি এখানে যথেষ্ট ভেবে আসি নি। কাজেই চমকে গিয়েছিলাম। স্বাভাবিক হতে সময় নিচ্ছিল। এই ফাঁকে নিতাই ছেলেটিকে ছেড়ে উঠে দাড়াল। বুঝি শ্লেষে বলল, 'আমাদের দেখতে এলেন ?' আমার সঙ্গে নিতাইয়ের এই প্রথম কথা, দেখা হলেও আমি ওর সঙ্গে কথা বলি না। সহজ বোধশক্তিতে তাই আমায় সে এড়িয়ে চলে। আজ কিন্তু ওর চাউনি দেখে মনে হচ্ছে যে ঘৃণা প্রথম দিনই ওকে দেখে আমার মনে জমা হয়েছে, বলা যাবে না যে ওর মনেও তা নেই।

আমি ইতস্তত এদিক ওদিক তাকালাম। ওপরে বেশ লোকজন। পাশের ঘরে কে একজন অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। উর্দিপরা বোধহয় ওয়ার্ডবয় কে একজন যাচ্ছে। আমি কিছুটা নিতাই কিছুটা সম্ভবত সেই ওয়ার্ডবয়ের দিকে উদ্দেশ করা প্রশ্ন ছুড়লাম, 'রুগীদের ঘর কোথায় ?'

নিতাই বসে ছেলেটির হাত টেনে নিল। ফিরেও তাকাল না। সামনের দরজা দেখিয়ে ওয়ার্ডবয়টি উল্টো দিকে চলে গেল, আমি নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে গেলাম। লম্বা বারান্দার গায় পরপর ঘর বাঁ দিক গিয়ে বেঁকেছে। একই দৃশ্য, হাত পা কাটা, কি পঙ্গু ছেলেমেয়ে। বাচ্চা কোলে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। বাচ্চার মাথাটা ঝুলছে, আমাকে দেখিয়ে মেয়েটি বলল, 'দেখ দেখ, দিদি এয়েছে।' নড়বড়ে ঘাড় তুলে বাচ্চাটি একমুখ হাসতেই টপ্ করে এতটা নাল গড়িয়ে পড়ল, মেয়েটি রুমালে ওর মুখ চেপে ধরল, 'এই দুষ্টু মেয়ে, মুখ বোজ।' বাচ্চাটি হাসছে আর মুখ থেকে নাল গড়িয়ে গড়িয়ে জামা ভিজছে।

যতটুকু সম্ভব দূরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে মমতা বলে একজন রুগী আসে, ও কোথায় বলতে পারেন ?'

ভুরু কুঁচকে মেয়েটি ভাবছে, মমতা, কোন মমতা ? হঠাৎ যেন উত্তর পেল, 'খুঁজে দেখুন না ?'

না খুঁজেই পেলাম, বড়ো হল ঘরটায় তাকাতেই দেখছি দূরে প্যারালাল বারে মমি দাঁড়িয়ে আছে। থমকে রইলাম। পাজামার ওপর লোহার ফ্রেমে চামড়ায় জড়ানো দুটো পায়ের ফ্রেম। দূর থেকে শরীরের নীচটা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো দুটো লোহার পাত মনে হচ্ছে।

আমি মমিকে এভাবে দেখতে আসি নি। আরো অনেক ভাঙাচোরা কোনো মমতার সঙ্গে একাকার হয়ে লোহার পাতে মোড়া খারিজ হয়ে যাওয়া মমিকে। আমি এ আর দেখে সহ্য করতে পারছিলাম না। এত যে আমার কষ্ট হতে পারে, আমি তা জানতাম না। কী করে তবে তা আমি মমিকে জানতে দিতে পারি? কী করে জানতে দিতে পারি, এই যে ভাঙাচোরা লোকগুলোর মাঝে সে অনেকের একজন, খাঁজে খাঁজে মিলে গিয়ে 'ডাভটেইলড্'। আমাদের চেয়ে অন্য এক পালকের, অন্য এক জগতের, আমাদের আর কেউ নয়, মমি আমাদের কেউ নয়, এ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি যেন আসিই নি—সন্তর্পণে পিছু হটে ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে চলে এলাম। দেয়ালে ঠেস দিয়ে, টেলিফোন কানে সেই ভদ্রমহিলা তেমনি অপেক্ষা করছেন। পাশ দিয়ে বেরিয়ে, মাঠে নেমে, হঠাৎ ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে, ওপারে খামোকা একবার তাকাতেই দেখি, মমি দাঁড়িয়ে, যেন এই নির্ধারিত তাকানোর মাত্র অপেক্ষায়, যেন সবজান্তা, হাসছে। আমিও হাসছি। মমি চেঁচিয়ে বললে, 'দাঁড়া আসছি।'

সিঁড়িতে তাকিয়ে ছিলাম। সেদিক দিয়ে নয় পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সেখানে তবে একটা লিফট্ আছে। কালো একটি মেয়ে, গায়ে শাদা অ্যাপ্রন, চেয়ার ঠেলে নিয়ে আসছে।

এসেই খুশিতে অস্থির। 'কখন এসেছিস? দেখলাম খুঁজছিস, আমায় দেখতে পাস নি বুঝি?'

দু-চোখ খুলে মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। একটু বেশি রকম খোলা, ছায়া কম, আখরোটের ফিকে রং ছিল ঐ চোখে। মনসা পুজোর আগে স্নানাঘাটে সাপের ঝাঁপি নিয়ে বেদেরা আসে। গাল ফুলিয়ে বাঁশিতে সুর দিতে ঝাঁপির ভেতর থেকে বাদামি কালোয় চক্রে কেউটে ফণা তুলে সোজা হয়ে উঠে, খোলা দুই চোখে বাঁশির দিকে তাকিয়ে থাকে। ঐ চোখে তাকালে ভয়ের সঙ্গে কেমন নেশাও লাগে। মেয়েটির চোখেও যেন ঝাঁপিতে ঢাকা তেমনি ভয় আর ধুতুরা।

আমিও ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম, মমি খুশি হল। বলল, 'কী দেখছিস? ওই তো সুপ্রিয়া।' সুপ্রিয়াই জবাব দিল, 'দেখছে বন্ধুত্ব করা যায় কিনা।'

কী ভাবছি কেউ জানে না। সায় দিলাম, 'ঠিক তাই।'

গলা খুলে সুপ্রিয়া হাসতে লাগল। সে হাসিতে অনেক উচ্ছ্বাস। চোখ বুজে ও উচ্ছ্বাস বোঝা যায়।

হুইল চেয়ার সামনে পেছনে করতে করতে মমি বলল, 'সাবধান সুপ্রিয়া, কাছে বেশি ঘেঁষিস না, সব ফাঁক করে দেবে। সাহিত্যিক কিন্তু!'

খোলা চোখ আরো খুলে সুপ্রিয়া আমায় টানতে চাইছে। 'হাসপাতাল দেখবেন না? কিছু না হোক লেখার কাজে লাগবে।'

আমার জবাবের আগেই মমি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ও দেখতে হবে না, কীই বা ছাই দেখার আছে। চল আমরা একটু ঘুরে আসি। গঙ্গার ধারে, যাবে সুপ্রিয়া?'

হাসপাতাল দেখানোর এত যে বায়না, এখন তা ফুরিয়ে গেছে। এলাম দেখতে, দেবে না। বুঝি, আমিও বুঝলাম। কী করে বুঝে, বাড়ির পেছনের ছায়ার দিক থেকে প্রতাপ গাড়ি নিয়ে হাজির। হুইল চেয়ার ও গাড়িতে কাঠের পাটাতন বসিয়ে সুপ্রিয়া মমিকে ভেতরে বসিয়ে দিল। আমি ঘুরে গিয়ে গাড়ির ওপিঠে দাঁড়ালাম। ও দিকের বাড়িটায় তেমনি খটাখট আওয়াজ হচ্ছে, বাড়িটা থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। হাতে কয়েকটা আর্টিফিশিয়াল হাত। চামড়ায় মোড়া নকল আঙুলগুলো ওপরের দিকে উঁচানো। ভদ্রলোকের মুখ প্রায় আঙুলে আঙুলে ঢাকা। মমিকে দেখে ডেকে বলল, 'চলে যাচ্ছ?'

মমি চেঁচাল, 'আর কত হাঁটব? এবার গঙ্গাযাত্রা। যাবেন নাকি?'

'আমার রুগীদের দেখবে কে?'

'ওদের একদিন বাঁচতে দিন।'

'জানো, এর জন্য তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

'ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করুন।'

ভদ্রলোক জোরে হেসে উঠলেন, 'মমি, মমি বি গুড

মমি তেমনি পাল্টা ছুড়ল, 'ডক্টর হিল দাইসেল্‌ফ।'

চলে যেতে, মমি আমাকে বলল, 'এ কে জানিস অদিতি? আমার প্রথম ফিজিওথেরাপিস্ট, সন্দীপবাবু। ওকে আমার ঘৃণা করা উচিত।'

সুপ্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। শাড়ি পাল্টাতে গেছে।

দরজাটা খোলা রেখে ভেতরে গিয়ে বসলাম। খানিকক্ষণ মমি অন্যমনস্ক রইল তারপর এক সময়, যেমন ওর মাঝে মাঝে হয়, কষ্টে শ্বাস ফেলে বলল, 'এ দেড়

বছরে অনেক কিছু শিখলাম অদিতি। এই যে সন্দীপবাবুকে দেখলি, জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুঃখ এর কাছ থেকেই পেয়েছি। তবু বলব ওর কাছেই আমি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ।

'আমি প্রথম যখন এখানে আসি তখনও বর্ষা নামে নি। তোড়জোড় চলছিল। দুপুরে এসেছিলাম। স্ট্রেচারে তুলে ওদের পি-টি-র জানালার ধারে সরু বিছানায় শুইয়ে দিল। খানিকপরে এখানকার ইনচার্জ ডাঃ সেন, এই সন্দীপবাবু, আরো অনেক থেরাপিস্ট আর ছাত্রদের নিয়ে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল। ডাক্তার ওদের কী সব বোঝাচ্ছিলেন, ওদের দিকে তাকিয়ে আমার কী মনে হচ্ছিল জানিস? আমি যেন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, ডাক্তার আমার বিচার করছেন। মাথার উপর পাখা ঘুরছে। আমি এ দৃশ্য এড়াতে ঐ পাখার দিকে তাকিয়ে রইলাম, তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম বিনা অপরাধে কি কারো বিচার হয়? অ্যাক্সিডেন্টের পর পরই বাবা এক সাধুকে ধরে এনেছিলেন। সাধুও তাই বলেছিলেন, কর্মফল। আমি তাই ভাবছিলাম, ভাবছিলাম, আমি কী অপরাধ করেছি?'

হঠাৎ মমি হাসতে শুরু করল, আমি বিহ্বল তাকিয়ে রইলাম, হাসতে হাসতে ওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে, অতিকষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, সন্দীপবাবু তখন কী করল জানিস? বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ ফুল স্পিডে পাখাটা ঘুরিয়ে দিলেন। এদিকে ডাক্তারের হাতের কাগজ আমার ভূত ভবিষ্যৎ চার্ট ডায়াগ্রাম ফর ফর করে এদিক ওদিক উড়ছে। গোলগাল, মোটাসোটা ডাক্তার কী হল, কী হল করছেন, কাগজ ছুটছে, স্টুডেন্ট, স্টাফ কাগজের পেছন পেছন ছুটছে। হঠাৎ সন্দীপবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'স্যার মেয়েটি বড্ড ঘামছে।' ডাক্তার কিছু বুঝতে না পেরে 'অ্যাঁ!' বলে বেয়াকুব হয়ে তাকিয়ে আছেন, সে কী দৃশ্য!' আবার হাসি, তারপর হাসি থামিয়ে চোখ মুছে বলল, 'বাব্বা। সে এক দৃশ্য। থলথলে মুখ বড়ো বড়ো চোখে ডাক্তার তাকিয়ে আছেন।' বলে চুপ করে গেল।

এত হাসি, একটানা কথা, তারপর এমন চুপ! আমার কেমন ঠেকল। একটু পর আবার মমি বলল, 'এই সন্দীপবাবুকেই আমার ট্রিটমেন্টের ভার দেয়া হল। রোজ ডাক্তার রাউণ্ডে আসতেন। দেখা হলেই বলতেন, সন্দীপ তোমায় ভালো করে তুলবে মমতা। কিছু ভেবো না। কদিন পরই তুমি হাঁটবে।'

মমি আমার দিকে ফিরে বলল, 'ডাক্তারের কথায় বোকা আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতাম, আর কটা দিন। পি-টি-র জানালার ধারে খাট। আকাশ দেখা যায়। একদিন দুপুরে খুব মেঘ করেছে, কালো মেঘের ভেতর শাদা ডানা ঝাপটিয়ে

একঝাঁক বক মিলিয়ে গেল। খুশিতে আমার অসাড় শরীরেও কেমন ছটফটানি শুরু হল। আমি ভালো হয়ে যাব। ছুটে গিয়ে সবাইকে বলতে ইচ্ছে করছিল। ভালো হয়ে যাব। ভালো যে হবই তার অনেকগুলো কারণও ছিল। এক আমি কারো ক্ষতি করি নি। তবে কেন আমায় দুঃখ পেতে হবে? আমার বয়স হয় নি, এ বয়সে কেন অসাড় হব? আর হাঁটব না এ কী করে সম্ভব? সুমন্তকে ছেড়ে কী করে থাকব? ডাক্তার বলেছেন সন্দীপবাবু ভালো করে দেবেন। সুতরাং এই যে শুয়ে আমি, এ সব মিথ্যে, সব দুঃস্বপ্ন। নিশ্চিন্ত মনে ভালো হয়ে কোথায় বেড়াতে যাব তাই ভাবছি। সন্দীপবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন।'

মুখ ফিরিয়ে ঝুঁকে মমি গাড়ির বাইরে তাকাল। কখন ভিখিরির দুটো বাচ্চা গাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দূরে ঘাসে বসে প্রতাপ। বাচ্চা দুটোকে দেখে ওখান থেকেই তেড়ে উঠল, 'এই ভাগ।' এক পা সরে বাচ্চা দুটো পেটের কাপড় তুলে নাকি সুরে শুরু করল, 'হেই মা, দুটো পয়সা দে, দুদিন খেতে পাই নি, হেই মা।' মমি হাত নেড়ে ওদের ডাকল, 'এদিকে আয়।' ওরা ছুটে আসতে ওদের নিয়েই মমির এক লুকোচুরির খেলা, হাতের পয়সা ওদের হাতের তেলো ছুঁইয়ে ঝট করে আবার তুলে নিচ্ছে। ছেলে দুটোও যেন মজা পেয়েছে। লাফালাফি ঝুলোঝুলি মহা আনন্দ। তারপর একসময় পয়সা পেয়ে কেমন চুপচাপ হয়ে গেল, যেন ওদের সব শেষ হয়ে গেল। ওরা হতাশ মুখে দাঁড়িয়ে একটু পরে কেমন যেন মনমরা হয়ে চলে গেল।

মমি মুখ ঘুরিয়ে হাঁফ নিয়ে বলল, 'সেদিনই এল আমার চরম আঘাত, অদিতি। সেদিন সন্দীপবাবু আসতে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কবে আমি আবার হাঁটব সন্দীপবাবু? সন্দীপবাবু খানিক ভাবলেন তারপর খুব আস্তে একবার, না তা হয় না, খুব আস্তে আস্তে দুবার মাথা নেড়ে বললেন, যা সত্যি আর যা বলার নয় তাই। আমার মতো রুগীরা ভালো হয় না। আমি জানলাম।'

মমি হাত দিয়ে ডান পাটা তুলে আবার পুরনো জায়গায় রাখল। বাঁ পা তুলে রাখতে বলল, 'আমি হাঁটব না। জীবনে কোনোদিনও হাঁটব না। আমি জানলাম। আমার সামনে সব থেমে যাচ্ছিল। দু-হাতে বিছানার দু-পাশে চেপে ধরে ধরে চোখ বুজে রইলাম। অসাড় স্থবির, বিকলাঙ্গ কতগুলো জড় দেহ আমার চোখের সামনে পড়ে রইল। চোখ চেপে কিছুতেই সেই ছবি দূর করতে

পারলাম না। মাইলের পর মাইল জুড়ে নড়ছে না, পথ ছাড়ছে না, নিঃসাড় হাত পা জড়পিণ্ড আমার পথ রোধ করে রইল।'

দড়াম করে গাড়ির খোলা দরজাটা মমি বন্ধ করে দিল। চমকে ঘুরে তাকালাম। আমল না দিয়ে মমি বলছে, 'এক সন্দীপবাবু ছাড়া সবাই আমায় ঠকিয়েছে, অদিতি। সন্দীপবাবুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আর তোরা সব এত ভালো তোরা অদিতি, ওকে আমার ঘৃণা করা উচিত।'

প্রতাপ এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। সুপ্রিয়া আসছে। মমি হেসে ওকে বলল, 'এত দেরি?'

সুপ্রিয়া আমাকে বলল, 'আপনার অসুবিধে হল?'

ভাবছিলাম মমির কথা, বললাম, 'তুই বেশি বেশি ভাবিস মমি।'

গাড়িতে উঠতে উঠতে সুপ্রিয়া বলল, 'যা বলেছেন।'

মমির ম্লান হাসি, 'কী আর করার আছে বল?'

সুপ্রিয়া স্বভাবত উচ্ছ্বসিত। আমিই তার লক্ষ্য। 'কাল একটায় হাসপাতাল ছুটি। যাবেন কাল সিনেমায়? মেট্রোয় ডাক্তার জিভাগো চলছে, যাবার পথে টিকিট কেটে নেব।'

'কাল আমার কাজ আছে,' বলে এড়িয়ে গেলাম।

৭

মেসোমশায় কিছু বলেন না। কিন্তু বুঝতে পারি বিকেলটা আমি মমির কাছে কাটালে খুশি হন। নিশ্চিন্ত থাকেন। রোজ না হলেও প্রায়ই আমি যেতে চেষ্টা, করি, যাইও। রমেশ বাগানে চেয়ার পেতে রাখে। আমি আর মমি ওখানে গিয়ে বসি। মেসোমশায় মাঝে মাঝে এসে বসেন। ক্বচিৎ মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেছেন, আজকাল তাও চেষ্টা করেন। এসে খানিক বসেন, তারপর একসময় হাঁটতে চলে যান। লিও স্পটি আর নেই। আমি মমিকে গল্প শোনাই, স্কুলের, বইয়ের,

বিলেতের। রোজ আর কীই বা বলার থাকে। আজকাল কথার খোরাক একপক্ষ অর্থাৎ আমাকেই জোগাতে হয়। মমির ছিল হাসপাতালের গল্প, সেদিনের পর দুজনেই তা এড়াই। কথাপ্রসঙ্গে সুপ্রিয়ার কথা, সন্দীপবাবুর কথা কখনো সখনো ওঠে, এই পর্যন্ত। রীনার কথা আর নাই বললাম! টিকিরও দেখা নেই। স্কুল ফেরত একছুট ক্লাবে; থিয়েটার আছে যে। সত্যি মেয়েটা মোটেই পড়াশোনা করে না। এতবড়ো বাড়িতে আমি মমি আর সুমতির ইতস্তত ছায়া, স্বভাবতই যা মৌন। সুপ্রিয়া এলেও রকমফের হত। আর এলেই বা কী। আসবে হয়তো পরিবেশ পাল্টাতে নিজের চাহিদার টানে। যা কিছু হোক পেতে। আর কে আছে যে আসবে! যার সবচেয়ে বেশি দরকার, সবচেয়ে বেশি যার আসার কথা, সে সুমন্ত। সেদিনের পর আর একদিনও সুমন্তকে এ বাড়িতে দেখতে পাই নি। না আর কোথাও। যখনই চেষ্টা করি, মমি সুমন্তর কথা উঠতে দেবে না, চেপে যাবে। থাকি শুধু মমি আর আমি, আমরা দুজন। শীতের আবছা বিকেলে বসে বসে খানিক গল্প করি, তারপর লাঠি খট খট করে আসে নিতাই। রোজ রোদ ঝড় বৃষ্টি বাদল মাথায় করে এসে হাজির হওয়া চাই। আমি যতক্ষণ থাকি বিশেষ কথা বলে না। আমি চলে এলে কী হয় আমার জানার কথা না। আমি জানি না।

আজকাল প্রায়ই দেখি, দেখে গা ঘিন ঘিন করে, মমির গা ঘেঁষে নিতাই বসে আছে। আবার শুনছি, পড়াশোনাও নাকি হয়। অকাজে অজুহাতে কাছাকাছি। আজও ঢুকতেই এমনি দেখে ভেতরে চলে গেলাম। জানি রীনা বাড়ি নেই, তবু একবার রীনার খোঁজে সব কটা ঘর ঘুরে এলাম। তারপর ভেতরের বারান্দায় রান্নাঘরের ওদিকে সুমতির দেখা। বারান্দার টবে সুমতির তুলসী গাছ। সুমতি বসে গাছের মরাপাতা শুকনো ডাল পরিষ্কার করছিল। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। একদিনের ছিটেফোঁটা চেনায়, কাটছাঁট মহিলাটি, আমার সন্দেহ ছিল, উঠে চলে যাবে। সুমতি কিন্তু, মোড়া পেতে দিল, যদিও নিজে চুপ করে রইল। কোনো কিছু বলার সংকল্প আর নিশ্চয়তা যদি যুগপৎ এক না হয়, তাহলে মুখের অভিব্যক্তি যেমন হয় সুমতির মুখে এখন তা বহুভাবে বিজ্ঞাপিত। ওর দৃষ্টি সামনে, বলার আগের প্রস্তুতি নিতে হাওয়ায় চোখ নিবদ্ধ, হাত দু-হাঁটুতে জড়ানো, এবং কথা যখন বলল স্পষ্টই বলল সে দ্বিধা ভেঙে, 'একটা কথা বলি দিদিমণি খুকুদের সঙ্গে কি আপনার অনেক দিনের চেনাশোনা?'

এ কথার উত্তর পেছনে পা ফেলে দিতে হয়। কলেজে চেনা, প্রথম দিনেই

ভাব। ছেলেবেলায় দেখা হলে বান্ধবী না, হয়তো হতাম অদিতিদি। মমির আমি দিদি ভাবতেই হাসি পেল। হেসে বললাম, 'হঠাৎ এ কথা কেন?'

সুমতি এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলি দিদি, কাউকে বলবেন না।'

প্রশ্রয় দিতে আবার জানলাম। ওকেও হাসতে হল, হাসলে ওর মুখ কেমন জ্বলে। যেহেতু এমনি সব রূপকের কথা আমি বলছি ওকে দেখলে নিশ্চয়ই আমার একচক্ষু এক সাইক্লপের কথা মনে পড়তে পারত: বিশালদেহ দৈত্য পাহাড়ের কিনারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে, সুমতিও যেন সেই একচোখা সাইক্লপ, মমি বলতে যে অন্ধ।

সুমতি আমার মোড়ার কাছে এগিয়ে এসেছে। অনুনয়ে ওর মুখ এমন অস্থির। যদিও সে আমার তখন যথেষ্ট কাছাকাছি, বুঝি বা নৈকট্যে আস্থা বাড়ে, সুমতি যেন আরো ঘেঁষে এল। এগিয়ে বলল, 'দিদিমণি খুকুকে বলে কয়ে এ পাগলামি থামান, আপনি ওকে বোঝান। একি কাণ্ড সেদিন ও করল? এ কার দোষ? মিছিমিছি ঝগড়া বাধিয়ে আর নিজে নিজেই ব্যথা পায়। বুঝতে পারি কেন এমন হয়। তা বলে কি নিজেরটা আর দেখতে নেই। চিকিচ্ছে হচ্ছে। ওষুধ খাচ্ছে, উপকারও হচ্ছে মেলাই। শুনছি বিলিতি ডাক্তারও আসছে। এদিকে আবার রাত্তিরে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদবে, তবু জেদ ছাড়বে না। এটা কি উচিত হচ্ছে?'

অন্যকথা ভাবছিলাম, মমি লুকিয়ে কাঁদে, সুমন্ত কি জানে তা? যেন ধরা পড়ে গেছি।

তাড়াতাড়ি ওর কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'তা বটে। উচিত তো নয়ই।'

এমন সমর্থন পেয়ে সুমতি এবার শাদামাটা কথায় এল, 'আপনি দাদাবাবুকে একবার ডেকে আনুন দিদিমণি। মা-হারা মেয়ে; রীনা ছেলেমানুষ, বাবাই বা এসবের কী বুঝবেন? আপনি একবার দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা করুন।'

কারণ থাকার কথা নয়; তবু কেন জিজ্ঞেস করতে ইতস্তত করছিলাম, 'দাদাবাবু কি ঐ বাড়িতেই আছেন?'

সুমতি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, 'কোন বাড়ি?'

তাড়াতাড়ি ভুল শুধরে বললাম, 'ও কিছু না, দেখি কী করা যায়?'

'তাই করুন দিদিমণি। আপনি দাদাবাবুকে একবার ডেকে আনুন। খুকুকে কিন্তু কিছু বলবেন না।'

কথা শেষ হতে উঠে আসছিলাম, রমেশের সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করলাম, 'নিতাই চলে গেছে?'

'না এইবার যাবে বইপত্তর তুলছে।' রমেশ ছোটো উঠোনটায় নেমে গেল। ঝাঁট দেবে।

ভেতরে গিয়ে দেখি নিতাই ওঠার মুখে, দেখতে পেয়ে আমার দিকে পেছন ফিরে বলল, 'দিদিমণি, কাল আমাদের হোঁৎকা ডাক্তার সাব আমায় হাসপাতালে ডেকেছে। আপনাকে কিন্তু যেতে হবে।'

মমি ওর হাতে একটা খাতা দিয়ে বলল, 'কাল তো বেস্পতিবার, পুরোনো রুগীদের চেক্ করার দিন। আর কাকে কাকে ডেকেছে জান?'

'আর ভুতো বিশ্বনাথকে, বাকি সব আমার নবকেষ্ট।'

'তোমার প্লাস্টিকের পা তৈরি হয়ে গেছে নিতাই?'

নিতাই পায়ের স্ট্র্যাপ ঠিক করে বলল, 'হয়েছে, তাই তো এবেলা এমনি ভাগাতে চায়। কাল পা লাগিয়ে গলাধাক্কা। বেশ ছিলাম এখানে। সব শালা সমান।'

আমি সামনে বসে; মমি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তা অনেকদূর যাবে, এখন চলে যাও তো।'

নিতাই কয়েক পা এগিয়ে আবদার করল, 'দিদিমণি কাল হাসপাতাল থেকে বিদায় করে দেবে, আমার কাজের কিছু করলে না? দেশে আমি আর যাব না কিন্তু।'

হঠাৎ মমি কেমন বিরক্ত হয়ে উঠল। রুক্ষ গলায় বলল, 'আর কাউকে বলতে পার না নিতাই, খালি আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন? রিহেবিলিটেশন সেন্টারেও তো অনেকে আছে। সোশাল ওয়ার্কারকেও বলতে পারো। আমাকে বিরক্ত করবে না, বাড়ি যাও।'

নিতাই হক্চকিয়ে চেয়ে রইল। তারপর নিঃশব্দে কাঠের পা টেনে টেনে চলে গেল।

মনে মনে প্ল্যান করে এসেছিলাম মমিকে পিক্‌নিকে যেতে রাজি করাব আবার। আর ঐ অজুহাতে সুমন্তকে ডেকে আনব, এখন এই পরিস্থিতিতে সব ভেস্তে যাচ্ছে। আমার আসাই মাটি হল।

চিরকাল চুপ করে থাকা যায় না, মমিই বললে, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি?'

এই সুযোগ, উৎসাহে জানালাম, 'মমি তোদের সজনে গাছটায় ভারি সুন্দর দুটো পাখি দেখলাম। কলকাতায় কখনোও এমন পাখি দেখি নি।'

মমি ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল। 'হ্যাঁ শীতে অনেক রকম পাখি ঐ গাছটায় আসে। উঠোনে বসে ঐ দেখছিলি ?'

'সুমতির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। রমেশের উঠোন ঝাঁটও দেখছিলাম হঠাৎ সজনে গাছে ঐ পাখি দুটো এল। হলদে ডানা, কালো মাথা, লাল টুকটুকে ঠোঁট, ভারি সুন্দর। জোড়ে ছিল।'

মমি বলল, 'হ্যাঁ ঐ গাছটায় অনেক পাখি আসে। একটা সময় আসে যখন সজনে ফুল ফুটতে শুরু হয়, সকালে মৌমাছিতে গাছটা ভরে যায়। সারাদিন কতরকম পাখি যে আসে !'

বললাম, 'তুই তো কলকাতার বাইরে বেশি যাস নি, একটু বাইরে বেরুলেই কত রকম যে গাছ, কত রকম যে পাখি। বাবা থাকতে আমরা ছুটিতে সব সময় বাইরে যেতাম। একবার পাহাড়ে একটা পাখি দেখেছিলাম, বাবা কী যেন নাম বলেছিলেন, অদ্ভুত ঠোঁট।'

মমি দুঃখ করে বলল, 'তুই অনেক বেড়িয়েছিস, তাই না ? আমরা শুধু ঐ মধুপুর অবধি।'

সোফার এখানটায় কার্পেট বলে হুইল চেয়ার নিয়ে মমি বিশেষ এদিকে আসে না। আমি উঠে ওর পাশে গিয়ে বললাম, 'মমি চল একদিন পিকনিকে যাই। মেসোমশায়কে বলব কলকাতার বাইরে যদি চেনাশোনা কারো বাড়ি থাকে। সকালে গিয়ে বিকেলে চলে আসব। তোর তাহলে কষ্টও হবে না, ভালোও লাগবে, চল না ?'

মমি খুশি হয়ে উঠল, 'সত্যি কত বছর যে কোথাও যাই না। চল একদিন পিকনিকে যাই, ভীষণ মজা হবে। কবে যাব ? সন্দীপবাবু, সুপ্রিয়া ওদেরও বলব।' তারপর থেকে পা ঠিক করল, হাতে চাপ দিয়ে সোজা হয়ে বসল। সোজা তাকিয়ে বলল, 'রাগ করতে পারবি না। আগেই বলে রাখছি নিতাইকে কিন্তু আমি নিয়ে যাব।'

'কে বললে আমি রাগ করব ?'

'ও তোর মুখ দেখেই বোঝা যায়। তোরা ওকে কী চোখে যে দেখিস। আমার হাসি পায়। বেচারার কেউ নেই আমাকেই যা আপন জানে। কাল আবার হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে দেবে ; কী যে করি।'

আবার নিতাইকে নিয়ে পড়ছে! সময় থাকতে উঠে দাঁড়ালাম। খুশি মনে পিকনিকে যাবে বলেছে। আর না ঘাঁটানোই ভালো। ভেবেছিলাম রীনার কাছ

থেকে জেনে নেব, সুমন্ত সেই পুরোনো বাড়িটাতেই আছে কিনা, তা আর হল না। দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমি উঠছি মমি, কাল তাড়াতাড়ি আসব, রীনাকে বলিস বাড়ি থাকতে, অনেকদিন দেখি না।'

দরজার কাছে গিয়ে আবার বললাম, 'যাচ্ছি মমি তুই তো এখন এক্সারসাইজ নিবি, কাল তাড়াতাড়ি আসব। মেসোমশায়কে বলিস পিকনিকের কথা।

৮

পরদিন রমেশ দরজা খুলে দিল। সারা দুপুর টেনে ঘুমিয়েছে ফোলা চোখ মুখ। হাই তুলে বলল, 'ও দিদি কিন্তু আজ বাড়ি নেই।'

নতুন কিছু নয়, প্রায়ই ও হাসপাতাল যায়। জানতাম আজ যাবেই। ফিরতে যা কিছু দেরি। রমেশ কিন্তু চমক দিতে চাইছে। দিল জোর খবর। 'দিদি আজ ছোটো দিদিমণির থিয়েটার দেখতে ডলিদের বাড়ি গেছে।'

অবাক হয়ে গেলাম। 'কী করে হবে? ডলিদের বাড়ি দোতলায় না?'

শুনে, রমেশও বোকা বনে গেছে। 'তাইতো, তবে? দিদির যে আজকাল কী হয়েছে। কিছুই আর বোঝা যাচ্ছে না।'

যেন খুব চিন্তিত, রমেশ চলে যেতে মন আমার হঠাৎ হালকা হয়ে গেছে। মমিকে এবার পরিষ্কার দেখছি আমি। এ বাড়িতে রমেশ বুড়িয়ে গেছে, জন্ম থেকে মমিকে দেখেছে, পিঠে কাঁধে মানুষ করেছে। রমেশ মমিকে আজ বুঝছে না। মমি আমাদের কাছে থেকে সরে গেছে। সত্যি সত্যি। আমরা আর কেউ না মমির। সুমন্তও না।

রোদ আসে বলে বারান্দা চিকে ঢাকা। আধো অন্ধকার ঘর। কী আর করি? সোফায় পা তুলে আধ শুয়ে আরাম করে একটা বই নিয়ে বসলাম। 'ডেনিস দ্য মিনেস', ছোট্ট ডেনিসের দস্যিপনা। ভীষণ মজার। মাঝে মাঝে নিজের মনে এমনকি জোরে, বেদম হাসছি, এমনি মজার। আর খালি মনে পড়ছিল মিঠুকে।

ছোট্ট ভাই আমার মিঠু, ছোটো মামার ছোটো ছেলে। এই দিনকয়েক আগে মা ছোটো মামিমা রানাঘাট থেকে এসেছিলেন। আগেই কথা ছিল সোমবার দুপুরে ছোটো মামী আর মা চলে আসবেন, মাকে চোখের ডাক্তার দেখাব। অ্যাদ্দিন আমি বাইরে ছিলাম, ভালো অজুহাত ছিল মার, ডাক্তার এড়িয়েছেন, 'অতু আসুক তারপর সব হবে।' এখনও আজ-না-কাল। এবার ছোটো মামীকে জোর করে বলে এসেছিলাম, তাই এসেছেন। আমি টিফিনেই ছুটি নিয়ে চলে এসেছিলাম। ওপরে উঠতে যেতেই দেখি মিঠু সিঁড়ির রেলিং-এ দু-পা দু-দিকে ঘোড়া ঘোড়া খেলছে। আমাকে দেখতেই লাগাম ছেড়ে দৌড়। খবর দিতে গেল, 'মা দিদি এসে গেছে।'

ঘরে ঢুকে পর্দাটা সরিয়ে দিলাম। 'কখন এলে তোমরা ?'

হঠাৎ আলোয় দেয়ালে ঘোড়া দেখে ছোটো মামী আঁৎকে উঠলেন, 'একি করেছিস অতু ? রাত্তিরে ভয় করে না ? ঘোড়ার কঙ্কাল কেন ?'

মিঠু লজেন্স চুষছিল। কারণ দেখাল, 'ছবির ঘোড়া খেতে পায় না যে, তাই ভূত হয়ে গেছে, না দিদি ?'

আমি হেসে উঠলাম, 'শুনলে তো ? ছোটো মামী মিঠুর আমার কী সাংঘাতিক বুদ্ধি ?' আদর করে ওর মাথা নেড়ে দিলাম।

মা খাটে শুয়ে ছিলেন, দেয়ালে তাকিয়ে বললেন, 'আজকাল যে কী হয়েছে। কিনেছিস না কেউ দিল ?'

পাখাটা চালিয়ে দিয়ে কুঁজো থেকে জল গ্লাসে ঢালছি। বললাম, 'কে আবার দেবে ?'

'এ কেউ পয়সা দিয়ে কেনে ? যত সব।' মা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

আমি মিঠুকে তাড়া দিলাম, 'চল মিঠু বেরিয়ে পড়ি। ছোটো মামী চল। একটু পরে রাস্তায় ভিড় জমে যাবে।'

রাস্তায় বেরিয়ে মিঠু বলল, 'দিদি ট্রামে চড়ব। তোমার মনে আছে কী বলেছিলে ?'

মিঠুকে কী কবে বলেছিলাম, মনে আসছে না। বললাম, 'নেই আবার ? তোর মনে আছে ঠিক ? বলতো শুনি।'

মিঠু গর্বে বলল, 'আমি কক্ষনো ভুলি না। বলেছিলে বল কিনে দেবে।'

হেসে ফেললাম, 'হ্যাঁ, ঠিক মনে আছে। এই না হলে আমাদের মিঠুবাবু ফার্স্ট হয়!'

ছোটো মামী ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

দুপুরের ট্রামে সবাই জায়গা পেয়ে গিয়েছিলাম। মিঠুর মহা উৎসাহ। জানালার পাশে বসে চেঁচাচ্ছে, 'দেখ, দেখ, শহর ছুটছে।'

বউবাজারের মোড়ে এসে সবাই নামলাম। মিঠু আস্তে করে আবার মনে করিয়ে দিল, 'মনে আছে তো দিদি ?' মাকে আড়চোখে একবার দেখে নিল।

আমিও মাথা নাড়লাম 'হুঁ।'

ডাক্তারের সঙ্গে কথা হয়েছে পাঁচটায় মাকে দেখবেন। হাতে অনেক সময়। মিঠুকে বললাম, 'বলতো এবার কোথায় ?'

মিঠু হাতে চিমটি কাটছে, 'বারে জানো না বুঝি ?'

নিউ মার্কেটে নিয়ে গেলে হত। যা হোক, একটু এগিয়েই দোকান পেয়ে গেলাম। ঢুকেই মনটা খুশিতে ভরে উঠল, কতরকম খেলনা। এক জায়গায় নানান রঙের পাখি, প্রজাপতি, জন্তু জানোয়ার, চোখ গোল গোল করে ছোট্ট একটা টেডি বিয়ার তাকিয়ে আছে।

মিঠুকে বললাম, 'ভালুকটা নিবি মিঠু ?'

মিঠু নাক সিঁটকে উঠল, 'ছ্যাঃ, আমি কি বাচ্চা ছেলে ? বন্দুক কিনে দেবে দিদি ?'

বল বন্দুক কিনে ভালুকটাও কিনে ফেললাম।

ফুটপাতে নেমে ছোটো মামী জিজ্ঞেস করলেন, 'ভালুক কার জন্য কিনলি অতু ?'

'কারো জন্য নয় এমনি।'

মা হাঁটছিলেন, শুনে থেমে গিয়ে প্রথম অবাক, তারপর আহত, ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী ছেলেমানুষি। শুধু শুধু এতগুলো টাকা নষ্ট করলি ?'

মিঠু একবার মা, আর একবার আমার দিকে তাকাল, তারপর মুখ বুজে হেসে এসে আমার হাত ধরল।

আমরা দু-জন হাত ধরে হাঁটতে লাগলাম, ওকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বড্ড মন কেমন করছিল।

এমনিতেও একা বসে বসে মন কেমন করার কথা। তার উপর ঘরে এসে ঢুকল নিতাই। দেখে থমকে দাঁড়াল। একমিনিট, তারপরই লাঠিতে ভর করে সোজা ওর টুলে গিয়ে বসল। ঘরের এককোণে ওর একটা টুল আছে।

হোক চোয়াল ওর শক্ত, নিতাইয়ের দিকে তাকিয়ে আজ আমায় কেমন মজায় পেয়ে বসল। উঠে আলতোভাবে সোফায় হেলান দিয়ে বসলাম। সোজা তাকালাম, বললাম, 'তোমার দিদিমণি বাড়ি নেই।'

কাঠের মুখ ভাবলেশহীন, মুখে দরোজা দেয়া, বলল, 'আমি জানি।' বলে নীচু হয়ে প্লাস্টিকের পা সোজা করতে লাগল।

বই মুড়ে হাঁটুর ওপর থুতনি চেপে বসলাম। 'তুমি কী কাজ করতে?'

মুখ তুলে অবাক হয়ে সে তাকিয়ে রইল। কিছু যে তাকে জিজ্ঞেস করব এ হয়তো আশা করতে পারে নি! চাউনিতে কেমন সন্দেহ, আজব সেই একমিনিট। তারপর বেশ হেসে গড় গড় করে বলল, 'মোট বইতাম, কুলিগিরি করতাম, চুরি করতাম, এখন তো আর পা নেই। এখন আপনাদের দয়া।'

আমার কেমন জেদ চেপে গেছে। বললাম, 'আপনজন কে কে আছে?'

আমায় দেখলে ওর মুখে কেমন জ্বালা ধরে। যেন মুখে একতাড়া পাতা পুড়ছে। মুখ কুঁচকে যাচ্ছে, লাঠিটা শক্ত থাবায় ধরে বলল, 'আমার দিদিমণি আছে।'

নিমেষে আমার হাল্কাভাব কেটে গেল। বুকে চাপ চাপ ভার, ভয়। কেমন ভাবনা হয়, একে এখানে আসতে দেয়া উচিত নয়। কিন্তু কাকে বলব। এ বাড়ির সব কেমন ছন্নছাড়া। রোজ রোজ বাড়িতে বিকলাঙ্গ এই লোকটা, হাসিখুশি যে রীনা, তার নেই দেখা, সুমন্ত নেই। মমি একটা চেয়ারে আঁটা, সব কেমন দমচাপা, পুরো বাড়িটাতে এখন একটা আওয়াজ নেই, চারদিকে চিকে ঢাকা ছায়া। খোঁড়া লোকটা টুলে বসে তাকিয়ে আছে।

দুড়দাড় করে রীনা এসে ঘরে ঢুকল। খুশিতে ঝকমক। আমাকে দেখে ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরল, 'কখন এসেছ? দুপুরে কেন এলে না? আজ আমাদের স্টেজ রিহার্সাল ছিল, দিদি গেল আর তুমি যেতে পারলে না? আজকাল তুমি যে কী হয়ে যাচ্ছে অতৃদি!'

পিঠে হাত রাখলাম, 'বলেছিলি আমাকে? আমি জানব কী করে?'

কী মেয়ে! বেমালুম সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, 'কেন? দিদিকে জিজ্ঞেস করতে পারলে না? রোজই তো আসছ।'

তবে, দোষটা আমারই, ঘাট মানছি। বললাম, 'থিয়েটারের দিন একেবারে আনকোরা দেখব, থ বানিয়ে দিবি।'

মমি ও সুমতি এসে ঘরে ঢুকল। দুজনেরই হাসি মুখ। চুপচাপ দুঃখী দুঃখী সুমতির ছাঁদও বদলেছে। দেখছি আমার সঙ্গেও মুখ খুলছে। 'আমাদের রীনার থিয়েটার যদি দেখতেন, এত সুন্দর দেখাচ্ছিল।'

মমিও সায় দিল, 'সত্যি ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। শনিবার তাড়াতাড়ি চলে

আসিস অদিতি। ওদের সাজিয়ে দিবি।' কোণের দিকে চোখ পড়তে বলল,'তুমি-ও শিগগির চলে এসো নিতাই। রীনার থিয়েটার দেখবে।'

ডেনিসের বইটা হাতে নিয়ে রীনা হাসছিল। 'পড়ছিলে তুমি? ভারী মজার, তাই না? আমাদের ক্লাবের বই। তোমাদের স্কুলের কস্টিউম কাবার্ডে রাজপুত্রের পোশাক আছে, অতুদি?'

'কেন? কী করবি?'

'বারে, থিয়েটারে চাই যে, পরব না বুঝি? পোশাক ছাড়া রাজপুত্তুর হয় নাকি?'

'ঠাকুরমার ঝুলির গল্প বুঝি?'

রীনা অবাক, 'সে কী! তুমি আমাদের থিয়েটারের গল্প শোনো নি?'

বললাম, 'শোনালি কোথায় যে শুনব?'

রীনা মমির দিকে ফিরল, 'দিদি তুমি অতুদিকে বলো নি?'

চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে মমি বসে আছে। তেমনি বলল, 'কী এমন কথা যে বলব?'

কিছু একটা রয়েছে নিশ্চয়। রীনাকেই জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কী রীনা?'

'ব্যাপার আর কী! দিদি থিয়েটারের গল্প লিখেছে আর তোমাকে বলে নি?'

মমি চোখ না খুলেই বলল, 'ও তোমার মতো বাচ্চা কিনা, গল্প শুনবে?'

'সব্বাই ভালো বলছে কিনা তোমার বড্ড দেমাক বেড়েছে, দিদি।'

সুমতি দুধ চা বিস্কুট ডালমুট ট্রেতে করে সব নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। টেবিলে রেখে মমির কাছে গিয়ে বলল, 'কাপড় জামা ছাড়বে খুকু?'

এক মুঠো ডালমুট মুখে পুরে রীনা বলে উঠল, 'না আজ আমরা দিদিকে ছাড়ছিনে। শোনো অতুদি। বেশ হচ্ছিল, তারপর কী হল গল্পটার। নটে গাছটি মুড়োল না, আমার কথাটি ফুরোল না, মাথামুণ্ডু কিছুই নেই শেষটার।'

হেসে বললাম, 'না, মাথামুণ্ডু তোর একার কিনা! তুই খুব বুঝেছিস!'

রীনা গম্ভীর হয়ে বলল, 'না ঠাট্টা না অতুদি। কী যে সত্যি হল শেষটার! কত বললুম দিদিকে। দিদি শেষ করবেই না। কিছুতেই না। তুমি শুনেই দেখ।'

ডালমুট কোনোক্রমে গিলে, গুছিয়ে বসে, রীনা বলতে শুরু করল।

'সবাই বলত রাজকন্যে খেয়ালি। বলবে না কেন? সবই যে ওর আজব। সাত সমুদ্রের ওপারে রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ে ঠিক। দিকে দিকে লোক ছুটছে। কনের যোগ্য হীরে মোতি গজদন্ত চাই। এদিকে রাজকন্যার কী খেয়াল

চাপল চুপি চুপি খবর পাঠিয়ে দিল রাজকন্যা আর বেঁচে নেই। দেখি না কী হয় রাজপুত্রের ?

'সাত সমুদ্রের ওপারে রাজকন্যের শোকে রাজপুত্র পাগল। নদীর জলে তাকিয়ে রাজপুত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে আমাকে টেনে নাও। আকাশে মেঘ ওঠে রাজপুত্র চোখ মেলে দেয়, বলে আমাকে কাঁদতে শেখাও। হু হু হাওয়া দেয়, রাজপুত্র হাঁপায় বলে, আমায় শ্বাস ফেলতে দাও। রোদে আগুন জ্বলে, রাজপুত্র হাত বাড়ায় বলে, আমায় পুড়িয়ে দাও। জলে সূর্য ডোবে, রাজপুত্র কোন শান্তিতে ডুবতে চায়। রাজপুত্র বসে থাকে, গাছের পাতা নড়ে না, বনের পাখি ওড়ে না, চুপ মেরে যায়। ভোরের শিশির টপ্ টপ্ চোখের জল ফেলে।

'অতুদি ছোটো ছোটো বাচ্চাদের এই মেঘ, রোদ, হাওয়া, সূর্য, পাখি, শিশির সাজিয়েছি। ওদের যে কী সুন্দর দেখায়। তুমি না দেখে ঠিক পাগল হয়ে যাবে!'

হেসে উঠলাম, 'তবেই হয়েছে। থিয়েটার দেখতে গিয়ে খুব লাভ হবে।'

'হেসো না, সত্যি বলছি। তারপর শোনো। এদিকে মহারাজা সিংহাসনে গালে হাত দিয়ে বসে থাকেন, রানীমা চোখ ঢেকে খাটে শুয়ে এপাশ ওপাশ করেন। দীর্ঘশ্বাস পড়ে। দাই পায়ে হাত বুলোয়। দিন যায়।

'একদিন পা টিপে টিপে নাপিত-বৌ এসে রানীমার মহলে ঢোকে। চুপি চুপি কী বলতে রানীমা ধড়ফড় করে উঠে বসেন। মহারাজের কাছে লোক যায়। অন্দর মহলে ডাক পড়ে। রাজা-রানী শলা-ঘরে গিয়ে পরামর্শে বসেন।

'তারপর যা দেখবে না অতুদি। এক ভোর ভোর উষায় রাজপুত্র ঘাসের উপর মাথা রেখে নদীর জলে তাকিয়ে শুয়ে আছে। পাখিরা পাখা নেড়ে আড়মোড়া ভাঙছে, সাতরঙা পালকে সূর্যের আলোয় ঝিক্‌মিক্ করে ময়ূরপঙ্খী নাও এসে নদীর ঘাটে লাগে। সখীরা উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে নৌকো থেকে এক রাজকন্যাকে নামিয়ে আনে। রাজকন্যার রূপে চারদিক আলো হয়ে ওঠে। রাজপুত্র তেমনি চুপ করে শুয়ে। কোনোদিকে তাকায় না। তাকালেই বা আর কী হত অতুদি, ও তো দেখেই নি খেয়ালি সে রাজকন্যাকে। জানতই না এ অন্য আর এক রাজকন্যে।

'ভোরের সূর্যকে প্রণাম করে রাজকন্যা নদীর ধারে ডেরা বাঁধে। সকাল সন্ধ্যা পা টিপে টিপে নদীর জলে পুজো করতে নাবে। একদিন রাজপুত্রের পাশ দিয়ে নদীর জলে নামছে, শাড়ির আঁচল খুলে সব ফুল রাজপুত্রের গায়ে পড়ে। চমকে

চোখ তুলে রাজপুত্র তাকায়, কে তুমি কন্যে? হাঁটু গেড়ে রাজপুত্রের পাশে রাজকন্যা বসে বলে, আমি? আমি জীবন।

'রাজপুত্র উদাস হয়ে যায়। জীবন কী আমি তা ভুলে গেছি।

'রাজকন্যা রাজপুত্রের হাত ধরে, আমি তোমায় জীবন সঁপে দেব।

'রাজপুত্র রাজকন্যা গিয়ে প্রাসাদে ঢোকে। চারদিকে শাঁখ, শানাই বেজে উঠে।

'ওদিকে খেয়ালি রাজকন্যা সখীদের সঙ্গে ফুলের বাগানে হেসে কুটিকুটি। প্রজাপতির পেছনে ছোটে। সরোবরে সাঁতার কাটে। হাওয়ায় হাত বুলিয়ে বলে, বলো গিয়ে আমি আসছি। শিশিরে হাত ভিজিয়ে বলে, কানে কানে বলো আমি আসছি। গোলাপ ঝাড়ের পাশে সোনার বেদীতে বসে সখীদের ডেকে বলে, আমায় সাজিয়ে দে।

'তারপর শাদা পালকের গলা ফুলিয়ে রাজহংসের ডিঙি নদীতে ভাসে। রাজকন্যা রাজপুত্রের উদ্দেশ্যে ডিঙিতে গিয়ে ওঠে। ডিঙি চলতে থাকবে, এখানেই শেষ।'

রীনা কাঁদো কাঁদো বললে, 'দিদির কী বুদ্ধি অতুদি, বলে এই শেষ!'

মমি হাল্কা হেসে বলল, 'না রে, এর শেষ নেই।' মমির হাসি আমার কেমন কানে বাজল। এ রীনার কান্নার সুর শুনে, না কি আর কিসে। উৎসুক হয়ে ওর দিকে চাইলাম।

মমির মুখ দেখতে পেলাম না। টেবিল থেকে কাগজ তুলে দুহাতে মেলে ধরেছে। মুখ ঢাকা, আমি ঐ কাগজ আড়াল মুখের দিকেই তাকিয়ে রইলাম।

মমি এই গল্প লিখেছে!

'অতুদি টিকিটের পয়সা দাও'

'বাড়ির মেয়ে রাজপুত্তুর। আমাদের আবার পয়সা কী?'

রীনা মাথা নেড়ে বলল, 'ও সব চালাকি চলবে না। পয়সা চাই। ক্লাবের পকেট গড়ের মাঠ। না দিয়ে যাবে কোথায়? বাবার কাছ থেকে কত আদায় করেছি জান? পঁচিশ। তুমি দেবে দশ। সুমন্তদা পনেরো।'

ওর মুখখানা ছোটো হয়ে গেল। 'সুমন্তদা আর আসে না অতুদি।'

সুযোগ পেয়ে গেলাম বললাম, 'বাড়ি গিয়ে ঘেরাও করতে পারিস না? তবেই না মেয়ে!'

রীনা লাফিয়ে উঠল, 'সত্যিই তো! একাই যেতে পারি আমি। আমার সঙ্গে যাবে অতুদি?'

ঝটকায় কাগজ দেখা ছেড়ে মমি রীনাকে ধমকে উঠল, 'কোথাও যেতে হবে না। সারাদিন শুধু টই টই। এক ছত্তর পড়াশোনা নেই। লজ্জাও করে না। যাও, পড়তে বোসো গিয়ে, হতচ্ছাড়া মেয়ে!'

নিমেষে রীনার সব ওলোট পালোট হয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাকে তুমি কিচ্ছু বলবে না। সুমন্তদাকে তুমি আর নিতাই, হ্যাঁ তোমরা দু-জনে মিলে আমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়েছ। তোমরা ছোটোলোক। তোমার কোনো কথা শুনব না। যাবই আমি সুমন্তদার কাছে, ডেকে আনব। দেখি তুমি কী করতে পার। বলতে বলতে রীনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কী থেকে কী হয়ে যায়। মমি চুপ মেরে গেল। ঠোঁটের কাছটা কয়েকবার কেঁপে স্থির হল। নিতাই রীনার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। পা বাড়িয়েছে, মমি হাত দিয়ে ওকে থামিয়ে দিল। বলল, 'খেয়ে দেয়ে তবে যেও নিতাই।'

হাতের পাতায় মুখ ঢেকে রীনা বসে ছিল। ঝট করে উঠে দাঁড়াল। মুখচোখ লাল, রাগে ফেটে পড়ছে। চেঁচিয়ে উঠল, 'না নিতাই খেতে পাবে না।' বলে এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে ওর ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

৯

আসছে শনিবার রীনার থিয়েটার। তার আগেই রীনার থিয়েটারের অজুহাতে সুমন্তর খোঁজ করতে হবে! ছুটির পর ধর্মতলার রাস্তা ধরলাম। ও বাড়িতে ঠিক না ঢুকলেও দোতলায় এই ফ্ল্যাটের নীচে অনেকদিন মমির অপেক্ষায় গাড়িতে পার্কে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়েছি। মমির এক কথা, 'এই এক মিনিট, এক্ষুনি আসছি!' কথা শেষ করার সময় নেই, ছুট ওপরে। আমি গাড়িতে বসে, একা। অনেকদিন সুমন্তর চাকর বসন্তকে নীচে পেয়েছি। বাইরে যাচ্ছে। সুমন্ত মমি

ওপরে, একা, বসন্ত বাইরে, আমি গাড়িতে বসে। আমাকে কি ওরা ভুলে গেছে? কী হয় দুজনে এক হলে, জগৎ ভোলে না ভোলে নিজেদের? অথবা আমরা যারা পথে, পার্কে, আমাদের? ব্যতিরেক কি তবে এর ঘুমের থেকে? আয়না, ছায়া আর স্বপ্ন থেকে? ওরা কি ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুমের তলে ডুবে গেছে ট্রান্সে? বিহ্বল, আবিষ্ট, পরমানন্দিত, মুগ্ধ, মাতাল, দু-জন দু-জনের মুখচেয়ে, ঠোঁটে ঠোঁট, বুক বুক, কিছুই ভাবতে পারে না, না পারে বিচ্ছিন্ন হতে। তারপর একসময় আমি অতিষ্ঠ হয়ে হর্ন বাজাতে ওদের ঘোর কাটে। সুমন্ত মমি আর একসঙ্গে নয়, মমি একা এসে জানালায় ঝুঁকে পড়ে আছে, 'লক্ষ্মীটি আর একটু, এই আসছি।' সেই আসতে আরো জলগড়ায়। এমনি অনেকদিন। প্রথম প্রথম আমি হাঁদার মতো রাস্তায়, রাস্তার ওপাশের দোকান, বাড়ি, বাড়ির ছাদ, দু-ফাঁকে আকাশ, ফুটপাত, লোক, ট্রাম, বাস, ভিড় দেখার চেষ্টা করতাম। তারপর বুদ্ধি খুলল, বই নিয়ে যেতাম।

অনেকদিন এদিকে আসা হয় নি। ওয়েলিংটনের মোড়ে বাস থেকে নেমে একটু পিছিয়ে পার্ক পেরিয়ে সুমন্তর ফ্ল্যাট। মুদির দোকানের পাশে আসতে ট্যা ট্যা করে দাঁড়ে বাধা টিয়াপাখিটা চেঁচিয়ে উঠল। চমকাতে হল। যাব কি? দুটো বাড়ির পরই দোতলায় সুমন্তর ফ্ল্যাট। এতদূর এসে ফিরে যাব? ইতস্তত করছি, এমনি দ্বিধা আমার এখানে, এ বাড়ির নীচে অনেকদিনের বরাত। মমি যখন ওপরে অদৃশ্য, বন্ধ হত সুমন্তর ফ্ল্যাটের জানালা, দরজা, গাড়িতে তখন আমি আর ড্রাইভার। কী ভাবত তখন প্রতাপ, ছোটো গাড়ির গণ্ডিতে, হাতের নাগালে, কি দেখত আমায়! কি দেখতাম আমিই বা নিজেকে, কি আমি বাধ্য হতাম দেখতে প্রতাপের চোখ দিয়ে, যে আমি আমার এ শরীর, যা আমার বিস্ময়, যা আমি প্রায় রোজই দেখি অবাক বিস্ময়ে, নাইতে গিয়ে, কাপড় ছেড়ে, বাথরুমে, কী এক অন্তরঙ্গতায়, সেই নিজেকে এমন নোংরা অশুচি মনে হত আমার, এমন রাগ হত মমির উপর নিজের উপর ঘেন্না, অস্বস্তি প্রতাপের উপর। আমি ওখানে বসে থাকতে পারতাম না, বেরিয়ে পার্কে চলে যেতাম। ওখানে কারো চোখে চোখ পড়লে আমার গা শির শির করত, ওরা ও সব শাড়ির আড়াল, শায়া খুলে দেখছে আমায়, মনে হত। আজও যখন প্রতাপকে দেখি সে সব পারে এমনি আমার ধারণা, মমিকে একান্তে এক ঘরে, অন্য একের সঙ্গে জুটিয়ে দিতে, মুখে তার কোনো বোধ নেই, প্রায়শ্চিত্ত নেই, ওর কাছে আমার বসে থাকতেই হত, এ আমার ছিল লজ্জা, এ বাড়ির নীচে, এখানে, এ আমার

ছিল দ্বিধা। এখন প্রতাপ নেই, এখন আমি একা, এসেই গেছি যখন এখানে আমার আর ইতস্তত করা চলে না।

দুটো বাড়ি ছেড়ে সোজা ওপরে উঠে গেলাম। কড়া নাড়লাম। আধো অন্ধকার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছি। পাখিটা আর একবার ডেকে উঠল, অথবা অন্য কোনো কর্কশ শব্দ। এতক্ষণ তবু খানিকটা ঠিক ছিলাম, এবার সব আস্থা হারিয়ে ফেলছি, মনে হচ্ছে ঠিক করি নি, কথা নেই, বার্তা নেই, দুম্ করে এক ভদ্রলোকের বাড়ি আসা, একি বেহায়াপনা, এখন দরজা খুলে যদি সুমন্ত এসে দাঁড়ায়? যদি জিজ্ঞেস করে কেন এসেছেন? রীনাকে নিয়ে এলেও একটা কথা ছিল। চলে যাব কিনা ভাবছি, বসন্ত এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। আমাকে মনে রাখার মতো চেনাজানা নেই, আমিই কেবল দূর থেকে ওকে দেখেছি। আগে এ বাড়িতে পা দিই নি।

দরজা খুলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভালো করে পরীক্ষা করে লোকটি বলল, 'বাবু তো বাড়ি নেই।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, ঘুরে দাঁড়িয়েছি, বসন্ত ফের বলল, 'বাবু এইবেলা এসে যাবেন। ইচ্ছে করেন তো ভেতরে এসে বসতে পারেন।'

'দরকার নেই, অন্য একদিন দেখা করব।' কিছু একটা বলতে হবে, বললাম।

কয়েক ধাপ নেমেছি, সামনে সুমন্ত, ওপরে উঠছে, ব্যবধান মাত্র কয়েকটা সিঁড়ির, পালাব তারও উপায় নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। ব্রিফকেস্ হাতে টপাটপ সিঁড়ি ভেঙে সুমন্ত সামনে এগিয়ে আসছে।

'আপনি?' অবাক হয়ে সুমন্ত থেমে গেল, তারপরই ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'চলুন উপরে চলুন?'

দুটো সিঁড়ি একসঙ্গে ডিঙিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল, পাখা খুলে চেয়ার টেনে দিল, 'বসুন।'

সামনের চেয়ারে বসে বলল, 'একটু পরে এলেই হয়েছিল। ভাগ্যিস এসে পড়েছি।'

জুতো খুলে একপাশে ঠেলে উঠে দাঁড়াল, 'দাঁড়ান বসন্তকে বলে আসছি চা-টা কিছু হোক।'

ভেতরে গিয়েই ফিরে এল, এসে বলল, 'অনেকদিন পর দেখা তাই না? আমি কিন্তু প্রায়ই আপনার কথা ভাবতাম। পকেট থেকে সিগারেট বের করে বলল, ভাবতাম আপনার সঙ্গে দেখা হলে বেশ হয়।'

বললাম, 'ভেবেছেন, তাহলে আমার হোস্টেলে এলেন না কেন ?' বলেই ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি শুধরে নিলাম, 'মমিদের বাড়ি এলে আমাদের সবার সঙ্গেই দেখা হত, ওখানেও তো যেতে পারতেন ?'

এ কথার কোনো জবাব দিল না, বলল, 'রীনার নাটকের টিকিট কিনব বলেছিলাম। আমি তো আর কোনো খবর রাখি নি। থিয়েটার কি হয়ে গেছে ?'

বললাম, 'না। এই শনিবার ওর থিয়েটার।'

'তাহলে আমার হয়ে একটা কাজ করবেন ? ওকে পনেরোটা টাকা দিয়ে দেবেন ? কথা দিয়েছিলাম।' বলে পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে একটা দশ টাকা ও পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরল।

হাত না বাড়িয়ে বললাম, 'টাকাটা রেখে দিন। টাকা নিয়ে যেতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমার হাত দিয়ে নাইবা দিলেন, তাছাড়া আমার হাত দিয়ে ও আপনার টাকা নেবে কি ? রীনা ছেলেমানুষ, ও নিতে চাইলেও মমি কি ওকে নিতে দেবে ? আপনি তো ওকে চেনেন।'

সুমন্ত উঠে গিয়ে রাস্তার ধারের জানলা খুলে দিল, এ জানলা দিয়ে মমি আর সুমন্ত হয়তো আমায় অনেকদিন দেখত। ওখানটায় খানিক দাঁড়িয়ে, ফিরে এসে, চেয়ার আরো কাছে টেনে বলল, 'মমি কেমন আছে ?'

বললাম, 'আমি ওখানেই যাচ্ছি, চলুন না দেখে আসবেন ?'

আবার উঠল, উঠে গিয়ে ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে দিল, ফিরে এসে বলল, 'আজ নয়, আর একদিন যাব।' হঠাৎ বলল, 'ধন্যবাদ।'

আমি হাসলাম, 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। বাস থেকে আপনার বারান্দা দেখে নেমে পড়লাম,' জানিয়ে বললাম।

সুমন্ত খুশি হয়ে বলল, 'খুব ভালো করেছেন। আপনার বারান্দা কোথায় জানা থাকলে আমিও দেখতেন একদিন গিয়ে হাজির হতাম।'

ভালো লাগল, সুমন্তও তবে বানিয়ে বলছে। আমার ঘরে একদিন গিয়েছিল, ভুলে যায় নি নিশ্চয়। দুজনেই আমরা জানি দুজনেই আমরা বানিয়ে বলছি। এমনি করেই বানাতে হয়। ভালো লাগল, খুশিতে বললাম, 'তাহলে ঠিক আছে, বলুন কবে মমিদের বাড়ি যাবেন ? আমিও যাব, তারপর ফেরার পথে আমার ডেরা দেখিয়ে দেব, রাজি ?'

হাসিমুখে সুমন্ত বলল, 'রাজি।'

খানিক পরেই অন্ধকার হবে, আবার উঠল, এবার বাতি জ্বালাতে। বিদ্যুতে

প্রথমেই এই ঘরে খুব বেমানান একটি জিনিসের উপর চোখ পড়ে। এই রকমারি চেয়ার, চায়ের দাগধরা টেবিল অ্যাশট্রে ম্যাগাজিনের মাঝে খাপছাড়া একটি চমৎকার বুক-শেল্‌ফ, লম্বা সুন্দর বার্নিশ করা, ওদিককার প্রায় সমস্ত দেয়াল জুড়ে উঁচু-নীচু তাকে ভর্তি বুক-শেল্‌ফটায় নিখুঁতভাবে সাজানো বই। ওপরে একটি শ্বেতপাথরের তাজমহল, ফুলদানি, স্ট্যাণ্ডে সুমন্তর ছবি, উঠে বুক-শেল্‌ফের পাশে, নিচু হয়ে বই দেখতে দেখতে বললাম, 'আপনারও বইয়ের বাতিক রয়েছে দেখছি। অনেক বই জমিয়েছেন।'

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, একটা বই টেনে ধুলো ঝেড়ে আমার হাতে তুলে দিল।

হাতে নিয়ে হেসে ফেললাম, 'এ আপনি কোথায় পেলেন?'

সুমন্ত প্রথম পাতাটা খুলে দিল। ওপরে মমির হাতে লেখা 'তোমাকে দিলাম, মমি।'

লেখাটার দিকে তাকিয়ে মমিকে আবার দেখলাম। কলেজ থেকে ছুটে আসত, ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে মুখ চোখ লাল। হাতে হ্যাঁচ্‌কা টান দিয়ে বলত, 'চল না দেখে আসি বইয়ের কদ্দূর হল।' কফি হাউসের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একদিন বললাম, 'রোজ রোজ এমন করলে প্রেসের লোকেরাই বা কী ভাববে? কী একটা বই লিখেই এত হ্যাংলাপনা।'

মমি ক্ষেপে উঠল, 'কী একটা বই? বললেই হল, লিখে দেখুক দিকি এক অক্ষরও বেরোয় কিনা! চল আর বাহাদুরি করতে হবে না। তুইও দেখছি তোষামুদি চাইছিস। ভণ্ড কোথাকার!'

বই বন্ধ করে হেসে বললাম, 'বন্ধুর প্রপাগাণ্ডা করতে চেয়েছিল কিন্তু মনে হচ্ছে না বিশেষ কাজ হয়েছে। যেভাবে ঝেড়ে মুছে হাতে তুলতে হল।'

সুমন্ত হো হো করে হেসে উঠল, 'যা বলেছেন, মেশিন নিয়ে কাজ করি, কুলি মজুর মানুষ. বইয়ের মর্ম আমি কী বুঝি? এই সবই মমির, মমিই বুক-শেল্‌ফ কিনে বই এনে সাজিয়েছিল, তারপর তো ধুলো আর বালি, কে আর হাত দেয়।'

বইগুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। খাড়া নাক, ভারি চিবুকই প্রথম চোখে পড়ে। তারপর উন্নত, তেজী ঘাড়, বুঝি ঔদ্ধত্যের চেয়ে নীচু, অহংকারের চেয়ে কম। এ সূক্ষ্ম হিসেবে ভুল হলেই, সুমন্তর নিশ্চয় পতন। যেন এই ঘাড়ই ওর যুগপৎ আশ্রয় ও বিপদ।

চোখাচোখি হতেই প্রশ্ন করল, 'এই কি আপনার প্রথম বই?'

'প্রথম এবং শেষ দুই-ই।'

যেন সুমন্ত দুঃখিত হল না, 'কিন্তু শুনেছি, একবার যে লেখায় ডোবে, সে াকি একেবারে তলায়? উঠে আসতে কখনও পারে না আর?'

বুঝি আমার কোথায়ও লজ্জা। নিজের লেখার কথা উঠলেই এমনি হয় আমার। াপতে গিয়ে ছলকিয়ে উঠলাম, 'মানে, এ আত্মবিসর্জন? যেমন প্রেম? নিজের ঃস্তিত্ব সম্পূর্ণ মুছে ফেলা? অক্ষরে আর অপরের অনুভূতিতে, অপরের বুকের াগা দেওয়া? এবার ফিরে আসার পর প্রথম যেদিন মমির সঙ্গে দেখা, মমিও মনি কিছু বলছিল আমায়।'

সুমন্ত অবাক হল। 'মানে? মমি আপনাকে বলছিল এসব? মমিও সাহিত্যে ঃতেছে নাকি?'

এবার অবাক হওয়ার পালা আমার। বললাম, 'কেন? ও যে লিখছে আপনি ানেন না?'

'না বললে জানব কী করে?' তারপর জোর করে হাসতে হাসতে বলল, ়খতে পাচ্ছি আমার ওপর সব আস্থা গেছে মমির। তার সব বিশ্বাস হারিয়েছে।'

ঝট করে বলে ফেললাম, 'বিশ্বাস হারাবার পথ একটাই—হারাতে দেয়া।'

শ্বেতপাথরের তাজমহলের পাশে হাত রেখে সুমন্ত ফিরে দাঁড়াল, 'সেদিনের গড়ার কথা আপনি ভোলেন নি দেখছি। সেকথা কি আর না তুললেই নয়?'

তেমনি তেজী, এবার আমাকে আঘাত করতে চাইছে। আমাকেও তবে মন্তর আঘাত করার দরকার আছে, ভাবতে আমার সমস্ত শরীর তখন কাঁপছিল। ইটা জায়গায় রাখতে যাব, হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গেল। সুমন্তই কুড়িয়ে ক-শেল্ফের ওপর রেখে দিল।

যেন কিছু হয় নি, এতক্ষণ কোনো কথাই আমরা বলি নি, এমনি করে চেয়ারে ফরে এসে বলল, 'আপনার কথা বলুন। কবে ফিরলেন?'

'পুজোর ঠিক পরে।'

'শীতের মুখেই চলে এলেন?' যেন হতাশ হল।

ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল, বললাম, 'এক শীতই যথেষ্ট, আবার শীত?'

'কেন শীত আপনার ভালো লাগে না?'

'মোটেই নয়। একমাত্র লেপের তলায় লেপ্টে ছাড়া।'

সুমন্ত হেসে উঠল, 'আমারও তাই। এখন থেকে লেপের তলায় ঢুকলেই কিন্তু াপনার কথা মনে পড়বে।'

আমি নিশ্চয়ই লজ্জায় কিছু হয়ে উঠেছিলাম। এদিক ওদিক তাকিয়ে,

তাড়াতাড়ি ঢাকতে চাইলাম, 'কোথায়? আপনার বসন্তর যে কোনো পাত্তা নেই? অতিথ দেখেই কি চম্পট?'

'আশ্চর্য কি? বোধ হয় ভাঁড়ার ফাঁকা, দাঁড়ান দেখে আসছি।'

সুমন্ত ভেতরে চলে গেল। একটু পরেই বসন্ত প্লেটে প্লেটে লুচি বেগুনভাজা মাছভাজা তরকারি এনে মাঝের টেবিলে সাজাল।

রান্নাঘর থেকেই সুমন্তর খাওয়া শুরু হয়ে গেছে। চেঁচাল, 'বসে যান। নয়তো সব লোপাট হয়ে যাবে।'

আমি আঁতকে উঠলাম, 'এ যে রীতিমতো ভোজ।'

সুমন্ত টিপ্পনী কাটল, 'বসন্তর হিসেবে এ কিন্তু ডালভাত। কী বল বসন্ত?'

বসন্ত লুচি দিচ্ছিল, আপশোস করল, 'এ আর কি ছাই। মাছ নেই, তরকারি নেই, খবর পেলে সকালে মাংস এনে শুকনো করে কষে রান্না করে রাখতাম।'

'শুনলেন তো, খবর পেলে কী হত?'

'ভাগ্যিস আমাদের হোস্টেলের খাওয়া বসন্ত চোখে দেখে নি। দেখলে ওর হয়ে যেত।' বসন্তর জন্য হাসলাম।

বসন্ত দেখছি বাক্যিবাগীশ। আমার কথার পাল্টা দিল, 'ওসব আমার জানা আছে, দিদি। আমার এক শালা হোটেলে কাজ করে। ব্যাটা ফ্যান দিয়ে ডাল বানায়, তবেই বোঝেন।'

বসন্ত ওর শালার কীর্তি ফলাও করে বলতে লাগল।

বেশ রাত হয়েছে, এবার যেতে হয়। সুমন্ত কব্জিতে চোখ বুলাল, 'যাবেন? চলুন আমিও যাচ্ছি। বসন্ত চটিটা দাও তো?'

দাঁড়িয়ে আছি, বসন্ত তছনছ করে চটি খুঁজছে। কোথায় চটি? নিমেষে হুলুস্থুল। সুমন্ত রেগে টং, তারপর বাথরুমে চটি আবিষ্কার।

রাস্তায় নেমে সুমন্ত আমাকে বলল, 'আমিই বাথরুমে ফেলে এসেছিলাম। জুতোয় মোজায় চটিতে পায়ে এমনি আমার ভুল হয়।' বলে হাসছিল।

হাঁটতে হাঁটতে বিকেলের কথা ভাবছিলাম। ভাবনা হয়েছিল দেখা হলে কী বলে দাঁড়াব? অথচ কিছুই ভাবতে হল না, তিন চার ঘণ্টা যে কোথা দিয়ে, কী করে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। বাসের অপেক্ষা করছিলাম। দু-তিনটা তবু ছেড়ে দিলাম। অজুহাতে দুজনেরই সম্মতি সমান, বেজায় ভিড়।

সুমন্ত বলল, 'কাল যাবেন?'

চমকে উঠলাম, 'কোথায়?'

'মমিদের ওখানে। রীনার থিয়েটার না এ শনিবার?'

ভুলেই গিয়েছিলাম। সামলে নিলাম, 'ঠিক মনে করিয়েছেন। এক কাজ করলে কেমন হয়? হেদো হয়েই তো যাব। ছুটির পর ওখানে আসুন না কাল। আমি অপেক্ষা করব। তারপর দুজনে একসঙ্গে যাব, কী বলেন?'

'আমার কিন্তু আসতে পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটা বেজে যাবে। আপনার ছুটি কখন?' সুমন্ত শুনে শুধোল।

'আমি পাঁচটা থেকেই হেদোয় অপেক্ষা করছি।' কেন জানি অন্তরঙ্গতা অনুভব করছিলাম।

বাসে উঠতে সুমন্ত হাত তুলে আবার জানান দিল, 'কাল ঠিক পাঁচটায় হেদোয় থাকবেন।'

১০

পাঁচটারও বেশ বাকি থাকতেই আমি হেদোয় পৌঁছেছি, এখন পাঁচটা পঁচিশ। সেই থেকে বসে আছি। আধ ঘণ্টার উপর হয়ে গেল। সময়ের কথায় মমি বলত, রীনার পাড়া-বেড়ানো, গেটের মাধবীলতায় ছিটেফোঁটা রোদ, বিকেলে মার উল বোনা, তিনের সমন্বয় হলে তাকিয়ে থাকতাম কখন একটানে গেট খুলে, এক-এক লাফে দুটো সিঁড়ি ডিঙিয়ে সুমন্ত বারান্দায় উঠে আসবে। ঐ অপেক্ষায় সারাদিন যে কী করে কেটে যায় অদিতি তা বুঝতেই পারি না।'

আবার কোনো শনিবার রানাঘাট যাওয়া না হলে পরের শনিবার মা অনুযোগ করেন, 'তোর আশায় বসে থাকা যে কতখানি যন্ত্রণা, তা তুই বুঝবি না অতু।'

দুই-ই আমার বোঝার কথা নয়। মা মমি কাউকেই নয়। বরং এখন এই বেঞ্চিতে বসে রাস্তায় তাকিয়ে আমি এক আবিষ্কারের আনন্দে আশ্চর্য হতে পারছি। ব্যস্ত রেখাঙ্কিত ভিড়ের একাকিত্ব। সম্পূর্ণ পুরোপুরি একটা ভিড় হন্যে হয়ে ট্রামবাসের আশায় ছুটছে, একই দিকে একই লক্ষ্যে। কারো অন্য কারো দিকে নজর নেই, তবু ভাবতে কেমন অবাক লাগে অন্যদিন আমিও ওদের

একজন। তখন আমায় কেমন দেখায় ? মমির মতো অপেক্ষার আনন্দে নয়, মার মতো অপেক্ষার অসহ্যে নয়, নিঃসঙ্গতায় নির্জন হতে পারার চিন্তায় আমি সুমন্তর আসার অপেক্ষা ভুলে গেলাম।

সে এসে দাঁড়াল।

চেয়ে হাসলাম।

'বেরুতেই যত ঝামেলা', সুমন্তর কথায় আক্ষেপ একটার পর একটা, এমন হাজার কাজের ফিরিস্তি। আমি শুনছিলাম না। পাশাপাশি হাঁটছি।

আমরা গেটে ঢুকতে মালি সুমন্তকে দেখে একমুখ হেসে এগিয়ে এল, 'অনেকদিন আসেন নি দাদাবাবু।'

সুমন্ত দাঁড়িয়ে বলল, 'কী করছ ?' মালির সঙ্গে সুমন্ত বাগানে চলে গেল, 'দেখি কিসের চারা এবার লাগালে ?'

বসার ঘরে দেখি নিতাই বসে। মমির ঘরের দরজা বন্ধ। খানিক পর, বেরিয়ে হুইল চেয়ার ঘুরিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে মমি বলল, 'এত দেরি হল যে অদিতি ?'

বাইরে তখন রীনার গলা, 'দিদি! দিদি!' চেঁচাতে চেঁচাতে রীনা এসে ঘরে ঢুকল। 'দিদি দেখ কে এসেছে!'

রীনার কাঁধে হাত রেখে সুমন্ত আর সুমন্তদার কোমর জড়িয়ে রীনা, দুজনে হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়াল।

দরজা পেছন করে আমার মুখোমুখি মমি বসে ছিল। ঝটকায় হুইল চেয়ার ঘোরাতে চেয়ার শুদ্ধু হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর কি। নিতাই ক্রাচ নিয়ে হাতড়াচ্ছে। আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, রীনা চেঁচিয়ে উঠল, সুমন্ত ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল।

খানিকক্ষণ সুমন্তকে জড়িয়ে মমি তেমনি বসে রইল। জোরে নিশ্বাস টেনে এক সময় কাঁপা ঠোঁট ভিজে চোখ তুলে সুমন্তর মুখে তাকাল।

সোজা পা মাটি ছুঁয়ে আছে। সুমন্ত ওর পা উঠিয়ে পাদানিতে বসিয়ে বলল, 'পা বেশ শক্ত। এক্সারসাইজ করছ না বুঝি ? স্পাজ্‌ম অনেক বেড়ে গেছে দেখছি।'

এক হাতে ওর হাত, অন্য হাতে হুইল চেয়ারে চাপ দিয়ে মমি সোজা হয়ে বসে রইল। তারপর একসময় বলল, 'এতদিন এখানেই ছিলে ?'

রীনা আমার পাশে বসে ছিল, বলল, 'এখানেই ছিলে সুমন্তদা ? কাল তোমার

ওখানে যাব বলে সারা বিকেল অতুদির আশায় বসেছিলাম। কাল অতুদি এল না। কিন্তু দেখলে তো তোমার আশায় ছিলাম, আর তুমি ঠিক এসে গেলে।'

মমি ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। আমার দিকে ফিরে বললে, 'তুই এলি না অদিতি, আর রীনা শুধু ঘরবার করেছে। আমি কি জানি কেন? আমায় তো তোরা কিছুই বলিস না।'

কান আমার ঝাঁ ঝাঁ করছিল। কী যে বলব রীনাকে মমিকে, তা ভেবে পাচ্ছিলাম না।

সুমন্ত টের পেয়েছে। আড়চোখে আমায় দেখে নিল। তারপর কথার মোড় ফেরাতে রীনাকে নিয়ে পড়ল, 'আমার ওপর এত দয়া কেন বিনি দেবী?'

রীনা হাত বাড়িয়ে দিল, 'টাকা দাও।'

'ওহো, তাই এত মায়া।' সুমন্ত ওর বেণী টেনে দিল।

বারান্দায় গাড়ি থামার আওয়াজ হতেই রীনা লাফিয়ে উঠল, 'এই রে বাবা আসছেন। আমি পড়তে চললাম। তুমি কিন্তু পালাবে না সুমন্তদা। টিকিটের টাকা দিয়ে যাবে।'

এতক্ষণে পায়ে মাটি পেলাম, হেসে বললাম, 'আচ্ছা মাড়োয়ারি হয়েছিস রীনা।'

রীনা চৌকাঠ থেকে পাল্টা ছুড়ল, 'তোমাদের কি, ক্লাব ডুবলে তোমাদের তো পোয়া বারো!'

প্রতাপ চাবি নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। সাইডবোর্ডে চাবি রেখে বলল, 'দিদি বাবু একটু হেঁটে আসছেন।' সুমন্তকে দেখে এগিয়ে এল, 'দাদাবাবু যে, কখন এলেন? কতদিন যে আসেন নি।'

অনেকদিন পর আসা সুমন্তর। একে একে সবাই এসে দেখা করে গেল মায় ঠাকুর রমেশ। সুমতিও অকারণে বার দুয়েক ঘুরে গেল, সেদিন ওরা সবাই আড়াল থেকে শুনছিল। ঝড় বয়ে গেছে জানত, এতদিন পর সুমন্তকে আসতে দেখে চাপা চাঞ্চল্য, খুশি কি কৌতূহল, যাই বা হোক, সবাই আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। ত্বরায় সুমতি ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম, রমেশের হাতে একগাদা খাবার এনে টেবিলে রাখল। বুঝি কৃতজ্ঞতার দাম, আমাকে বলল, 'আপনি চা করে দিন।'

প্রসঙ্গটা আমিই তুললাম। বললাম, 'চলুন না, সবাই মিলে একদিন চড়ুই-ভাতি করে আসি।'

মমিও যোগ দিল; 'হ্যাঁ তাই ভাবছি সবাই মিলে একদিন কলকাতার বাইরে বেড়িয়ে আসি। সকালে গিয়ে বিকেলে ফিরব। যাবে সুমন্ত?'

আমি জানতাম, সুমন্ত এক কথায় রাজি, 'যাব না মানে ? কোথায় যাবে ঠিক করেছ ?'

'বাবাকে বলেছি। রিষড়াতে বাবার এক বন্ধুর বাড়ি আছে। বাবা ওঁকে বলবেন।'

সুমন্তকে চা দিয়ে মমিকে বললাম, 'মমি সুমতিকে বলব দুধ দিতে ?'

'না। আজ দুধ না। চা আছে অদিতি ? আজ আমি চা খাব।'

লুকোতে পারছে না, মমির যে আজ বিশেষ দিন, চোখে মুখে ইচ্ছায় এই ভাব এত উজ্জ্বল। আমি যদি জানি সুমন্ত এসেছে বলেই আজ এমন, কারণ এর এত সহজ, স্বাভাবিক আর স্পষ্ট, কেন আমি তবে নিতাই, যাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না, তার কথা হঠাৎ এমন করে তুলতে যাই ? এ আমার খেলা ? না, কেউ না জানুক, আমি জানি, এ আমার কী এক গোপন জ্বালা। অনেকক্ষণ হবে, সুমন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে নিতাইকে আমি উঠে যেতে দেখেছিলাম। মনে মনে আমিও ওকে উঠে যেতে দিয়েছিলাম। হোক না আজ সুমন্তর একার দিন। এমনি ছিল আমার মনোভাব। কেন আমি এখন তবে আবার নিতাইকে এ ঘরে নিয়ে আসি, তাকে টুলে বসাই। যেন মমি আর সুমন্তর মাঝখানে, হোক না তার যে টুল আছে ঘরে, সে টুল ঘরের এক কোনায় ? কেন আমি এমন করি, সুমন্তকে আর মমিকে দেখি আবার অনেক নিকটে, আবার কাছাকাছি, আর বলি, 'বা রে নিতাইকে তো চা দেয়া হল না। নিতাই কোথায় মমি ?'

মমি ডাকল, 'সুমতি।'

কাছাকাছি কোথাও ছিল, যেমন আজ থাকছেই। মুহূর্তে ভিতরে এসে দাঁড়াল।

'নিতাই কোথায় সুমতি ?'

এই প্রথম সুমতিকে দেখলাম খোলাখুলি বিরক্ত। মমিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে আমার দিকে দৃষ্টি, বুঝিবা সমর্থন চাইছে। বলল, 'নিতাই কোথায় থাকে, নিতাই কী করে, সে সব আমার জানার কথা নয়, নিতাইয়ের গোলামি করতে আমি এ বাড়িতে থাকি না খুকু !' বলেই বিদ্রোহে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

বজ্রাঘাত বলে একেই। অপ্রত্যাশিত আঘাতে মমি যেন একেবারে জমে গেল। উত্তেজনায় যেমন ওর পা ছিটকে ওঠে, বোধহয় বুঝি তলিয়ে যাচ্ছে, হাতলে আঙুল আঁকড়ে থাকে, এখন কিছুই না। একটা পেশীতেও যেন ওর প্রাণ নেই, একবিন্দু নড়ছে না। সুমন্তর দিকে তাকালাম, চায়ের ধোঁয়ার উপর চোখ বোজা,

কী ভাবছে। তারপর যেখানে ক্ষত, সেখানেই খোঁচানোর মতো জিজ্ঞেস করল মমিকে, 'নিতাইয়ের কাজ হয়েছে মমি?'

চায়ের কাপটা একবার তুলে, আবার নামিয়ে রেখে মমি চুপ করে আছে।

সবটাই কেমন বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছিল আমার। আমার সহ্য হচ্ছিল না, মমি বারবার আমাদের এমন এড়িয়ে চলবে। নিশ্চয়ই মমতায় নয়, তবু বললাম, 'কিছু বলছিস না যে মমি? হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে দেবে বলছিলি না? কোনো ব্যবস্থা হল নিতাইয়ের?'

মুখ না তুলেই মমি এবার উত্তর দিল, 'না হয় নি।'

এর জন্যই বুঝি সুমন্ত অপেক্ষা করছিল। বলল, 'ওকে আমার কারখানায় পাঠিয়ে দিও। সঙ্গে আমার কার্ড দিও, আমি দারোয়ানকে বলে রাখব।'

মমির মুখ এখন কেমন বদলাচ্ছে। শক্ত, জেদী, একগুঁয়ে। চেয়ারটায় যতটা পারে সোজা হয়ে বলল, 'অসুবিধা করে তোমায় কিছু করতে হবে না সুমন্ত। বাবাকে বলব, না হয় অন্য জায়গায় চেষ্টা করব।'

আঙুলগুলো খুলল আবার বন্ধ করল, চোয়াল জমাট পাথর, ঘাড়ের রগগুলো টানা, সুমন্ত ধীরে উঠে দাঁড়াল। যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। তারপর আমার মুখের ওপর থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'চা আছে?'

মমিকে চা দিয়ে আর অবশিষ্ট ছিল না। আমার তখন কা যে বুক কাঁপছিল, গলা কাঁপছিল, বললাম, 'দাঁড়ান, রমেশকে বলছি।' বলার আগেই কিন্তু সুমন্ত ভেতরে চলে গেছে।

আমি আর মমি, খালি ঘর। ইতস্তত করে বললাম, 'কেন এমন করে বললি?'

দেখছি মমি অপ্রস্তুত। তাও জেদ করে বলল, 'বলব না কেন? তাতে কী হয়েছে?'

ওর গোয়ার্তুমি দেখে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। বললাম, 'নিজে থেকে বলল নিতাইয়ের কাজের কথা আর তার জবাব দিলি এমনি করে? ভালো মানুষ পেয়ে খুব খেলছিস।'

পরে আরও দেখেছি যেমন এই প্রথম দেখলাম, মমির চোখে নতুন এক ঝিলিক, 'ওহ্, খুব দরদ যে!' মমি বলল চিবিয়ে। তারপরই তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল। 'রাগ হলে কী আর করা যাবে। তাই বলে নিতাইকে নিয়ে ওকে আর বিরক্ত করতে চাই না।'

ওর কথার জবাব দিলাম না। যথেষ্ট হয়েছে, এবার এ প্রসঙ্গ চাপা দেওয়া

চলে। সুমন্তও বেশ সামলে নিয়েছে। ফিরে এল অন্য রূপ নিয়ে। অনাবশ্যক উচ্ছল আর লক্ষ্য আমি, 'আপনার ভাগ্যই আলাদা অদিতি দেবী। ফাউ পেয়ে গেলেন। আর এক কাপ আসছে।' ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ল, 'আজ সারাদিন এক মিনিট বসতে পারি নি। যা ঝামেলা অফিসে।'

হালকা হাওয়া ছড়ালাম, 'আমাদের, মানে স্কুলের কাজ কিন্তু বেশ আয়েশের।'

ভাবটা যেন চ্যালেঞ্জ করছে: 'বাতলান, কী করে? আমাদের গুরুমশায়রা কিন্তু আমাদের ভাবতেন গুরুতর। কখন যে কী করি!'

তাচ্ছিল্যে প্রায় ঠোঁট উলটে বললাম, 'আমাদের মেয়েরা ও রকম নয়। ওরা দিদিমণি বলতে অজ্ঞান।'

'তাই বুঝি? টিচার হিসেবে আপনি অদ্বিতীয়া তাই না?' উচ্চারণ করল যেন সুখটানে,—'অদিতি আহ'।

গম্ভীর হয়ে বললাম, 'সবাই তো তাই বলে।'

সুমন্ত থুতনিতে হাত রেখে ঠোঁট চেপে সামনে ঝুঁকে আমাকে দেখছে। হঠাৎ হাত নামিয়ে সোজা হয়ে বলল, 'মেয়েরা আপনাকে সমীহ করে মানি কিন্তু, এমনিতে, মানে সহজভাবে ভালোবাসে বলে মনে হয় না।'

'ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সঙ্গে আপনার কি সাইকোলজিও ছিল?' আমি খুশি চাপতে পারছিলাম না।

মমি তখন ভেতরের দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়েছে, চলে যাচ্ছে। আমি সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ওকে থামাতে চেষ্টা করলাম। 'কোথায় যাচ্ছিস মমি?'

মমি তাকাল না, থামল না, বলল, 'তোরা কথা বল।'

ওর, চেয়ারের হ্যাণ্ডেল চেপে ধরলাম, 'কেন যাচ্ছিস?'

মমি মুখ ফেরাল, বিরক্ত ভুরু কুঁচকাল, বলবে বলেই বলল, 'আমাকে নিয়ে খেলছিস?'

আমি ওর চেয়ার ছেড়ে দিলাম, পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত একা একা আমরা আমি আর সুমন্ত, ভালো করে কথা বলতে পারছিলাম না।

মেসোমশায় যখন এলেন, হেঁটে এসেছেন, তাই ক্লান্ত। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে, ভারি খুশি সুমন্তকে দেখে। অনবরত বলে চলেছেন, 'কখন এলে? এতদিন আসো নি কেন? এখানে ছিলে না নাকি? তুমি এতদিন আসো নি অথচ কোনো খবরও দিলে না, মমিও কিছু বলতে পারল না, মনে মনে বড়ো ভাবনা হচ্ছিল। টুরে গিয়েছিলে নাকি?'

...সুমন্ত উঠে গিয়ে মেসোমশায়ের পাশে গিয়ে বসল। যথাযথ যতটুকু সম্ভব মামুলি উত্তর দিচ্ছিল। তারপর চমকে উঠলাম, হঠাৎ শুনছি বলছে,'...তাছাড়া এখান থেকে আমার বদলির কথা হচ্ছে। তাতেও বেশ ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে।'

মেসোমশায় আসতে মমি ফিরে এসেছিল, সুমন্তর কথায় বিচলিত মুখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল, পা চেয়ারের বাইরে, টেনে পাদানিতে রাখার কোনো চেষ্টাই করছে না।

যদি পাছে ধরা পড়ে যাই তাই আমি উঠে, চেয়ার সরিয়ে খালি কাপ প্লেটগুলো ট্রেতে সাজিয়ে রাখলাম। রমেশ এসে নিয়ে যাবে।

মেসোমশায় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, ঘুরে বসলেন, 'কী বললে সুমন্ত? বদলির কথা হচ্ছে? এখানেই তো তোমাদের মেন ফ্যাক্টরি, হেড অফিস। এখান থেকে কেন বদলি হচ্ছে? কোথায় যাবে?'

আমি মনে মনে শাপান্ত করলাম, মিথ্যুক! সুমন্তর গলা কিন্তু বড়ো সহজ স্থির।

'কানপুর। ওখানে নতুন ফ্যাক্টরি হচ্ছে। আমাকে যেতে বলছে, ভাবছি চলে যাব।'

'না, না, ওসব ভেবো না।' মেসোমশায় উঠে দাঁড়ালেন, 'মেন ফ্যাক্টরি ছেড়ে কোথাও যেও না। অদিতি আমাকে এক কাপ চা দাও তো।'

মমি খামোখা ধমকে উঠল, 'তুমি কেন ওকে পিড়াপিড়ি করছ বাবা। ওর যা ইচ্ছে তাই করবে।' তারপর রাশ টেনে চাইল সহজ করতে। 'সুমতি তোমার জন্য শরবত আনছে। তুমি হাত মুখ ধুয়ে এসো বাবা।'

মেসোমশায় মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেলেন। মমি বসে বসে টেবিলক্লথের ফুলের সুতো খুঁটছে। মেসোমশায় যখন শোনার বাইরে, মুখ তুলে বলল, 'তুমি কোথাও যেতে পারবে না সুমন্ত।'

সুমন্ত উঠে গিয়ে অ্যাশট্রে নিয়ে এসে সিগারেট ধরাল। আমি ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিলাম। বুঝছিলাম গায়ের জোরে এড়াচ্ছে। সত্যিই মনে হল চিন্তিত। খুব ধীরে বললে, 'অনেক ভেবেই চলে যাওয়া ভালো ভাবছি।'

'কাপুরুষের মতো পালাবে?' মমি ঝট করে আঘাত করল।

আমিও ঠিক ভাবছিলাম, কাপুরুষ।

সুমন্ত আজ ঝগড়ায় নামল না। পুরো সিগারেটটাই এ্যাশট্রেতে ঘষে নিবিয়ে দিল, বলল, 'পালাব না বলেই যাচ্ছি। এখান থেকে চলে না গেলে কী হবে বুঝতে পারো না? তোমার আমার কথা নয়। আমি না এলে তোমার বাবা কষ্ট

পাবেন। সবার মনে প্রশ্ন জাগবে। তার চেয়ে এখানে নেই, কোনো প্রশ্নও নেই।'

চেয়ার ঠেলে মমি খুব কাছে গড়িয়ে এল। বুঝি এ পর্যন্তই ওর কানে কানে কথা, 'কিন্তু তুমি আসবে নাই বা কেন? সবাই আসছে না? সুপ্রিয়া, অদিতি, নিতাই···'

'যথেষ্ট মমি, আর বলতে হবে না!' সুমন্ত ইতি টানল।

দু-একবার কী বলতে চেষ্টা করে মমিও তারপর চুপ করে গেল।

হাতমুখ ধুয়ে পোশাক বদলে মেসোমশায় এসে ঘরে ঢুকলেন। সুমতি টেবিলে শরবত রেখে গেছে। গ্লাসে চুমুক দিয়ে মেসোমশায় বললেন, 'তোমরা সব চুপ করে আছো যে?'

আমি ডাকলাম, 'মেসোমশায়, মমিকে নিয়ে ভাবছি সবাই মিলে একদিন পিকনিকে যাব।'

মেসোমশায় তৎপর হয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ মমিও আমায় বলছিল, আমি হরেনকে আজ বলেছি ওর রিসড়ার বাড়িটার কথা। যখন ইচ্ছে যেতে পার। কবে যাবে? এই রোববার যাও?'

'শনিবার-রোববার রীনার থিয়েটার। পরের রোববার যাই?'

মেসোমশায় এদিক ওদিক দেখে বললেন, 'রীনা কোথায় মমি? এখনও ফেরে নি বুঝি? কী যে মুশকিল হয়েছে মেয়েটাকে নিয়ে। আর কেইবা ওকে দেখা-শোনা করে!' মমির দিকে তাকালেন তারপর সুমন্তর দিকে, কী বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। যেন অন্য কথা পাড়লেন, 'আর কেইবা কাকে দেখাশোনা করে!'

মমির মুখ লাল হয়ে উঠেছে। আমরা কেউ কিছু বলছি না। মেসোমশায়কেই আবার এক সময় শুরু করতে হল, 'সুমন্ত, কানপুরে গেলে কি তোমার সুবিধে হবে?'

সুমন্ত কী যেন হ্যাঁ না করছে। মেসোমশায় ঝুঁকে সুমন্তর কাঁধে হাত রাখলেন, 'বলছিলাম কি তুমি চলে গেলে মেয়েটা একলা পড়ে যায়, ওর কী আর আছে। তবু তুমি এখানে থাকলে বিকেলে আসতে, অদিতি আসত, ওর সময়টা কাটত। আর ··।' মেসোমশায় উঠে হাঁটতে লাগলেন।

দেখছিলাম, একটু টেনে টেনে হাঁটছেন। একটা পা যেন খানিকটা ছোটো। হয়তো দু-পা কখনও সমান হয় না। কদিন আগে মমি বলেছিল ওর একটা ক্রাচ ভেঙে গিয়েছে।

টুকিটাকি কাজ সারছি, অরুণা এসে ঘরে ঢুকল। টেলিফোন এক্সচেঞ্জে কাজ করে। রাত্তিরের ডিউটি না হলে মাঝে মাঝে অরুণা এসে সন্ধেতে আমার ঘরে বসে। এমনিতে থাকে পাশের ঘরে। অরুণার ঘর ভিতরের দিকে। সেদিক দিয়ে আমার ঘর আদর্শ। রাস্তার ওপরে জানালা, জানালা বেশ নীচু, জানালার পাশে আবার তুটো চেয়ার। সকাল সকাল বাড়ি ফিরলেও এখানে আসি, গল্প করি। কোনো কোনোদিন তুজনে সিনেমা যাই। আজ এসে বেশ গুছিয়ে পা গুটিয়ে বসল। অর্থাৎ, গল্প জুগিয়ে এনেছে।

বলল, 'কাল রাত্তিরে ভারি মজা হয়েছে অদিতি।'

ড্রয়ার থেকে চিঠির প্যাড কলম বের করছিলাম। বললাম, 'মজা তো এন্তার এদিক ওদিক পড়ে আছে। খুঁজে পেতে নিলেই হল,' বলেই মনে মনে নিজেকে মিলিয়ে নিলাম। হাসব, না হাসব না, ঠিক ঠাওর এল না।

অরুণা বলল, 'খুঁজে পেতে নিতে হল না, এ একেবারে হাতে তুলে ধরে দিল, তবে শোনো ব্যাপার। কাল আমার রাত্তিরের ডিউটি ছিল। না বললেও চলে বসে বসে ঢুলছিলাম। টেলিফোন বাজল। অভ্যাসে রিসিভার কানে দিতেই ওদিক থেকে ভারি গলায় শুধু তুটি কথা, খুনী, অজিত খুনী। পরপর কয়েকবার একই কথা অজিত খুনী। তুপুর রাত ঝিমানো ঘর ; ঐ একই কথা খুনী, খুনী, শুনতে শুনতে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। দিশেহারা হয়ে কী যে করব, পড়িমড়ি করে উঠেছি, অলকা এসে ঢুকল। বেঁটে ছাতা হাতের ম্যাগাজিন টেবিলে রেখে বলল, বুঝলি অরুণা, অজিতই খুনী।

'আমি হাঁ করে রইলাম। অলকা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, কী হল তোর ?

'কে অজিত ?

'বারে ! তোকে বলছিলাম না সেদিন ? আজ বেরিয়েছে সেই ডাক বাংলার রহস্য সিরিজের শেষ সংখ্যা। অজিতই খুনী। আমি ভেবেছিলাম সমর হবে। তুই কাকে মনে করেছিলি ?

'ধপাস্ করে চেয়ারে বসে পড়লাম। শেষরাত্রে এমন রসিকতার মানে হয় অদিতি ?'

টিপ্পনী কাটলাম, 'ভারি মজার ব্যাপার তো ! বলতে হবে ভদ্রলোক বনেদি নাগর, নয়তো ভোররাতে বিছানা ছেড়ে তোমার সঙ্গে এমন রগড় করে কে বটে। বলো না একটু শুনিটুনি।' তুষ্টুমি করে চোখ টিপে দিলাম।

অরুণা নিশ্বাস ফেলল, 'আর হয়েছে ! বাবার অসুখ, মার বাত, ছোটোর স্কুলের

মাইনে, ঐ করেই তো জীবন গেল, কারো মুখের দিকে তাকাতে কি সময় পেলাম? একটু আয়েশ করি তার উপায়টুকুও নেই! বরং তুমিই বলো শুনি। এই চেহারা এই দেশ-বিদেশ, না জানি কত গুণী পায়ের তলায় লুটোচ্ছে?'

চিঠিটা প্যাডটা নীচে পড়ে গিয়েছিল। তেমনিই থাকতে দিলাম। আর মনে করে হাসলাম। 'শুনছি আমিই নাকি কার এক পায়ের তলায় গড়াব।'

অরুণা প্রায় আকাশ থেকে পড়ে। চোখ উলটে বলল, 'ওমা, একি কথা! কে বলে?'

ছোট্ট করে বললাম, 'মমি।'

'কে? মমতা? ও কেমন আছে?'

'ঐ একই।'

অরুণা দুঃখ করল, 'আহা কী হয়ে গেল! কী মিষ্টি ছিল দেখতে। ডাক্তার কী বলেন?'

'কী আর বলবে। চেষ্টা চলছে।'

'কদিন হল?'

'হবে দু-বছর।'

অরুণা চোখ ওপরে তুলল, 'অ্যাদ্দিন? আর কি ভালো হবে? বড্ড হাসিখুশি ছিল।' খানিক বিরতি দিল। আবার সেই আগের কথা। 'শুনি মমতা কী বলত?

লেখার প্যাডটা টেবিলে তুলে নিলাম। ফলাও করে বললাম, 'আমার নাকি বড্ড অহংকার, আমি নাকি ভাবি ছেলেরা সব আমার জন্য হন্যে। দেমাক করার মতো আমার নাকি কিছুই নেই। একদিন নাকি আসবে যখন ছেলেদের পায়ের তলায় আমিই গড়াব। এই হল মমির ভবিষ্যদ্বাণী।' কান্না-কান্না ভাব করলাম, 'আমার বোধ হয় কোনো ভবিষ্যৎ নেই।'

অরুণা তক্ষুনি জবাব দিল, 'তা থাকবে না কেন? তবে সুযোগ দেবে তো? নয়তো সাহস করে এগুবে কে? এমন মাস্টারনী চেহারা করে থাকলে কি কেউ কাছে ঘেঁষে?'

মার কথা মনে পড়ল। সত্যি সত্যি হেসে উঠলাম। ঠিক মার মতো কথা হল। মমির বিয়ের কথা বলতে মাও ঐ এমনি বলছিলেন। বলছিলেন 'ইন্‌জিনিয়ার ছেলে, দেখতে শুনতেও বলছিস ভালো, বড়ো চাকুরে, খুঁতের মধ্যে যা একটু মা বাপ কুটুম কাটুম নেই। তা আজকালকার মেয়েরা কে আর শ্বশুর শাশুড়ির ধার ধারে? বেশ ভালো বিয়েই তো ঠিক হয়েছে। সম্বন্ধ কে আনল?'

'কেউ আনে নি, ও নিজেই ঠিক করেছে।'

মা সলতে পাকাচ্ছিলেন, বন্ধ হয়ে গেল।

আমার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন তারপর রায় দিলেন, 'খুব ভালো করেছে, ধিঙ্গি হয়ে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে নিজে দেখেশুনে বিয়ে করছে, মনের মতো লোক পেয়েছে, বেশ ভালো করেছে।'

মাকে খ্যাপাতে বলছিলাম, 'দাঁড়াও তোমার মেয়েও নাদুস নুদুস একটি ভালোমানুষ বর খুঁজতে এবারে উঠেপড়ে লাগছে।' মা রেগে মেগে উঠে পড়েছিলেন, 'তোমার ঐ মাস্টারনী চেহারায় কেউ কাছে ঘেঁষবে না মা।'

অরুণা হেসে গড়িয়ে পড়ল, 'ঠিক বলেছেন। একটু তো নরম সরম হতে হয়।'

'শুনি কাকে দেখে?' খেলাচ্ছলেও বুঝি আমার গলায় ঝাঁঝ লেগেছে।

অরুণা আত্মস্থ। নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমার কথা আলাদা। ভালো কাজ করছ, ঘুরছ, ফিরছ, লিখছ, বেশ আছ। আমরা কিন্তু কাউকে পেলে বর্তে যাই।'

টেবিল থেকে মমির খাতাটা তুলে অরুণা পাতা উলটোচ্ছিল। এক জায়গায় থেমে জানতে চাইল, 'নিতাই কে? হিরো নাকি? কী বিদ্‌ঘুটে নাম বাবা।'

নিতাইয়ের কথা আমার এ ঘরে! হঠাৎ কেমন নতুন ঠেকল। আমাকে এ খোঁড়া লোকটা স্বাভাবিক হতে দেবে না। মমি কি রকম পারে। ওর কথাও ফলাও করে লিখতে পারে। ঝুঁকে লেখাটা একটু দেখলাম। তারপর অরুণার হাত থেকে খাতাটা এনে টেবিলে রেখে দিলাম, বললাম, 'গল্প উপন্যাসের প্রত্যেকেই হিরো।'

অরুণা এতেও রাজি, 'তা হবে।' আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'রাত হয়েছে, খাবে না?'

শীত পড়েছে। খেয়ে সোজা ওপরে চলে এলাম। দরজা বন্ধ করে, হাত-মুখ ধুয়ে, টেনে চুল বেঁধে, রাতের জামা পড়ে, মুখে ক্রিম ঘষে, টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে মমির হাতের নিতাইকে খুঁটে খুঁটে দেখছি।

নিতাইকে কি হিরো হিসেবে দেখা যায়? যেমন কথাচ্ছলে অরুণাকে বলেছি? আমার চোখে সে দেহে নষ্ট, মনেও। মমির চোখে দেখলে হয়তো ওর একটা দেখার মতো মূর্তি বেরিয়ে আসতেও পারে, যেমন একটা রহস্যের সমাধান। যেমন কে এক অলকা। নিশ্চিন্ত, অজিত খুনী। আমি সেদিক থেকে তাকিয়ে দেখি নি। কেমন হয় মিলিয়ে দেখলে? মমির লেখাটা নিয়ে বসেছি, এখানে ওখানে ছড়ানো উল্লেখ। সবটা জুড়লে কেমন দাড়ায়?

১২ই শ্রাবণ। মাস ছয়েক আগে শীতটা শেষ হতেই নিতাই রিহেবিলিটেশন সেণ্টার ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ওকে যখন তখন মনে পড়ে; চলে গেল বলেই নয়। ফিরে যেদিন এই ডানলপ বিছানার একপাশে কাঠের দুটো পা রেখে হাত বাড়াল, সেদিনটা আরও মনে পড়ে। 'সব গেছে দিদিমণি, কিন্তু রাগ গেল না। শালার রাগ হাতের মুঠোয় ভর করে। আসতে কি মন চায়? শালা হাতের ভয়ে পালালাম।' নিতাই তার ওর শির-ওঠা হাত দুটো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। আমরা যাদের পা নেই, আমরা হাত দেখি। কতদিন নিতাই বলেছিল—তার হাত সরলার গলায় চেপে বসতে, গোপিনের নলী ছিঁড়ে ফেলতে তিড়বিড় করছে, 'তাই না পালালাম মাইরি। মরুকগে নচ্ছার মাগী, হারামজাদী। আমি শালা আর ওমুখো হচ্ছি না। থাক খ্যাঁদা গোপিনের কোলে শুয়ে, থাক মাগী! আমায় একটা কাজ করে দিন দিদিমণি?'

যখন যা মনে আসে, এমনি করেই কথা বলে। আমি যে শুনছি পরোয়াই নেই।

শীলা একটি বাচ্চাকে ট্রলিতে হাঁটাতে চেষ্টা করছিল। দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি এখানে? দেশে না গিয়েছিলে?'

নিতাই শাদামাটা গলায় বলল, 'প্লাস্টিকের পা বানাতে এসেছি। শালার দেশের মুখে লাথি।'

এমনি বলে ব'লেই এখানে সবাই নিতাইকে চেনে। এক আমিই এখানকার কাউকে অনেক দিন চিনি নি। ডাক্তার, থেরাপিস্ট, রুগী কাউকেই না। দম দেওয়া একটা পুতুল আমি। থেরাপিস্টদের হাতে এক্সারসাইজ করি, ওরা আমার জমাট পা শরীর নাড়াচাড়া করে, আমি দেখব না বলেই বাইরে তাকিয়ে থাকি। দিনরাত আকাশ দেখি। ভিতরে তাকাতে আমার ঘেন্না। এমনি অনেক অনেক দিন আমি কাটিয়েছি। একদিন আকাশ ছেপে বৃষ্টি এল। জানলা বন্ধ করতে নারায়ণ এসেছিল। দিই নি, বাধ্য হয়ে বলতে হল খোলা থাক।—ওর সঙ্গে আমি কথা বলি না। আমাদের মতো সে খোড়া, নুলো তো না, ওকে দেখলেই কিন্তু আমার কী যে বিকৃত মনে হয়। অথব মেয়েদের গায়ে সে হাত বুলোয়। সোমত্ত হলে তো পোয়াবারো। ওরা ওকে ধরে ওঠে বসে। কিছু বলতে পারে না, বোবার মতো তাকিয়ে থাকে। লোকটা খালি সুযোগ খোঁজে। ওদের অসামর্থ্যকে কাজে লাগায়।

খুব জোর বৃষ্টি। ছেলেবেলায় বৃষ্টি নামলে আমি রীনা উঠোনে ছুটতাম। ঐ

ছিল মস্ত খেলা। একদিন মা ঘাড় চেপে ধরেছিলেন, 'কোথায় ছোটোবোনকে সামলাবে, না ধিঙ্গি মেয়ে নিজেই নাইতে বসেছে।' ঐটুকুই মার বকুনি।

মধুপুর থেকে ফেরার পরদিন বৃষ্টি এল। বারান্দায় আমি মা রীনা বৃষ্টি দেখছিলাম, ধুলো উড়িয়ে ঝড়ের সঙ্গে ঝম্‌ঝম্। মাঝে মাঝে মা কেমন যেন ছেলেমানুষ হয়ে যান। সজনে গাছের ওদিকে বারান্দার শেষ মাথায় বৃষ্টিতে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ছাদের পাইপ বেয়ে ঝর ঝর জল পড়ছে। মার পাশে আমি, আর রীনার কী ছুটোছুটি। বৃষ্টির ছাঁটে বারান্দা ভাসছে। বলতে যাচ্ছিলাম পড়ে যাবি রীনা, বলা হল না। ট্যাক্সি থেকে নেমে বাগান পেরিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সুমন্ত আসছে। মাথা নীচু, বৃষ্টি বাঁচিয়ে ছুটছে। বারান্দায় উঠে সোজা হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়। কয়েকটা ভিজে চুল কপালে আটকে, হাত দিয়ে পেছনে ঠেলে, কেন যে এল যেন তারই কৈফিয়তে খবর দিল, 'বৃষ্টি নেমেছে।' যেন আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যেন নতুন কিছু বলা হল, যেন বৃষ্টি নামলেই আসতে হয়!

এমনি সব কথার মাঝে নিতাই একদিন জিজ্ঞেস করল, 'ঐ যে লম্বাপানা চশমাপরা হেঁড়েগলার সাহেববাবু রোজ আপনার সাথ সাথ আসে, ও আপনার কে লাগে?'

জোর বৃষ্টির ছাঁট আসছে। হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে ভিড় হয়ে গেল। বুঝলাম হাসপাতালের ভ্যান এসেছে। রুগীরা ঢুকছে, স্ট্রেচারে একটি মেয়েকে এনে ডানলপের বিছানায় শুইয়ে দিল, মাথা ন্যাড়া, দুটো চোখ অনবরত ঘুরছে। শরীর স্থির, একটি মাছি ঠোঁটের কোনায় বসল। উড়ে আবার ওখানেই বসল। আমি হাত দিয়ে আমার ঠোঁটের কোণটা মুছে নিলাম। রুগীরা আসছে, কল্‌কল্ করে নোংরা ভিজে জামা কাপড়ে, বাচ্চা বুড়ো নুলো খোঁড়া।

ক্রাচে লাফিয়ে লাফিয়ে নিতাই এসে ঘরে ঢুকল। না তাকালেও ওকে চোখে পড়ে। হাঁটু অব্দি পা নেই, লাফিয়ে পুরো হাসপাতাল তোলপাড় করে। সবার সঙ্গে ঝগড়া করে। অকারণে কাটা ঘা খুলে বসে থাকে। আর যেখানেই থাকি জ্বালা জ্বালা চোখে তাকিয়ে থাকে। ক্রাচ খট্‌খট্ করে এদিকে যাচ্ছিল, দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী করে ভাঙল?'

মুখ ফিরিয়ে রইলাম।

দাঁড়িয়ে রইল। রঞ্জন বসে পায়ে স্প্লিন্ট বাঁধছিল, হারাধন এলে দাঁড়াবে। জানান দিল, 'অ্যাকসিডেন্ট'।

ওদিকের বিছানায় দড়িতে পা ঝুলিয়ে আর্থ্রাইটিস্ রুগী বুড়ো ভদ্রলোকটি শুয়ে ছিলেন। শুয়ে শুয়ে ভদ্রলোক প্রায়ই এদিকে তাকিয়ে থাকেন। বিড়বিড় করে আবার যেন কী বলেন। প্রার্থনা ? না, আমার হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা ? সবই তো কর্মফল। আমার, ওর, সবার। অ্যাকসিডেন্টের পর বাবা এক সাধুকে ধরে এনেছিলেন, সাধু বলেছিলেন, কর্মফল।

রঞ্জনের কথা শুনে ভদ্রলোক আমায় সান্ত্বনা দিলেন, 'ভগবানকে ডাক মা। ভালো হয়ে যাবে।'

আচম্‌কা নিতাই হা-হা করে হেসে উঠল। হাসির বিক্ষোভে চোখে জল, ক্রাচ সোজা করে টান হয়ে দাঁড়াল, 'হ্যাঁ ঐ পিত্তেশে বসে থাক, ও বুড়ো বাবা তোমার ভগমান বাবা কলকে টেনে বাবা বুঁদ্। যতই কাঁদ নাকো, কানে তালা।' ও চারদিকে একবার তাকাল। যেন কাউকে খুঁজছে, 'যদি একবার সম্বন্ধীর দেখা পেতাম!'

বুড়ো ভদ্রলোক, রঞ্জন একেবারে চুপ। আমার কী হল, এই প্রথম আমি ওকে ডাকলাম, 'তোমার নাম কী?'

হঠাৎ বুঝতে পারে নি। বুঝতে পেরে এক পা এগিয়ে এল, সমারোহ করে বলল, 'বাপ মায়ের নামের বাহার ছিল। নিতাই মহারাজ। তবে ডাকতে সময় পেল না চলে গেল।' ওপরের দিকে হাত তুলে সে হাসতে লাগল।

আমি ঘাড় ফিরিয়ে ভালো করে দেখলাম, 'কোথায় থাক?'

চট্‌পট্ জবাব দিল, 'কপালের ফের, থাকতাম রাজধানীতে আর এখন হাসপাতালে।'

কথা ঐ পর্যন্ত, কিন্তু ও আমায় আর ছাড়ল না। ওয়ার্ড বয়দের ডেকে আনা, আমার হুইল চেয়ার এগিয়ে দেওয়া, নীচে নামতে প্রতাপকে ডেকে স্লোপের পাশে গাড়ি রাখা, এ যেন সব ওর দায়িত্ব! আমার অস্বস্তি লাগত, রাগ হত, কিন্তু ওর নজর নেই। তখন থেকে পি-টিতে বেশির ভাগ বসে থাকে, এক্সারসাইজ করে, আর জ্বালাধরা কথা বলে। পরে বুঝেছিলাম জন্ম থেকে এমনি কথা বলতেই শিখেছে। পাঁচ বছরের ছেলে যেদিন পুঁটুলি হাতে কাকার বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল, কাকী এমনি কথা বলেই ওকে ঘরে তুলেছিল। আকাশের দিকে আঙুল উঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়েছিল, 'মুখপোড়া মা বাপের বিচার দেখ! আমার ঘাড়ে পাপ গছিয়ে দিব্যি কেটে পড়েছে। সব হাড়ে হাড়ে বদমাশ!'

এটুকু ছেলে, কী করে জানবে বিচার বাঁচিয়ে চলতে ওকে আগেকার সব কিছু ভুলতে হবে। তাই যখন তখন মাকে মনে করে কাঁদতে বসে যেত। খিদে পেলে জোর গলায় খাবার চাইত। পেট ভর্তি খেতে না পেলে চুলোচুলি করে ভাইবোনদের কাছ থেকে কেড়ে খেত। চিৎকার, কাড়াকাড়ি, মারামারি উঠোনে কুরুক্ষেত্র। কঙ্কালসার কাকিমা ছুটে এসে প্রথমেই ওর পিঠে কিল বসিয়ে চুলের মুঠি ধরত, 'পাপ বিদেয় হ বাড়ি থেকে, বের হ্।'

বেরিয়েও ছিল। দু-বছর পর, সাত বছর বয়সে, একদিন মার খেয়ে ঠিক করে ফেলল 'দুত্তোর শালা আর না!' তারপর বাসের রাস্তা ধরে কলকাতায়। এক অন্ধকার রাত্তিরে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল। ঐ অন্ধকার আর কাটল না। চায়ের স্টলে, পকেটমারের আড্ডায় ভিখিরিদের দঙ্গলে হামেশা মার খেয়ে বড়ো ফাটক্‌ওয়ালা বাড়ির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিল। ডাস্টবিনে মানুষে কুকুরে কাড়াকাড়ি করে খেয়ে, নেড়িকুত্তার গলা জড়িয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শিখল শুয়ে থাকতে। মানুষ দেখলে লে-লে-কুত্তা, মজা দেখত। হেসে গড়িয়ে নেড়ি কুকুরটার পিঠ চাপড়ে বলত, 'ছাখ্‌ ছাখ্‌ শালা সেঁধিয়ে গেছে।'

শিয়ালদা স্টেশনের পেছনে অনেকের সঙ্গে নিতাইও এসে ডেরা বাঁধল। নাছোড়বান্দা সঙ্গী কুকুর দুটো। 'রাজার বডিগার্ড', নিতাই বলত। মাঝে মাঝে পানের দোকানে বিড়ি কিনে আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখত। পাঁচ বছরের ঐ ছেলেটা গেল কোথায়? ঐ এক মিনিট। যা ইচ্ছে তাই তার পরই। শেষরাতে ফুটপাতের জলের ছরছর আওয়াজেব আগেই ঘটি, বালতি, ডেকচি, কলসি চেঁচামেচি, গালাগালির তালগোল। নিতাই তখন পাশ ফিরে মৌজ করে শোয়। ওর তরফ থেকে কুকুর দুটো কলের ধারে দাঁড়ায়। সবাইয়ের চেঁচামেচিতে সবাই জাগে।

সেদিন ছিল হরিদাসী, বাতাসী, কালী, ধনা-বৈরাগী, ফুলমণির চুলোচুলি নাচানাচির দিন। কোথায় রাত জেগে নিতাই ফিরছিল। চোখে মুখে জল দিতে কলতলায় দাঁড়াল। মজা দেখছে। কুকুর দুটো প্রভুর গন্ধে চামড়া শুঁকছে, পা আঁচড়াচ্ছে, লেজ নাড়ছে। হঠাৎ কী হল, লে-লে-লাগ-লাগ, জলে, ভিড়ে, চুলোচুলিতে কুকুর দুটোকে লেলিয়ে দিয়ে নিতাই লাফাতে লাগল। ঘেউ ঘেউ করে কুকুর দুটো দৌড়তেই চিলের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে ওপাশ থেকে মেয়েটা এসে নিতাইকে ধরল ঝাপ্‌টে, ঘুম ভাঙা ফোলা ফোলা চোখ, কালো গোলগাল

শরীর, ঐ নরম তুলতুলে বুক জড়িয়ে ধরে নিতাই জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় থাকিস ?'

মেয়েটা চোখ বুজে চেঁচাচ্ছে, 'খেয়ে ফেলল, খেয়ে ফেলল!' এক ঝটকায় নিতাই ওকে ছাড়িয়ে দিল, 'এই চেল্লাবি না, গলা টিপে দেব!'

দু-দিন পর স্টেশনে দেখা, একগাদা কাগজের ঠোঙা হাতে। নিতাই দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরল, 'এই কোথায় যাচ্ছিস ? হাতে কী ?'

নজরে রাজ্যের তাচ্ছিল্য ; মেয়েটা বলল, 'দেখতে পাচ্ছ না ? কানা নাকি ?'

চড়াৎ করে নিতাইয়ের মাথায় রক্ত উঠেছিল! রক্ত নামিয়ে নিল। ঠাণ্ডা মেরে বলল, 'এগুলো দিয়ে কী করবি ?'

বাইরে পা দিয়ে গালে আঙুল ঠেকিয়ে বেঁকে দাঁড়িয়ে মেয়েটি বলল, 'ওমা ন্যাকা, ঠোঙা দিয়ে কী করে জানে না, রাজা। দোকানে দেব পয়সা পাব! একশ দেব, দেড়শ নেব।'

নিতাই দাঁত বের করে হাসল। 'তা'লে বল রোজগার করিস ?'

সরলা মুখ মটকে বলল, 'নয়তো কি নেড়িকুত্তার সঙ্গে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরব আর পকেট মারব ?'

নিতাই এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে দাঁত চেপে শাসাল, 'কী বললি ? আবার বল!'

সরলা গা দুলিয়ে এক ছুটে পালাল।

পরদিন নিতাই পুরো কলকাতা শহর ঘুরেছিল। রোজগার করতে হবে। সারাদিন ঘোরাঘুরির পরও রাত্তিরে ঘুম এল না। সার সার সব শুয়ে। ল্যাম্প পোস্টের আলোর ঠোঙায় অজস্র পোকা।

অনেকদূর অন্ধকারে অস্পষ্ট একটা ছবি। বারান্দায় চাটাই বিছানো। মায়ের বুকে হাত ঢুকিয়ে পাঁচ বছরের ছোটো একটি ছেলে। উঠোনের ওদিকে জোনাকির ভিড়।

'তারপর কী মা ?'

মায়ের কালোমুখ অন্ধকারে মিশে আছে। বাইরের ফালি আলোর রেখায় শুধু কপালের সিঁদুরটিপ জ্বলছে। বলল, 'খোকন সোনা বড়ো হয়ে রাঙা বৌ ঘরে আনল।'

নিতাই উঠে বসল। গা ভর্তি পোকা। থাবড়া মেরে একদলা পোকা থেঁতলে দিল। সরে, ল্যাম্প পোস্ট থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বসল। কুকুর দুটো উঠেছে। মুখ তুলে একবার দেখে আবার পেটে মুখ ডুবিয়ে দিল।

ধনঞ্জয়ও উঠে বসেছে, 'কি ঘুমাস নি ?'

নিতাই একটা বিড়ি ধরাল, 'শালার পোকার ইয়ে করি। নে বিড়ি খা।'

ধনঞ্জয় এক লাফে নিতাইয়ের গা ঘেঁষে, হাত পেতে বিড়ি নিয়ে ভাব জমাল, 'আজ কত কামালি ?'

নিতাই বিড়ি টানছে, কথা বলে না।

নির্জন রাস্তায় মাঝে মাঝে এক আধটা গাড়ি যাচ্ছে। দূরে ফায়ার ব্রিগেডের ঢং ঢং ঢং ঢং আওয়াজ মিলিয়ে গেল। কোথাও আগুন লেগেছে।

মাঝ রাস্তায় বিড়ি ছুড়ে নিতাই উদাস, 'এক পয়সাও না।'

সুখটান দিতে গিয়ে ধনঞ্জয় নিতাইয়ের মুখে চেয়ে রইল। 'কী বললি ?'

'এক পয়সাও না।'

'বলিস কী! শালার কুলিগিরি করি; বলি নিতাই শালা বেড়ে আছে। পকেট মারে, পকেট ভরে। আমরা গাধা মোট বয়ে মরছি আর তুই শালা মজা লুটছিস। মনটা খিঁচড়ায় কিনা, খিস্তি করতে মন চায় কিনা, তুই-ই বল ?'

নিতাই ঘুরে বসল। তুই পাছায় চাড় মারল, 'বাস কাল তোর সঙ্গে টেশনে যাব, তুই আমার লাইসেন্ করে দিবি।'

লাল কুর্তায় নিতাই তেতাল্লিশ নম্বর হয়ে গেল। দিনের শেষে গাছের নীচে বসে হিসেব করে, একটা ঘর, তেল, চুলের কাঁটা, সিঁদুর, সাবান, পাউডার, রেশন, বাজার। বাজারটা একটু ভালো করতে হবে। ওর আবার ভালোমন্দ খেতে পছন্দ। বড়ো বাড়ির বিয়ে, শ্রাদ্ধে ডাস্টবিনে ছেলে বয়সটা কেটেছে। রকমারি ভালো খেয়েছে। আজও খায়, টাকা পেলেই খায়। রেস্টুরেন্টে বসে চপ কাট্‌লেট, রোগন জুস্ খায়। সব হবে! কেল্লাফতে। নিতাই উঠে ঐ লাল কুর্তা পরেই কলের ধারে একবার ঘুরে এল।

মাথায় ট্রাঙ্ক, হাতে ঝুড়ি সুটকেস নিতাই একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেল। গোল গোল চোখ আরো গোল করে সরলা গালে হাত দিয়ে অবাক মানল—'এ কী গো!'

থামের পাশে দাঁড়াতে বলে নিতাই বেরিয়ে গেল। ফিরে এসে কী বলবে ভুলে গেছে।

সরলাই প্রথম বলল, 'অবাক মানি যে গো। তুমি এখানে ?'

নিতাই পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বের করে সরলার হাতে দিল, 'নে, ধর।'

মুখরা মেয়ে। কল্‌কল্‌ করে উঠল, 'মরি, সোহাগ দেখ। নিজের ঠাঁই নেই, শঙ্করাকে ডাকে। স্যাও ধর, তুলে রাখ, ঘর বাঁধতে হবে না?'

নিতাই হাত বাড়াল না। বলল, 'তোর কাছে জমিয়ে রাখ।'

আঁচলে গিঁট দিতে দিতে সরলা কটাক্ষ করল, 'আর যদি মেরে দি?'

'চাঁটি মেরে মাথা ভেঙে ফেলব না।'

সরলাকে নিয়ে নিতাই ঘর বাঁধল।

ঘুম ভাঙতে নিতাইয়ের দেরি হয়েছিল। অনেকদিন পর ধনা ওদের সঙ্গে গিয়েছিল বেলেঘাটায় ফুর্তি করতে। খরচটা নিতাইয়েরই। সবাই বলছিল, নিতাই তুই বড়ো ভালো, তোর বউ বড়ো লক্ষ্মীমন্ত। ওরা যখন তা বলছিল, নিতাই মনে মনে দেখছিল দুয়ারে বসা উদোম গা সরলা, পুঁটুরানীকে মাই দিচ্ছে। দু-বছরের মেয়ে তাও পুঁটুরানী দুধ খায়। এ সময় সরলা বুক উদলা করে বসে আর বকর বকর করে। পুঁটুরানী বোঁটাশুদ্ধ একটা মাইয়ের অদ্ধেকটা মুখে পুরে চোষে, আর অন্যটা চটকায়। মাদুরে শুয়ে শুয়ে নিতাই তাই দেখে।

ম্যাজম্যাজে শরীর নিয়ে উঠেই মনটা খিঁচড়ে গেল। রোদ খট খট করছে, হারামজাদি যদি একবার ডেকেও দিত! খারাপ গালি দিতে দিতে নিতাই স্টেশনে ছুটল। কপাল ভালো, মেল গাড়ি সবে স্টেশনে ঢুকছে। ছুটে গিয়ে একটা কামরায় উঠবে কী হয়ে গেল! সব তলিয়ে যাচ্ছে কেন? প্ল্যাটফরম্‌ ও গাড়ির মাঝের সংকীর্ণ জায়গায় নিতাইয়ের পেট কোমর ঘষতে ঘষতে গাড়ির সঙ্গে খানিকদূর এগিয়ে গেল। টেনে যখন বের করা হল, তখন ওর মুখ হাঁ, চোখ দুটো ঠিকরে পড়ছে। বহুদিন হাসপাতালে কাটল। কাটাছেঁড়ায়, ওষুধে অজ্ঞানে যেদিন পুরোপুরি বুঝতে পারল তখন ওর কোমরে প্লাস্টার, পা দুটো বিছানায় নেই বুঝতে পেরে গলা চিরে জানোয়ারের মতো নিতাই এমন আর্তনাদ করে উঠেছিল যে ডাক্তার, নার্স, রুগী, সব ছুটে জমা হয়েছিল। দু-একদিন মর্ফিয়ায় নিতাই চুপ করে রইল, তারপর শুরু খ্যাপামির। সরলার একমিনিট দেরি হলে চুলের মুঠি ধরত। 'নচ্ছার সাজগোজ করে কোন নাগরকে দেখাতে গেছলি। দাঁড়া, তোর সব নষ্টামি বার করছি।' শাপ শাপান্ত নয়তো মারপিট। চলছিল এই-ই।

মাসখানেক পর সরলা ওর মাকে নিয়ে হাসপাতালে এল। কথাটা মা তুলেছিল। 'রেলওয়ের খরচায় তুমি তো বাবা হাসপাতালে ভালোই আছ, কিন্তু

মেয়ে নিয়ে আমাদের চলে কী করে? গোপিন বলছিল ওর সঙ্গে গাঁয়ে যেতে। সুযোগ ছাড়ি কেন বাপ; আমরা গাঁয়ে গিয়েই থাকি।'

পরদিন সরলা ঢুকতে নিতাই হাসল, 'যাওয়াই ঠিক করে ফেলেছিস?'

সরলা কিছু না বলে সরে বসেছিল।

হা হা করে নিতাই হেসে উঠল, 'ঘাবড়াস কেন? দেখতে পাচ্ছিস না, কোমরে প্লাস্টার, পা নেই, নড়তে পারি না, ভয় কী?'

শীতের শেষে নিতাই জোর করে গাঁয়ে চলে গেল। ডাক্তার একেবারে পার্মানেন্ট পা করে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। নিতাই নারাজ। পালিয়েছিল। মেয়ে বৌ দেশে. মন কেমন করে।

সাতদিন না যেতে নিতাই এসে হাজির। 'দেশের কাজ খতম দিদিমণি। শালা হাতের ভয়ে চলে এলাম। নিতাই আর মরদ নেই।' ও বসে বসে সাঁড়াশির মতো হাত দুটো দেখছিল। রোজ সকালে হাসপাতাল আসে। কাঠের পা ঠক্ ঠক্ করে ঘুরে বেড়ায়, বাকি সময় আমার পাশে বসে থাকে। 'কাজের কিছু হল দিদিমণি?'

একদিন সুমন্তকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ঐ লম্বাপানা বাবুটি কে?' ওর চোখে জ্বালা।

বারান্দায় সুপ্রিয়া ও সুমন্ত দাঁড়িয়ে, কথা বলছিল। এখান থেকে সুমন্তর মুখের পাশটা দেখা যাচ্ছে। আজ কিছুক্ষণ এখানে থাকবে। বলেছিল ডাক্তার সেনের সঙ্গে দেখা করবে।

এমনি আচমকা এক একদিন কলেজে এসে সুমন্ত হাজির হত। বলত, 'দেখতে এলাম।'

'শুধু দেখতে?'

'শুধু দেখতে।'

'ভয়ে বুঝি? যদি পালাই, ভয়ে বুঝি?'

সুমন্ত হাসছে। ভরা দুপুর। গেটের বাইরে। চশমার কাচে রোদ পড়ে ওর চোখ দুটো পুড়ে গেছে।

এগিয়ে গিয়ে আলতো ওর হাতে হাত ছুঁয়েছি।

'সুমন্ত আমি যদি হারিয়ে যাই তুমি কী করবে?'

হাওয়া দিচ্ছে। গেটের পাশে ঝাউগুলোতে হা-হা হাওয়া আওয়াজ দিচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে।

'কী করব ? দেখাচ্ছি।' সুমন্ত এদিক ওদিক তাকাল। পথে অনেক লোক।

'বল না কী করবে ?'

হঠাৎ ঝুঁকে যেন মাটি থেকে কী তুলবে, ওর মুখ আমার মুখের কাছে।

'বল।'

তেমনি হঠাৎ সোজা দাঁড়িয়েছে। 'কী করব আবার, বিয়ে করব।' সুমন্ত হাসছে।

নিতাই পাশে নেই। কখন চলে গেছে দেখি নি। সুপ্রিয়া সুমন্ত ওরা কেউ বারান্দায় নেই।

পেরেন্টস টিচারস ডে। আজ ক্লাশে গিয়ে বই খুলে বসতে হবে না। ঠিক সময়ে তবু তো পৌঁছানো চাই, রেহাই নেই। কতকাল কাজ করছি, কিন্তু সকালে ওঠা রপ্ত হল না। সেই আটটায় উঠে নটায় ছুটতে হল স্কুলে। সকালের দিকে বিশেষ করে বাবারা এলেন, দু-চারটে কথা, অফিসের তাড়া চলে গেলেন। তারপর ক-জনের মা, সবাই যে এলেন তা বলে এমন নয়। তাই দুপুরের দিকে অনেকটা সময় বসে কাটালাম। স্বপ্নার মা এলেন বিকেলের দিকে। মহিলা খুব চটপটে। বড়ো মেয়ে স্বপ্না। মা, মেয়ে দু-বোনের মতো। মেয়ের পড়ার খোঁজের চেয়ে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছেন সেইটাই বেশি। মামুলি দু-একটা প্রশ্ন 'স্বপ্না কেমন করছে ? বাড়িতে টিউশনির দরকার কী ? অবশ্য আপনার কথা স্বপ্না সব সময় বলে। এমন করে বুঝিয়ে দেন ক্লাশেই পড়া হয়ে যায়। সায়েন্সের আমি কিই বা বুঝি ? ওর বাবা কিন্তু বলেন কলেজের প্রফেসারও এমন সুন্দর করে পড়াতে পারবেন না :…'

প্রশ্ন, উত্তর, সমালোচনা, সিদ্ধান্ত সবই এক মুখে আমি বসে শুধু শুনলাম, নিয়মমতো হাসি যোগ দিলাম। সবশেষে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোন দিকে যাব। পরেশনাথের ওদিকে শুনে মহা উৎসাহ। বললেন, 'আমার ননদও ওদিকে থাকেন, ডলির মা, মেয়ে খুব চৌখস সবাই ওকে চেনে।'

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'হ্যাঁ ডলির নাম তো রোজই শুনছি রীনার মুখে।'

মহিলা উৎসুক হয়ে উঠলেন। 'কোন রীনা বলুন তো ? অ্যাটর্নি শশাঙ্ক রায়ের ছোটো মেয়ে ?'

সম্মতিতে বললাম, 'আপনি চেনেন ওদের ?'

'ওমা! চিনব না? রীনা আর ডলিতে যে গলাগলি ভাব। বড়োটি তো প্যারালিসিস হয়ে পড়ে আছে। থাকা না থাকা সমান। স্ত্রীও মারা গেলেন কত অল্প বয়সে, ভদ্রলোকের কপালই খারাপ। বড়ো মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। ঐ ছেলের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েই তো এমন হল। কে জানে কী করে কী ঘটল। লোকে তো কত কথাই বলে। আজকাল আর কাকে যে বিশ্বাস বলুন? আপনি ওদের চেনেন বুঝি?'

এমনিই হয়! এতক্ষণ যাকে এড়াতে চাইছিলাম তার কথাতেই এখন আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছি। কী কথা তবে লোকে বলে? অবিশ্বাসের কী কথা উঠতে পারে সুমন্তকে নিয়ে? কী হয়েছিল তবে ডায়মণ্ডহারবারের পথে? আর এই যে সুমন্তকে মমি এমন করে ঠেলে দিতে চায়, কেমন যেন বেশি এই বৈরাগ্য। আতিশয্যেরও তো একটা সীমা আছে? কী তবে রয়েছে এর আড়ালে জানে কেবল ওরা দুজনে, কিন্তু মমি বলবে না, সুমন্তও বলতে পারে না। আর মেসোমশায়ও কী যে বলতে গিয়ে শোনাতে পারলেন না সেদিন, ইঙ্গিতে যা জানে হয়তো বা সুমন্ত আর মমি, আমি তা জানি না। কী তবে সে কথা যা লোকে বলে?

মহিলা উঠে যেতে আবার আমার কাছে মমিদের ভাবনা রেখে গেলেন। সারাদিনের ঝক্কি, ভেবেছিলাম ওদিকে আজ আর না, বুঝি স্বপ্নার মা আমার সে সংকল্প ভাঙতেই এসেছিল।

মমিদের ওখানে পৌছোতে পৌছোতে সন্ধে হয়ে গেল। ওর এক্সারসাইজ শেষ, প্যারালাল বার থেকে নেমে হুইল চেয়ারে বসেছে।

কোণের শূন্য চেয়ারটা চোখে পড়তে জিজ্ঞেস করলাম, 'নিতাই আসে নি?'

মমি পায়ের ব্রেস্ খুলছিল, হাত ছেড়ে অবাক হল, 'কার কথা বললি?'

এমনই শুধু নয় যে সেদিন রাত্তিরে মমির লেখাটা পড়েছি বলেই ওকে মনে পড়ল। নিতাইয়ের কাহিনীর শেষটায় পর্দাটানা। দুই হাতের ভয়ে নিতাই গাঁ থেকে পালিয়ে এসেছে, শুধু এমন একটা ইঙ্গিতে মমিই এখানে পর্দাটা টেনে দিয়েছে। ঠিক এমনিই তো লোকে কত কী বলে মমিকে নিয়ে। স্বপ্নার মার খোঁটাটা আমার এক্ষুনি ভোলার কথা নয়। প্রশ্নটা হালকা করতে বললাম, 'সারাদিন আজ যা ঝক্কি গেল তাও আবার কাজে না, অকাজে। সুমন্তবাবু কী না কী কাজের কথা বলছিল সেদিন নিতাইয়ের?'

মমি আশ্বস্ত হয়ে ব্রেস খুলতে মন দিল। খবর দিল, 'সুমন্তদের কারখানাতেই

নিতাই কাজ নিয়েছে। এবার খানিকটা স্বাভাবিক হলে হয়। মানুষের ওপর মিথ্যে আক্রোশটা যায়।'

পুরনো তর্কে গেল। বললাম, 'মিথ্যে আক্রোশ বলছিস?'

'নয়তো কী? যেখানে গত্যন্তর নেই সেখানে গায়ের জোর ব্যভিচার।'

ব্রেসের পেটিগুলো নিয়ে মমি টানাটানি করছিল। নুয়ে করতে অসুবিধে হয়, পারছিল না, ছুটে ছুটে যাচ্ছিল। দেখতে কথাটা কেমন মনে পড়ল, বললাম, 'আক্রোশে শক্তির প্রমাণ নেই মমি। শরীরের সামর্থ্য নেই বলেই মনে মনে ঝাঁপিয়ে উঠলে যা হয় তার নাম আক্রোশ।'

বলেই বুঝলাম কথাটা ঠিক হয় নি। এখানে পারতপক্ষে কেউ আমরা শরীর, শক্তি, সামর্থ্যের কথা বলি না। মমি যে কী দুঃখে পঙ্গু, তাকে আঘাত না দিতেই এ আমাদের এক অনুক্ত চুক্তি। ভুল এড়াতে এখন ইচ্ছে করছিল ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। হেঁটে গিয়ে দরজার পর্দাটা টেনে বাইরের দিকটা খুলে দিলাম। আর মমি যদি কিছু বলে বসে এই মর্মান্তিক কথার রেশ টানতেই থাকে, তার প্রতিপক্ষে যেন ভোলাতে আর লোভ দেখাতে টোপ ফেললাম, 'দেখছিস মমি সন্ধেটা কী রকম মাঠে মারা যাচ্ছে।'

সত্যিই তাই। বাগানে চেয়ার পাতা ছিল। নিশ্চয় আমরা বসব বলে। শীত পুরোপুরি যায় নি। গেটের দিক থেকে বসন্তের হাওয়াও থেকে থেকে দিতে শুরু করেছে। বাইরে গিয়ে দেখি সজনে গাছের শুকনো পাতা পাঁচিলের আশে-পাশে গাঁদা ফুলের ঝাড়ে পুজোর ফুল। সরস্বতী পুজো তবে এসে গেছে। পুজোর ভারটা হেড মিস্ট্রেস্ যদি আমায় দিতেন মমির রূপকথাটা স্কুলেই তবে করিয়ে নিতাম। রীনা লাফিয়ে উঠত। একবার এই সরস্বতী পুজোয় মমি রীনা রানাঘাট গিয়েছিল। গিয়ে রীনা পুকুরে ডুবে গিয়েছিল, মমির সে কি কান্না!

মমি মনে করাল, 'অদিতি মনে আছে একবার সরস্বতী পুজোর ছুটিতে রানাঘাট গিয়েছিলাম, রীনা পুকুরে ডুবে গিয়েছিল।'

অবাক হয়ে বললাম, 'আশ্চর্য আমিও যে ঠিক এ কথাই ভাবছিলাম।'

মমিও অবাক হল, 'তাই নাকি! আশ্চর্য তো।' তারপর যেন কিছুর হদিস পেল, হেসে বলল, 'দেখলি তো! তোর সব খবর আমার জানা আছে। তোর মনে কি আছে, সব জানা আছে।'

মনে পড়ল মমি একদিন আমার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। হেসে বললাম, 'তুই না আমার ভবিষ্যৎ বলেছিলি। এখন আমার বর্তমানটাও বুঝি তোর?'

'তাই তো বলি, সাবধান হোস,' বলে হাসতে গিয়ে মমি কেমন ম্লান হয়ে রইল।

চেয়ারগুলো কাজে লাগল, এক এক করে তারপর সবাই এল। স্কুল ফেরত রীনা কলা রুটি দুধ নিয়ে হাজির। মেসোমশায়ও এসে বসলেন। মাঝে মধ্যে সুপ্রিয়া আসে, আজ সুপ্রিয়াও এল। তারপর লাঠি ঠক্ ঠক্ করে নিতাই।

মেসোমশায় ডাকলেন, 'রমেশ, নিতাইকে টুল এনে দে।'

নিতাই তাড়াতাড়ি বাধা দিল, 'না বাবু আমি ঘাসের উপর বসছি।' বলে পা খুলে ঘাসে বসে গেল।

মেসোমশায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কাজ কেমন লাগছে নিতাই?'

নিতাইয়ের মুখে হাসি, 'তা বাবু, খুব ভালো কাজ।'

'মন দিয়ে কাজ করো। অসুবিধে হলে সুমন্তকে বলবে।' মেসোমশায় উঠে সুরকির রাস্তায় পা বাড়ালেন। বললেন, 'আমি একটু হেঁটে আসছি। তোমরা সব বোসো।'

সুপ্রিয়া এসেই ভিতরে চলে গিয়েছিল। বেরিয়ে এল শাড়ি পাল্টে মমির শাড়ি পরে, মুখ ধুয়ে মুছে, বেশ ছিমছাম হয়ে। ব্যাগটা চেয়ারে ফেলে গিয়েছিল, ঢিলেঢালা শিথিল এলিয়ে বসে কোলে তুলে নিল। যেন বাড়ির মেয়ে। দুই পা আছে, ঘুরে ফিরে যেন একটু বেশি বাড়ির মেয়ে, মমির চেয়েও।

'নেয়ে এসেছ, এবার খাও প্রিয়াদি।' রীনা কৌতুকে তার দুধ রুটি কলা সুপ্রিয়ার দিকে এগিয়ে ধরল।

'জানিস নে আমি কলা খাই নে।' সুপ্রিয়ার জানান, তারপর ফরমাস, 'ঠাকুরকে বলে আয়তো আমায় এককাপ চা দিতে। বড্ড মাথা ধরেছে।' বলে ব্যাগ খুলে অ্যাসপ্রো খুঁজতে একটা চিঠি টেনে তুলে, সুপ্রিয়া গেল হাঁ হয়ে। 'এই যা, মেসোমশায়কে দেখাব বলে নিয়ে এলাম, এখন হল তো!'

'কার চিঠি?'

'অস্ট্রেলিয়ায় মমির যে রেকর্ড পাঠানো হয়েছে তার জবাব। ডাক্তার আসবে মে-জুনে। এখন একটা ইনজেকশন দিতে লিখেছেন।'

মমি শুকনো হাসল। 'কত ইনজেকশন, কত এগজামিন তো করলে সুপ্রিয়া, আর কেন?'

পা নেই তাই লাফানোর পথ নেই, নিতাই প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'এবার দিদি

ঠিক ভালো হয়ে যাবে। আমি বলছি, ভালো হয়ে যাবে। আমি কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি দিদি হাঁটছে।'

রীনাও চেয়ার ছেড়ে দিয়েছে। 'আমি বলি নি দিদি তুমি ভালো হবেই।'

মমি হেসে উঠল, 'সন্দীপবাবু সুপ্রিয়াদিকে বলে দেখ এমন অশাস্ত্রীয় কথা। তোদের গর্দান যাবে।'

সুপ্রিয়া জ্ঞানগম্ভীর হয়ে সিদ্ধান্ত রাখল, 'কিছুই বলা যায় না মমতা। শক্ পিরিয়ড, তাছাড়া কোথাও কোনো অবস্ট্রাকশন হয়ে থাকলে মোটর নার্ভের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বড়ো ডাক্তার আসুন, তারপর সব বোঝা যাবে।'

অবিশ্বাসের সঙ্গে আশার ছোঁয়াচ মমির গলায়, 'ছেলেমানুষ ভোলাচ্ছ? এত সব বড়ো বড়ো ডাক্তারের কথা কি ভুলে গেছি ভেবেছ? ওসব কথা থাক।'

'থাকে তবে কী, পিক্‌নিক্?' রীনা হাততালি দিয়ে উঠল। বুঝি দিদি ভালো হয়ে যাবে, আজ বেজায় খুশি। 'বারে, পিকনিকের কী হল তোমরা বলছ না যে।'

মমি তৎপর হল। 'পিকনিকে সন্দীপবাবুকে আসতে বোলো সুপ্রিয়া। আমিও বলব।'

'সন্দীপ ছুটিতে।'

মমি দুঃখ করতে লাগল, 'সন্দীপবাবু এলে বেশ মজা হত।'

সুপ্রিয়া চমকে দেয়ার ঢঙে মমিকে নিয়ে পড়ল, 'সন্দীপ তোমাকে কী বলে জানো? প্রথম যখন হাসপাতালে এলে তখনই বলেছিল, আমার নতুন রুগীর সঙ্গে আলাপ হল সিস্টার? মস্ত বড়ো একটি কোশ্চেন মার্ক। জবাব ওর নিজের কাছেও নেই।'

মমির মুখে ছায়া, না একি জ্যোৎস্না নামল? দৃষ্টি দূরে না বুজে আসছে, না অন্য মন? আমি জানি, যেমন এ হতেই হবে, হঠাৎ ওর পা সোজা টান টান হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। নিশ্বাস লম্বা আর ঘন, হাঁটুতে চাপ না দিলে পাদানি থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়বে। আমি জানি মমি কী ভাবছে, কাকে ভাবছে, কী ভাবনা তাকে তাড়না করছে।

সামনে রীনা বসে। শাড়ি এলোমেলো, নতুন কাপড় ধরেছে। কাঁধের ওপর থেকে শাড়ির আঁচল খসছে, ব্লাউজের ভেতর ছোট্ট কুমারী বুক। মমি এবার ওকে দেখল। ভুরু কুঁচকে গেল। প্রশ্ন করল, 'রীনা তোদের অশোক ক্লাবে আসে?'

'রোজই আসে। আমি আজকাল যাই না বলে সেদিন আমায় রাস্তায় ধরেছিল। বার বার যেতে বলল।'

মমি শক্ত হয়ে শাসাল, 'বলতে মানা করলি না ?'

রীনা চোখ বড়ো করে বলল, 'করি নি তো! মানা করে আসব দিদি ?'

হাসি চাপতে মমি আমার দিকে চাইল। অনুসরণ করে সুপ্রিয়ার নজর এখন আমার উপর। বেশ সমারোহ করে বলল, 'কতদিন পর দেখা। কেমন আছেন ? ভালো তো ?'

একটা গাড়ির গর্জনের নীচে আমার উত্তর চাপা পড়তে দিলাম। পেছনের দরজা খুলে সুমন্ত ট্যাক্সি থেকে বেরিয়ে এল। কাজ সারল ড্রাইভারকে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ওখান থেকেই একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। গাঢ় চকোলেট রঙের প্যান্টের উপর শাদা শার্ট, হাতা গুটোনো। আমি আজকাল ওর জামা কাপড় চলন ধরন খুঁটিনাটি সব লক্ষ্য করি। সুরকির রাস্তা ধরে আসতে জুতোর তলা থেকে কয়েকটা নুড়ি এদিক ওদিক ছিটকে পড়ছে। আমি মনে মনে বাজি ধরছি কার পাশে সুমন্ত তবে বসবে। থামল সুপ্রিয়ার অদূরে, বলল, 'অনেকদিন পর দেখা। ভালো তো ?' ওখানেই বসে পড়ল।

আগে দেখি নি, হাসতেই সুপ্রিয়ার ভাঙা একটা দাঁত বেরিয়ে পড়ে। ওর ভাঙা আখরোটের চোখে দেয়ার নেয়ার অনেক। আদুরে গলায় বলছে, 'আপনি তো আর হাসপাতালে আসেন না। দেখা হবে কী করে ?'

'শুধু শুধু গিয়ে কী করবে ?' জবাব দিল মমি। আমি হলে দিতাম, আপনার তাতে কী ?

রীনা খবর দিল, 'সুমন্তদা দিদি সেরে যাবে।'

সুপ্রিয়ার আবার মনে পড়ল। ব্যাগ খুলে চিঠিটা বের করল। সুমন্ত হাতে নিয়েছে, পড়ছে, পড়া শেষে সুমন্ত মমির দিকে চেয়ে হাসছে।

একটা কথা আমি বুঝি না, যা বুঝতেই নিশ্চয় এখানে আমি আসি এমন না। সুমন্ত যে এখানে আসে সে কি অপেক্ষায় ? আমি মমির একান্ত, এর জন্যও অনেকটা আমার আসা। প্রশ্নটা ঘুরিয়ে তোলা যায়, এখনও কি সুমন্ত মমিকে বিয়ে করতে চায় ? আজকাল ওদের রোজই দেখা হয়। আলাদা করে এ-ওকে দেখার আগ্রহ আছে কিনা জানি না। এ ওদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাছাড়াও কিছু আছে। মমির যত্নের দিকে সুমন্তর যথেষ্ট নজর। এ কেবলই ব্যক্তিগত নয়। সুমতি, সুপ্রিয়া, আমরা সবাই একইভাবে জড়িত। রোজই আমি ও

সুমন্ত দুজন, একসঙ্গে ফিরি। রোজই মমির জন্য সুমন্ত এখানে আসে, তাই। আমিও মমির জন্য এখানে আসি, তাই। যখন আমরা একা ফিরি, ওর একটা যন্ত্রণা আমি অনুভব করি। তা যদি মমির জন্য, আমাকে সুমন্ত তা বলতে পারে। যেন আমাকে বলতেও চায়। আমার তো তাই মনে হয়। এ কথাটাও আমি বুঝি না, সুমন্ত যে এখানে আসে সে কী বলার অপেক্ষায়?

রীনা গুছিয়ে বসে গল্প করছে, 'জানো সুমন্তদা, একবার রানাঘাটে গিয়ে আমি জলে ডুবে গিয়েছিলাম। অতুদিরা সব সাঁতার কাটছিল। আমি সিঁড়িতে বসে পা দোলাচ্ছিলাম, একটু দূরেই জলের নীচে চিরল চিরল পাতা, পাশেই হেলেঞ্চার দাম, হাত বাড়িয়ে ওগুলো ধরতে যাব, সোজা ঐ দামের ভেতর! জল খাচ্ছি আর তলিয়ে যাচ্ছি, ঝাঁঝিগুলো পায়ে জড়িয়ে টানছে। উঃ, কী ভীষণ কষ্ট। আমি আর জলে নামছি না!'

সুপ্রিয়া আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করল, 'জলে গিয়েছিলি? কী সাংঘাতিক কথা। এ রোববার পিকনিকে গিয়ে তোকে তবে সাঁতার শেখাতে হয়।' তারপর মুখ ঘুরিয়ে সুমন্তকে দলে টানল, 'কী বলেন?'

'না বাবা, আমি জলে নামছি না।' রীনা বেণী দুলিয়ে বলল।

সুমন্ত চিঠিটা সুপ্রিয়ার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'ডাক্তার সেন কী বলেন? এ ধরনের অপারেশন কি এখানে আগে হয়েছে? সেরে যাওয়ার কতটুকু চান্স? ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি?'

আমি যেন সুমন্তর এ কথাগুলোর অপেক্ষায়ই ছিলাম। সম্ভাবনার কথা। এই যে আমরা এখানে আসি, কথা বলি, চলে যাই, সবই মমিকে ঘিরে। এ কিসের সম্ভাবনায়? মমির, আমাদের? কী আমাদের চান্স? মমি কী ভাবে, কে বলতে পারে? আমার ভাবার কথাই ওঠে না। সুমন্ত বুঝি মনে ভাবে, ফিফটি ফিফটি।

'আমার অপারেশান চাই না,' হুইল চেয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে মমি যেন চূড়ান্ত ঘোষণা করল। রীনাকে বলল, 'শিগগির সুমতিকে ডাক আমি ভেতরে যাব।' রীনা ছুটে চলে গেল।

সুমন্ত উঠে মমির চেয়ার ঘোরাতে গেল। অভ্যেস নেই, হ্যাণ্ডেল এঁকেবেঁকে চাকা চলছে না। ঘোরাতে সময় নিচ্ছে। সুপ্রিয়া উঠে ওর হাত ছাড়িয়ে স্লোপের উপর দিয়ে অনায়াসে চাকা গাড়িটা ভেতরে নিয়ে চলে গেল। স্লোপটা আর একটু ঢালু হলে মমি তুমি নিজেই চেয়ার নিয়ে যেতে পারত।

রাত হয়েছে। আকাশ-ভর্তি তারা, চাঁদ নেই। সুমন্ত পকেট থেকে সিগারেট বের করল, হাত আড়াল করে সিগারেট জ্বালিয়ে কাঠি ফেলে দিয়ে বলল, 'শুনুন।'

বললাম, 'তারা ?'

'না, কদিন আসেন নি।'

'কাজ ছিল, আপনি রোজ এসেছেন ?'

সুমন্ত মাথা নাড়ল, 'আমি অপেক্ষা করেছি।' সিগারেটে টান দিতে আগুনের হলকায় মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিন্দু আর মুহূর্ত। বিদ্যুতে চেনা মানুষকে কেমন অপরিচিত নতুন মনে হয়। চেয়ারে হেলান দিয়ে সুমন্ত যেন দূরে সরে গেল। 'কাল রাত এগারোটায় দেখলাম আপনার ঘরে বাতি জ্বলছে। আপনি রাত জাগেন ?'

সামনে ঝুঁকে পড়তে চাইলাম, 'কাল রাত্তিরে আপনি এসেছিলেন, আমায় ডাকেন নি কেন ?'

'রাত বারোটায় মেয়েদের হোস্টেলে ডাকাডাকি ?'

অন্ধকারেই আমি জানি সুমন্ত আমার চোখে চোখ রেখে হাসল। ভুল ধরলাম, 'বা রে এই যে বললেন এগারোটায় ?'

'ঐ একই কথা হল, ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম আপনার ঘরে আলো জ্বলছে। আপনি জানালায় দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিলেন।'

'আর আপনাকে আমি দেখতে পাই নি ?' আমি আমার কথারই যেন দুঃখ শুনলাম।

সুমন্ত হেসে উঠল, 'কে আর আমার জন্য রাত করে পথ চেয়ে থাকবে বলুন ?'

'জানা থাকলে বসেই না হয় থাকতাম।' কথাটা বলেই ওপাশে চোখ পড়তে থমকে গেলাম।

জ্বলন্ত চোখে নিতাই এদিকে তাকিয়ে আছে। আমি তাকাতেই ও চোখ ফিরিয়ে কাঠের পা দুটো তুলে নিল।

স্প্যান ম্যাগাজিনে একটা ছবি দেখেছিলেম। লম্বা ঘাসের ভেতর প্রায় অদৃশ্য এক জানোয়ার। ছায়ায় আলোয় ডোরাকাটা। কান দুটো খাড়া, সামনে পা মুড়ে গুটিয়ে বসেছে। ঘাসের সঙ্গে একাকার শরীরটায় শুধু ধ্বক ধ্বক করছে দুটো চোখ।

স্ট্র্যাপগুলো উরুতে বেঁধে নিতাই ক্রাচ ভর করে উঠে দাঁড়াল। সুমন্ত বুঝি ওকে

শোনাতেই প্রয়োজনের চেয়ে উঁচুতে জানান ছিল, 'কাল বিকেলে আপনার হোস্টেলে যাব, থাকবেন।'

নিতাই ঠক্ ঠক্ করে পায়ের কাঠ বাজিয়ে গেটের দিকে এগিয়ে যেতে মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা। ওখানে দাঁড়িয়েই কী যেন কথা হল। তারপর ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে মেসোমশায় এসে দাড়ালেন, চারদিকে চেয়ে স্বগতোক্তি করতে লাগলেন, 'ওরা সব গেল কোথায় ?'

আমার কেমন বুক কাঁপছিল। শুনতেই কিন্তু ভাবলাম, কী বোকা ! মেসোমশায় সুমন্তকে তখন জানাচ্ছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার ডাক্তার আসছেন সুমন্ত, শুনেছ? খুব ভরসা দিয়েছেন, অপারেশনে মমি দেখবে ঠিক ভালো হয়ে যাবে।'

মমি, রীনা, সুপ্রিয়া, সব ফিরে আসছে। রীনা একটানা কী সব বলছে আর সুপ্রিয়া মাথা নেড়ে চলেছে। 'না ঠিক শ্বাসকষ্ট না সুপ্রিয়াদি। জলের নীচে তো শ্বাস ফেলতে হয় না। খালি বুকে পিঠে জলের ভীষণ চাপ লাগে, আর সব চেপে আসে। কী রকম যে লাগে!'

মমি জিজ্ঞেস করল, 'তোরা এখানে কী করছিলি অদিতি?' তারপর থেমে যোগ করল, 'নিতাই চলে গেছে ?'

মেসোমশায় তেমনি উত্তেজিত, 'নিতাই তো আমায় বলেই গেল। দেখবে তুমি ঠিক ভালো হয়ে যাবে মমি। নিতাই তো অনেক দেখেছে ওরা জানে।'

সুপ্রিয়া ব্যাগ হাতড়ে আবার চিঠিটা বের করে এনেছে। মেসোমশায়ের হাতে দিয়ে বলল, 'দেখুন মেসোমশায় কী লিখেছে।' অন্ধকারে চিঠিটা খুলে মেসোমশায় কী যেন দেখছেন।

রীনা হাসি চেপে বলল, 'বাবা তুমি কালো বেড়ালের গল্প জানো ? চোখ বেঁধে আঁধার ঘরে কালো বেড়াল খুঁজতে জানো ?'

মেসোমশায় হাসলেন, 'আমাদের তো এখন চোখ বেঁধেই কাজ করতে হবে মা। ভরসা রাখতে হবে।'

'আর তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা বাবা,' রীনা খুব মুখ ছুটিয়েছে। 'বাড়ির কী হল ? পিকনিক এই রোববারে।'

মেসোমশায় পকেট হাতড়াতে লাগলেন, 'ঠিক মনে করেছিস, হরিসাধন চাবি পাঠিয়েছে।'

ব্যাপার দেখে মমি সাহায্যে এল, 'কী খুঁজছ বাবা, তোমার অফিসের কোটের পকেটে হবে।'

'ঠিক বলছিস,' মেসোমশায় ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

রীনা এবার হেসে উঠছিল, মমি ওকে থামিয়ে মেসোমশায়কে থামাল, 'বসল বোসো বাবা। এক্ষুনি তো আমরা যাচ্ছি না। পরে দেখবে।'

চেয়ারে বসে মেসোমশায় বললেন, 'তাহলে এ রোববারই তোমরা ঘুরে এসো, চাবিটা যখন এসেই গেল, কী বল সুমন্ত? গিয়ে দেখ মমির যদি অসুবিধে না হয়, তা হলে মাঝে মাঝে সবাই মিলে যেতে পারবে।'

'আপনিও চলুন না মেসোমশাই,' সুপ্রিয়ার আবদারের সুর।

'না, তোমরা যাও। আমি বাড়িতেই থাকব।'

সুপ্রিয়ার যুক্তি মেলাই: 'শহরের বাইরে খোলা মেলায় আপনার ভালো লাগত মেসোমশাই।'

মেসোমশায় হাসলেন, 'না, তোমরা যাও। ঠাকুরকে নিয়ে যেও।'

যেন এক্ষুনি যাচ্ছি, মমি চাপ দিল, 'না, ঠাকুর বাড়ি থাকবে। নয়তো তোমার অসুবিধে হবে বাবা। আমরা বরং বসন্তকে নিয়ে যাব। বাড়িতে তো সে বসেই থাকত, ও রান্নার সব পারবে।'

সুমন্ত উৎসাহে সায় দিল, 'বসন্ত খুব রাঁধিয়ে। শুধু কপাল খারাপ। গুণ দেখাবার সুযোগ নেই। যাবে শুনলে, লাফিয়ে উঠবে।'

রাত হয়েছে। রমেশ দু-তিনবার এসে ঘুরে গেল একবার বারান্দার চেয়ার কটা তুলে সামনের ঘরে রেখে দিল। মমির খাওয়া হয় নি। সুমন্তকে একবার বারান্দায় দেখা গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম, 'চলি রাত হয়েছে।'

সুপ্রিয়াও পিঠ টান করে উঠে দাঁড়াল। সুমন্তকে বলল, 'যাবেন নাকি?'

সুমন্ত দাঁড়িয়েছে। সবাই দাঁড়িয়ে। সুপ্রিয়া তেমনি মুখর: 'আমার শাড়িটা ধুয়ে রাখবে মমি। রীনা তৈরি থাকিস, তোকে সাঁতার শেখাব।' আমাকে বলল 'আপনিও শাড়ি কাপড় নিয়ে আসবেন কিন্তু।' আবার সুমন্তর দিকে, 'রেডি হয়ে আসবেন, সুমন্ত বাবু। সাঁতারের কম্পিটিশন হবে। রাজি?'

আমার সুপ্রিয়াকে আচ্ছা করে শিখিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল। পথ না পেয়ে দেমাক দেখালাম, 'আমি হারি না।'

সুমন্ত হাসল।

হাসিমুখে সুপ্রিয়া সুমন্তকে জানাল, 'হার জিত জানি না সুমন্তবাবু, জলে ঝাপটাতে আমার খুব ভালো লাগে। আর যা কপালে আছে রোববারে দেখা যাবে।'

আমি সুমন্ত সুপ্রিয়া সুরকির রাস্তা ধরে এগোলাম।

সজনে গাছ থেকে একটা কাক ডানা ঝাপটিয়ে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকগুলো কাক কা কা করে উঠে থেমে গেল। নিঃশব্দ কয়েকটি মুহূর্ত। চেয়ার ঠেলে মেসোমশায় এগোচ্ছেন। এমনি করে সময় কাটে। অন্ধকার লনে মমি ও রীনা।

'দিদি!'

'কী রীনা?' অন্ধকারে অনেকদূর থেকে যেন মমি কথা বলল।

'দিদি এরপর আমি তুমি বাবা, আমরাই শুধু পিকনিকে যাব। আর কাউকে দরকার নেই।'

পেছনে তাকালাম। মমি হাত বাড়িয়ে রীনাকে কাছে টেনে নিচ্ছে!

চোখে রোদ লেগে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের মেঝেয় খাটে রোদ ছড়িয়ে আছে। এই হালকা রোদের দিকে তাকিয়েও বুকের চাপ চাপ ভার কমল না। রীনার ঐ একটি কথা, 'আর কাউকে দরকার নেই।' মমিকে বুড়ি ছুঁয়ে আমরা নিজেদের আসর জমিয়েছি। সত্যিই তো। অনুশোচনা না হলেও বুকের কোথায় কাঁটার খোঁচা লাগছিল। হোস্টেলের দোরে এসে সুমন্ত যখন বলল, 'কী ভাবছেন?' ভালো করে কিছু তাই বলতে পারলাম না। একবার ভাবলাম বলি, 'আমরা কি অন্যায় করছি?' বলি নি। হেসে মাথা নাড়লাম, 'কিছু না তো।' সুমন্ত চোখে মুখে কী খুঁজল, তারপর অন্তরঙ্গ হাত বাড়িয়ে দিল, 'চলি কাল দেখা হবে।'

রোদে হাত রেখে শুয়ে রইলাম। অদ্ভুত! সুমন্ত যখন কাছে থাকে না, মনে হয় ওর সঙ্গে অনেক কথা ছিল, কাছে এলে কথা হারিয়ে যায়। ঠিক যেন বইয়ের মতো। চিরদিন আমি যেন এ জানতাম।

হাতটা তুলে শুঁকলাম। কাল রাত্তিরে ঘুমোবার সময়ও ঐ গন্ধটা ছিল। ওর হাতের গন্ধ। গোল্ডফ্লেকের গন্ধ, মিষ্টি পোড়া পোড়া গন্ধ।

উঠে বসলাম। না, রোজ রোজ মমিদের বাড়ি গিয়ে আর নিজেদের আসর জমাব না। এ প্রতারণার চেয়ে মমি না যাওয়ার অভাব সইতে পারবে। আজ অন্য কোথাও যাব। পুরোনো বইয়ের দোকানে কতদিন যাই না, আগে সপ্তাহে ক-বার করে বইয়ের দোকানে ঘুরতাম। এখন? ছুটি না হতে

নেশার মতো মমিদের বাড়ি ছুটছি। তারপর সুমন্ত আসে। দুজনে ফিরতে ফিরতে সেই অনেক রাত। আজ বইয়ের দোকান ঘুরে, মার চশমা সারাতে যাব। দশ বারোদিন হল, ভাঙা চশমাটা পেয়েছি। এখনো সারাতে দেওয়া হয় নি।

বেরুচ্ছি, সিঁড়িতে বিনতা ছুটছে। দোকানে যাব শুনে বলল, 'প্লিজ আমার জন্য দুটো ব্রা নিয়ে এসো অদিতি। বত্রিশ সাইজ। এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছি। সময় নেই। প্লিজ।'

না বলতে পারলাম না। দুজনে বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়ালাম। বিনতা যাচ্ছে। একা দাঁড়িয়ে কী করব। আমিও ওর সঙ্গে উঠে পড়লাম। মোড় ফিরতেই বুঝলাম ভুল বাস। কোথাও নেমে বিনতার ব্রা কিনে, বৌবাজারে চশমার দোকানে যাব, তারপর কলেজ স্ট্রীটে বইপাড়ায়। মাঝপথে বিনতা নামল। খানিকপর শেয়ালদা পেরিয়ে আমিও।

দোকানে ঢুকতে মাঝবয়সী একটি লোক এগিয়ে এল। ব্রেসিয়ার চাইতে আলমারি খুলে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'সাইজ?' 'বত্রিশ'। আবার খুলতে গিয়ে ফের ফিরে দাঁড়াল, সন্দেহে বলল, 'বত্রিশ না চৌত্রিশ দেব?'

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ওদিকে রাখা তোয়ালের দিকে আঙুল বাড়িয়ে আবার বললাম, 'বত্রিশ সাইজ চাই; আর ঐ তোয়ালে দেখব।' ব্রেসিয়ার ও তোয়ালে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। গায় গায় সব দোকান। সামনে কালচে নীল রঙ একটা শাড়ি ঝুলছে। ভারি সুন্দর তো! ব্যাগে চোখ বুলিয়ে টাকার সংখ্যা দেখে দোকানে ঢুকে পড়লাম। শাড়ি আর কাছাকাছি রঙের একটা ব্লাউজ পিস কিনে নিজেকে শাসালাম আর নয়। এবার বৌবাজার, মার চশমার দোকান। ফ্রেমের স্ক্রু খুলে গেছে। তাও কাচ ভাঙে নি। যত্ন করে তুলোয় জড়িয়ে প্যাকেটে ভরে পাঠিয়েছেন। ঝুলোঝুলি করে একটা বাসে উঠতে পেলাম, ভাগ্য বলতে হবে। ব্রার টানে শাড়ি এলো কিন্তু বিকেলের বাসে জায়গা! দরজার পাশে কোনোক্রমে এক ভদ্রলোকের গায় ঠেস দিয়ে কয়েকটা স্টপ পেরিয়ে এলাম। আর নয়। ঠাস বুনোট ভিড়ের চেয়ে হাঁটতে অনেক আরাম। হাঁটছি। একটা গলি আসতেই কোথা থেকে এক ঝাঁক এলোপাথারি হাওয়া ছুটে এল। বসন্তের হাওয়া। এ সময় কলকাতার গলি, ঘুপচিতে এ সমস্ত হাওয়ার ছুটোছুটি দেখা যায়। পার্কে, ছাদের টবে ফুল ফোটে। কোনো বাগান-ঘেরা বাড়িতে এ সময়ে ফুলের পাশে প্রজাপতিও দেখা যায়। মমিরা আজ নিশ্চয় বাগানে নামে নি।

এখন মেসোমশায় হাঁটতে বেরিয়েছেন, রীণা পড়ছে, মমি সুমন্তর বসার ঘরে। ভালোই হয়েছে। ওদের দুজনের একা থাকা উচিত। ওরা এখন কিছু বলছে।

'শুনুন,' তারা শুনতে নয়, বলেছিল, 'কদিন আসেন নি, শুনুন।' কড়ে আঙুলের পর্বে আমার বুড়ো আঙুল। গুনছি। সুমন্তর হাতের গন্ধটা যেন নাকে এসে লাগল। রোববারের আগে মমিদের বাড়ি আর যাব না, প্রয়োজনে ওর হাসপাতালে গিয়ে দেখা করব। রোজ রোজ বিকেলে আর ওখানে নয়।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম, 'আপনি?'

সুমন্ত হাসিমুখে এগিয়ে এল। 'বাসে যাচ্ছিলাম। ফুটপাতে আপনাকে দেখে যেন তীর দেখতে পেলাম। নেমে পড়েছি। এদিকে কোথায়?'

সব ভুলে গেলাম। ভীষণ খুশি হয়ে আবোল তাবোল বললাম, 'সামনে।'

সুমন্ত হেসে উঠল, 'তাই চলুন, স্রেফ সামনে।' তারপর হাত বাড়াল, 'দিন্।'

কী দেব? আমি বোকার মতো এদিক ওদিক তাকালাম, বাঁ হাতে শাড়ির প্যাকেট, ব্যাগ, বুকের কাছে জড়ো করে ধরে আছি। সুমন্ত ওগুলো দেখিয়ে দিল।

কিছুটা ভার সুমন্তর হাতে ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'বাঁচলাম, নিন।'

হাতে নিয়েই, প্যাকেটগুলোর দিকে তাকিয়ে সুমন্ত চকিতে চোখ সরিয়ে নিল। লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম। বিনতাকে শাপান্ত করলাম। ব্রেসিয়ার কেনার আর দিন পেল না, আর তুলে দিলাম তো দিলাম সেইটেই সুমন্তর হাতে। কী যে এখন করি? একটা বাচ্চা ছেলে যাচ্ছিল, কিছু একটা করতে হবে, দিলাম ওর মাথা নেড়ে। মাথা ঝাঁকানি দিয়ে ছেলেটা সরে গেল।

সুমন্ত হাসি চেপে আমার অবস্থাটা দেখছে, এবার নিজেকে হাসতে দিয়ে হঠাৎ দিল আমার হাত ছুঁয়ে। বলল, 'আমাকে কি লজ্জা না পেলেই নয়?'

রক্তের ঝাপটায় কানে কিছু আর শুনছিলাম না। সমস্ত শরীর আমার কেঁপে ভেঙে যাচ্ছিল। আমি আর দাঁড়িয়ে নাও থাকতে পারতাম। সুমন্তকে আমার হাত ধরে থাকতে দিলাম।

'কী ভাবছেন?' কী রকম জানি গলায় সুমন্ত বলল।

আমাকে কিছু বলতে হবে, বললাম: 'ভেবেছিলাম আপনি মমিদের বাড়ি গিয়েছেন।'

'আমিও ঠিক তাই। ভেবেছিলাম আপনি ওখানে। আপনাকে ফুটপাতে

দেখে তাই সেখানে পৌঁছে গেলাম। হাঁটা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, আপনি।'

কথার মোড় ফেরাতে বললাম, 'আমি এদিকে একটু কাজে এসেছি, মার চশমা সারাতে।'

সুমন্ত যেন আশ্চর্য এক মিল পেয়ে গেল সামান্য এটুকুতেই। 'চশমা সারাবেন? কদিন আগে আমিও দেখুন চশমা করিয়েছি।' সুমন্ত চশমা খুলে আমাকে দেখাল। কালো ফ্রেম, চৌকো ধরনের বেশ বড়ো কাচ। আমাকে বলল, 'ফ্রেমটা ভালো?' ফ্রেমে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'লিন্ডসে স্ট্রীটে এক দোকান থেকে করিয়েছি। মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক দোকানে ছিলেন। ভদ্রলোক বেশ হাসিখুশি ফর্সা গোলগাল। মাইডিয়ার গোছের লোক। ঐ ভদ্রলোকই ফ্রেমটা পছন্দ করে দিয়েছিলেন। তিন চার দিন আগে চশমা আনতে গিয়ে দেখি অন্য এক ভদ্রলোক দোকানে বসে আছেন। চশমা চাইতে বললেন দু-তিন দিন পর যেতে, একটু ব্যস্ত আছেন। আমার ঐ একটিই চশমা। অসুবিধে হচ্ছিল। বললাম, এখানে যে ভদ্রলোক বসেন ওকে বললেই চশমাটা দিয়ে দেবেন।

'ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, মুশকিল যে ওখানেই। ঐ ভদ্রলোক নেই। মারা গেছেন। দোকানটা আমরা কিনেছি। কাগজ পত্তর সব ঠিক করতে কয়েকদিন লাগবে। তাই বলছিলাম দু-চারদিন পর আসবেন।

'কাল চশমা আনতে গিয়েছিলাম, দেখলাম সব ঠিকঠাক করে ভদ্রলোক বসে গেছেন। আমাকে চশমাটা বেশ বের করে দিলেন। কদিন আগে আর কেউ যে এখানে বসতেন তার কোনো চিহ্নই নেই।'

বললাম, 'এমনিই হয়।'

পরে আমি বুঝেছি এমনি কথায় সেই বৌবাজারের পথে এক অসতর্ক মুহূর্তে আমি হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। লিন্ডসে স্ট্রীটের কোনো এক চশমার দোকানের মালিক পাল্টানোর যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল, 'এমনিই হয়' বলে আমি যেন কোনো স্বার্থেই তা নেহাতই সহজ করে নিতে চেয়েছিলাম। আজ আমি ভাবি, সুমন্ত বুঝেছিল, বুঝে আমার মুখ রেখেছিল, যেমন আমার লজ্জা ঢেকেছিল বিনতার ব্রেসিয়ার থেকে।

হাঁটতে হাঁটতে চশমার দোকানে চলে এসেছি। ফ্রেম ঠিক করে বেরিয়ে আসতে খুব সময় নিল না। ফুটপাতে নেমে সুমন্ত ঘড়ি দেখল। 'আর কোনো কাজ নেই?'

'মমিদের বাড়ি যাবেন না?'

'আজ না বলেছিলেন সামনে চলার দিন ? চলুন ঘুরে বেড়াই।' সুমন্ত প্রস্তাব রাখল।

রাতের চৌরঙ্গি আমার কাছেও নতুন। নতুনের স্বাদ কিংবা বেরিয়ে বেড়ানোর চেয়ে আরো বেশিকিছু আমায় বুঝি টানছিল। সুমন্তকে আমার এমন করে পাওয়ার কথা নয় নিশ্চয়ই। গ্র্যাণ্ডের নীচে সুমন্ত থামল, 'এক মিনিট একটা ফোন করে আসছি।'

সারবন্দি আলোর খাঁচায় দেয়ালজোড়া শো-কেইসে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর নানারকম ফুলদানি, ওয়ালপ্লেট, কার্পেট, পেতলের ওপর রঙ-বেরঙের মিনে, বাটিকের কাজ, বাঁকুড়ার ঘোড়া, মোষের দাঁতের সারস, চন্দন কাঠের টেবিল, আইভরির সূর্যমূর্তি, রকমারি শঙ্খ অব্দি। দেখার শেষ নেই। অবশ্যই কেনার সামগ্রী। দেখে দেখে অনেকদূর চলে এলাম। কাঁধে হাত রেখে সুমন্ত কখন স্বস্তিতে বলল, 'আপনি এখানে আর আমি আকাশ পাতাল খুঁজছি।'

ফস করে বললাম, 'ভাগ্যিস পুলিশে খবর দেন নি।

গুরুগম্ভীর হয়ে সুমন্ত সমান তালে বলল, 'খবর দেওয়ায় মুশকিল ছিল। যখন জেরা করত মহিলাটি আপনার কে হন ? বয়স কত ? উচ্চতা কত ? কারো সঙ্গে ইয়ে ছিল কিনা ? কাকে আপনার সন্দেহ হয় ? তখন কী বলতাম ?'

'বললেই হত কারো সঙ্গে ইয়ে থাকলে আর আমি খুঁজছি ?' মনটা ছি ছি করে উঠল। কী যা তা বলছি ! এমন বাচাল তো কখনো ছিলাম না।

সুমন্ত আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, 'জানা রইল।'

আমি তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করলাম। বললাম, 'আজ আর ভিক্টোরিয়া হবে না। যা দেরি করিয়ে দিলেন।'

'দেরি না করলেও হত না। সুব্রত রাস্কেল ফ্যাসাদ বাধিয়েছে। এখন আমি এ ফুটপাত, আপনি ও ফুটপাত। সব কটা দোকান দেখতে দেখতে চলুন, ওষুধের দোকান দেখলেই দাঁড়াবেন।' বলে টেনে আমায় বাঁদিকে একটা গলিতে ঘুরিয়ে নিল।

'হঠাৎ ওষুধ কেন ?'

'সুব্রত হতভাগার জন্য। অসুখ বাধিয়ে বসেছে। দুপুরে ফ্যাক্টরিতে চাকর পাঠিয়েছিল। রাউণ্ডে ছিলাম, দেখা হয় নি। এই ওষুধ দুটো কিনতে বলেছিল। ভাবলাম কাল কিনে দেব। ফোন করতে কাল হল, না আজই চাই। এখন আর কি, দোকান দেখুন।'

দোকান পেলাম আমি।

'এই যে।' একলাফে সুমন্ত দোকানে ঢুকে গেল, বেরিয়ে এল। বলল, 'এবার একটা ট্যাক্সি।'

প্রতিবাদে পা ঠুকলাম, 'আজ আমি চলি।'

ঘাড় নীচু করে সুমন্ত আমার দিকে তাকাল, 'মানে? বেড়াতে বেরিয়েছি আমরা, আপনি বলছেন চলি? চলুন সঙ্গে।'

কৌতুক করে বললাম, 'আরেক রুগীর বাড়ি।'

কথার নিষ্ঠুরতা সুমন্তকে স্পর্শ করল না। রাস্তায় চোখ রেখে ট্যাক্সি খুঁজছে। সায় দিল, 'নিশ্চয়।'

একটা ট্যাক্সি থামিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল।

না, বলে লাভ নেই, উঠে বসলাম। আপত্তির রেশ টানলাম, 'দেরি হয়ে যাবে।'

সুমন্ত সিগারেট বের করল। হাত ঠোঙা করে সিগারেট জ্বালিয়ে বলল, 'দেরি হবে কেন? ওষুধ দিয়েই পালাব।'

'পালানো বুঝি আপনার একটা রোগ?' বলেই বুঝলাম আবার ভুল করেছি।

এবারেও সুমন্ত আমার কথা ধরল না। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'পালাব কেন? বলব, অসুস্থ, বেশি বকর বকর করিস না, শুয়ে থাক, আমরা হাওয়া খেতে যাচ্ছি।'

'উত্তম। বন্ধু কি খুবই অসুস্থ?'

'অধুনা না, তবে একদা ছিল। সত্যি বেচারা অনেকদিন ভুগেছে।' কী ভেবে আবার বলল, 'অসুখ দেখা আমার সহ্য হয় না।'

চমকে দেখলাম অন্যমনস্ক। কিছু ভাবছে। কী সে আমি জানি। জানতে তেমনি আমার অনীহা। মমির বিছানায় পরিত্যক্ত পা দুটো চোখে ভেসে উঠল। পাশাপাশি লম্বা সোজা করে ফেলে রাখা দুটো পা। ঐ পা টেনে কোলের কাছে পিণ্ড করে হাতের চেটোয় শরীরের ভার রেখে উঠে বসে টেনে টেনে নিশ্বাস নেয়। একদিন ভেবেছিলাম এ প্রায়শ্চিত্ত সবার মমির, সুমন্তর, আমার। বললাম, 'যতক্ষণ নিজের ওপর আঘাত না আসে, গায়ে লাগে না। এ ঠিক মনের ব্যাপার না। মিলিয়ে দেখুন না কেন মমিকে আর আমাকে।' বলেই ভেতরে ভেতরে আমি কাঁপতে লাগলাম।

সাইরেন দিয়ে তখন একটা ফায়ার ব্রিগেড ছুটছে। হঠাৎ থামার ধাক্কায়

ট্যাক্সিটা আমাদের একবার গায়ে গায়ে মাখামাখি করে দিল। মুহূর্তে আমরা সরে গেলাম। রাস্তার সব গাড়িগুলো এধার ওধার ছিটকে স্থির হয়ে রইল। দমকল যেতে আবার যে যার জায়গায়। আবার যে যার পথে চলতে শুরু করল। সুমন্ত অনবরত সিগ্রেট টানছে। বাইরে মুখ। আমারও মুখ এখন বাইরে। মুহূর্ত আগে দৈবে যা ঘটল, দূরে দৃষ্টি ফেলে এখন আমি তা শোধন করে নিচ্ছি। কলকাতার আকাশ বিজ্ঞাপনের আলোয় তাজা রক্তের মতো লাল। আমরা দ্বিখণ্ডিত গাড়ির ভেতরে।

সুমন্ত তখন মুখ ফেরাল। আমি মুখ ফিরিয়েছিলাম তার অনেক পরে। আর আমি দেখতে পারছিলাম না বলেই হয়তো সুমন্ত তখন বলতে পারছিল। বলছিল, 'মমির এই অ্যাকসিডেন্টের জন্য হয়তো আমিই দায়ী।'

ঝাঁকুনি খেয়ে যেন সব বন্ধ হয়ে গেল। আমি তেমনি ছিটকে স্থির হয়ে তবু বাইরে চেয়ে রইলাম। আর আমার জোর বিশ্বাস আমার এ নিস্পৃহ ভাবই সুমন্তকে আরও বলতে বাধ্য করাল। সুমন্ত বলল, 'অথচ মমি আমায় এ অপরাধের কিছু শোধ করতে দিল না। ওর ভার নিতে আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কিছুতেই দিল না। মমি আমায় ক্ষমা করতে পারে নি। ও আমায় কিছু বলে না, কিন্তু সব সে মনে করে রেখেছে।'

এখন আমি গাড়ির ভিতরে মুখ এনেছি। তবু কিছু বলছি না। আমারও একটা ক্ষমা করার কথা থাকতে পারে, সে কথা বলা যেত, বলছি না। বলছিল সুমন্ত। বলছিল, 'মমি সেদিন ডায়মণ্ডহারবার যেতে চায় নি। আমি ওকে যেতে জোর করেছিলাম। মমি বলেছিল, অদিতি কতদিনের জন্য বিদেশ চলে যাচ্ছে। অদিতির কাছে আজ না থাকলে কী রকম দেখায়। মমি যেতে চায় নি। আপত্তি করেছিল। বাধা পেয়ে যেন আমি আরও বিগড়ে গেলাম। জোর করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আপনি যাচ্ছেন বলেই জোর করেছিলাম। হয়তো ভাবছেন ডায়মণ্ডহারবারের বাসে যাচ্ছিলাম তাও আবার কেন রিক্সায় উঠে বসলাম। আর এইটেই হয়তো মমি শুয়ে শুয়ে ভাবে। সেদিন আমার কী হয়েছিল আমিও ভাবি।'

এখন মৌনতার অবকাশে ওর মুখ থেকে যেন কারণটা ছিনিয়ে নিতে চাইছিলাম। গতি আর পথের বাতির আঘাতে মুখ তার আলোছায়ায় ক্ষত-বিক্ষত। লজ্জায় টের পেলাম, আর প্রচ্ছন্ন নয় এমন আমার এক মমতার কথা। এমনও ভাবছিলাম, যদি কষ্ট হয় তবে নাইবা বলুক সুমন্ত। নাই বা

মিটুক আমার শোনার আগ্রহ। থাক আমার শোনা। তবু জানতাম শুরু যখন হয়েছে এর শেষ হবেই। সুমন্তকে বলতে হবেই।

সুমন্ত বলছিল, 'ডায়মণ্ডহারবার যাব বলেই বাসে উঠেছিলাম। ডায়মণ্ডহারবার যেতাম কিনা শেষ পর্যন্ত, তা জানা নেই। বড়ো কথা হল মমিকে আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেব। নিয়েছিলাম। আপনি এখানে ছিলেন না। মমির ট্র্যাজেডি ভাবতে এ দু-বছর আপনাকে তাই বারবার আমি ভেবেছি। খানিক একটু পর বাস শহরের বাইরে চলে এল। খোলা রাস্তা। বাস ছুটছে। একটা সাইকেল রিক্সাও পাশাপাশি ছুটছে। বাসের সবাই মুখ বাড়িয়ে রিক্সাটাকে দেখতে লাগল। জোরে ছুটতে অনেক রকম উৎসাহ দিতে লাগল। রিক্সাটা ছুটছে, মমির হাত আমার হাতে, চেপে ধরে আছি। লড়াইয়ের নেশা তখন তার আঙুলে নিশ্‌পিশ্‌ করছে। রিক্সাটা পাশেই। যেন আমাদের নিয়েই ছুটছে। হঠাৎ আমার কী খেয়াল হল, একটা স্টপে বাস থামতে মমিকে টেনে বাস থেকে নামিয়ে নিলাম, ছুটলাম, ছুটে গিয়ে রিক্সায় উঠে বসলাম।

'বোকামিরও সীমা আছে.' জড়ানো গলায় সুমন্ত শব্দ করল। অনেকক্ষণ নিবে যাওয়া সিগ্রেটটা বাইরে ছুঁড়ে দিল। কথায় অনুশোচনা স্পষ্ট, 'আমার বোকামির ঋণ মমিকে আজ শুধতে হচ্ছে। দেখুন না আমি এখন বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর মমি!'

সুমন্ত পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুঁজল। খালি প্যাকেটটা আগেই ফেলে দিয়েছিল।

'তারপর যা হয়। রিক্সাওয়ালার রোখ চেপে গিয়েছিল। লম্বা হয়ে, মাথা নীচু করে, শরীরটা হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে পাগলের মতো ছুটতে লাগল। একটু দূরে রাস্তা হঠাৎ বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে এসে যে কী হয়ে গেল। রিক্সাটা ঝাঁ করে ঘুরে গেল। রিক্সাওয়ালা সময় বুঝে লাফিয়ে পড়েছিল।'

আমি এখন ওকে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। বলতে গিয়ে সুমন্ত ট্যাক্সির দরজার হ্যাণ্ডেলটা চেপে ধরল। চাপে দরজাটা খুলে গিয়েছিল। ধাক্কা দিয়ে বন্ধ করে দিল।

'আমিও লাফিয়েছিলুম। রিক্সায় মমি একা। খালি রিক্সাটা ওকে নিয়ে রাস্তার ঢালু দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে একটা কংক্রিটের থামে উল্‌টিয়ে গেল। ভয়ে হাত দিয়ে চোখ ঢাকলাম। যেন দেখলাম রক্তে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। লাল কাল্‌চে চাপচাপ রক্ত। ঢেউয়ে ঢেউয়ে এসে আমার নাকে মুখে ঢুকছে।'

হাসি কত কাজে লাগে তার একটা হিসেব করতে হবে। একদা আনন্দই ছিল হাসির বড়ো ভূমিকা। আমরা তা হারিয়েছি। তা বলে হাসি মরে না।

মুখ পাল্টে হাসি অন্য কাজ করে। সুমন্ত বুঝি এক অপরাধ রাখছিল, কি ঢাকছিল। এতক্ষণে আমার দিকে ফিরে তেমনি বেমানান হাসছে। তারপর হঠাৎ যেন মুখের ওপর হাসিটা পা দিয়ে মাড়িয়ে থেঁতলে পিষে দিল। যেন কার ওপর রাগে বলে উঠল, 'আমি তখন ছুটতে শুরু করলাম।'

চুপচাপ। আমি সুমন্তর লজ্জা জেনেছি। ডাকলাম, 'সুমন্ত।'

আমার দিকে তাকাল, আরও অন্য এক হাসি হাসল। বলল, 'কে একজন আমায় ধরে থামিয়ে দিয়েছিল। দেখতে পেলাম মমিকে ওরাই তুলে আনল। রাস্তার ধারে ওকে শুইয়ে দিল। একফোঁটা রক্তও ওর শরীরের কোথাও ছিল না কোথাও না। এক ফোঁটা রক্ত না। শুধু পিঠটা দুমড়ানো, শরীর টান, নড়ছে না। একেবারে স্থির। শুধু চোখ দুটো খোলা। ও পলকহীন চোখে আমার দিকে চেয়ে ছিল।'

এখন সুমন্তর কপাল, গলা আর হয়তো চোখের পাতায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। চশমা খুলে চোখ মুছে চশমা পরল না। হাতে রেখে দিল। বলল, 'মমির সে চোখ আমি কোনোদিনই ভুলব না।' চুপ করে বসে রইলাম। হু হু করে রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে। ওকে আমি আর দেখতে চাইছি না। এখন দেখায় লজ্জা। আর দেখছি না বলেই বুঝি এমন এক কথা বলতে পেরেছিলাম। নিজের কথা নয়। সান্ত্বনা দিতে মার কথা বলেছিলাম, 'এই ওর ভাগ্যে ছিল।'

সুমন্ত হেসে উঠল। এই প্রতারণা দিয়েই নিজেকে বাঁচিয়েছি।

চারটেয় বাড়ি ফেরা, গা ধোয়া সব হয়ে গেল। চা খাব বলে মোক্ষদাকে ডাকতে যাব তার আগেই নীচ থেকে মোক্ষদার গলা পাওয়া গেল, 'বলি, ওখানে কেন? ঘরে এসো, ঘরে এসে বোসো, চেয়ারে বোসো।'

এসে গেছে কি? তাড়াহুড়ো করে চিরুনি চালাতে লাগলাম। একটু পরে চা হাতে মোক্ষদা এল। চা হাত বদলাতে বললাম, 'কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল?'

মেঝেতে উবু হয়ে বসে মোক্ষদা কপাল থাপড়াল। 'হা কপাল! আমার আর কথাবার্তা। এমনিতেই কান ঝালাপালা। কলতলায় দেখ গিয়ে মহোচ্ছব। দুয়ো দুয়ো করলেই কি যায়? গেরাহ্যিই নেই। ঘাড় কাত করে চায় আর কা কা। বলি, মুখপোড়ার দল আমার সঙ্গে তামাশা!' মোক্ষদা গজগজ করতে লাগল।

এতক্ষণে পরিষ্কার হল, 'ওহ্, কাকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল ?'

মোক্ষদার গজগজানি বন্ধ। হাঁ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বলল, 'বড়ো সাজগোজ করে কোথায় যাচ্ছ দিদিমণি ?'

আয়নায় চেয়ে খুশি হয়ে বললাম, 'সাজ কোথায় দেখলে। এ আটপৌরে শাড়িতেই সাজ হল ?'

চোখ না ফিরিয়ে মোক্ষদা বলল, 'দেখ দিকিনি একটুখানি ভোল ফিরিয়েছ কেমন বাহার খুলেছে।'

চুল বাঁধা হয়ে গিয়েছিল, মুখে ত্রাসন্ ঘষতে ঘষতে ঘুরে দাঁড়ালাম, 'তাই বুঝি।' তারপর ফিরে আয়নার কাছে মুখ নিয়ে ঠোঁটে হাল্কা লিপস্টিক, আইব্রো পেন্সিল ভুরুতে চোখের পাতায় বুলিয়ে নিজেকে ভালো করে দেখে বললাম, 'ওঠো মোক্ষদা, আমি বেরুব।'

হাতে ভর দিয়ে অতি কষ্টে মোক্ষদা উঠে দাঁড়াল। 'একবার বসলে আর উঠতে পারি না দিদিমণি। গতরে বিশ্বেস নেই। বসালে তো শুয়ে পড়ল। শরীলই বল মনই বল কাউকেই বিশ্বাস নেই।'

ব্যাগ হাতে নিয়ে তাড়া দিলাম, 'তা ঠিকই বলেছ মোক্ষদা। আপাতত বিশ্বাসকে ছেড়ে গতর নিয়ে নীচে চলো তো।'

ঠিক পাঁচটায় সুমন্ত এল। কাল চলে আসতে শোক করছিল, 'যা তা বলে আপনার সন্ধেটা আজ মাটি করে দিলাম। না বেড়ানো, না কিছু। যদি দেবী দয়া করেন কাল প্রায়শ্চিত্ত করি। কলকাতাকে লাল করি। শহর চষি।'

দেবী নই তবু দেবী ভাবে বললাম, 'তথাস্তু।' কথা রইল আজ বেরুব।

গেট থেকে ওয়েটিং রুমের জানালায় আমায় দেখে সম্ভাষণ, 'তৈরি ?'

কাছে আসতে বললাম, 'চা খাবেন ?'

'অসুবিধে হবে না ?'

'যদি হয় তবে জিৎ আপনারই।'

মোক্ষদাকে বলা ছিল, চা নিয়ে এল।

বেরিয়ে সুমন্ত বলল, 'চলুন খিদিরপুর যাই।'

এই রে। আবার সেই আদি কায়দা। সন্দিগ্ধ চোখে তাকালাম, 'রোজই কি প্ল্যান করা হয় ?'

সুমন্ত হো হো করে হেসে উঠল। 'ঘাবড়ে গেলেন তো ? ভাবছেন এত জায়গা থাকতে এক খিদিরপুর কেন ? নিশ্চয় ফিকির আছে। তা ফিকির আছে।

আর যা আছে তার নাম ফাঁপর। যদি যান তো দয়া করে যাবেন। উপরি যদি ভালো লাগে, জাহাজের মাস্তুল দেখবেন। না লাগলে বলুন কী মাশুল দেব?'

বলার কায়দায় মজা। বললাম, 'কথার মাশুল আগেই পেয়ে গেছি। চলুন।'

বেহালায় এক বন্ধুর বাড়ি যেতে অনেকদিন খিদিরপুর পেরিয়েছি। জানতাম খিদিরপুর শুধু পেরুতেই হয়। আজ সুমন্ত বলল, আর খিদিরপুর কলকাতায় এল। যেতেও হল।

মেয়ে হয়ে জন্মেছি, বাসে জায়গা পেয়ে গেলাম। সুমন্ত রড ধরে দাঁড়িয়ে। খানিকপর ভিড়ের চাপে কোথায় হারিয়ে গেল। রাস্তা ফুরল। নেমে একটু এগিয়ে সুমন্ত দেখাল, 'ঐ আমাদের কারখানা, যাবেন?' তারপর হেসে উঠল, 'আজ যা একখানা কাজ করেছি!' পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করে দেখাল, 'দেখুন' উত্তর না পেয়ে বলল, 'জিজ্ঞেস করতে হয় কোথাকার চাবি? উত্তর হল, কারখানার। চলুন চাবিটা দিয়ে আসি।'

হেসে উঠলাম, 'মাস্তুল দেখাচ্ছেন?'

সুমন্ত আমার হাসির প্রত্যুত্তর দিল, 'আপনার ওখানে ভালো লাগবে। সুন্দর বাগান আছে।' তারপর নির্বিকার অভিযোগ, 'দোষ আপনারই। বাঁচি-কি-মরি, আপিস পালালে পকেটে চাবি চলে আসতে বাধ্য।'

ওয়াগন, ক্রেন, গুদাম, বস্তির ভিড়ে কারখানা। ভিতরে ঢুকে তবু চোখ জুড়িয়ে গেল। ছককাটা রাস্তার দুধারে লাল গোলাপি শাদা বেগুনি ফুলের প্রদর্শনী। এগিয়ে ডান দিকে মস্ত লন। লনের মুখোমুখি সুঠাম কয়েকটা কেবিন। ভেতরের দিকে কারখানার বড়ো বড়ো শেড। চিমনির ধোঁয়া মেশিনের আওয়াজ সব সেদিকে। লনের মাঝে গোল করে ক্রিসানথিমাম, শীত চলে যাচ্ছে, এদেরও শুকনো মুখ। ওখানে পৌঁছে দাঁড়াতে বলে সুমন্ত ভিতরে চলে গেল। অফিস ছুটি হয়ে গেছে, তাই এদিকটায় এখন লোকজন বিশেষ কেউ নেই। দূরে গেটে দারোয়ানকে দেখা যাচ্ছে। ভেতরে শেডের দিকে শুধু লোকজনের সাড়া পাচ্ছি, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এটাকেই বলে বোধহয় থার্ড শিফ্‌ট।

যোগ নেই, তবু অন্য একটি সন্ধ্যার কথা মনে পড়ল। নতুন ক্লাশ শুরু হয়েছে, বই কেনার মরশুম। বাবা আমায় নিলেন না, কেননা বেজায় ভিড়। বায়না করেও বাবার মন গলানো গেল না। তাই চলে যেতে, পেছন পেছন চলেছি। বাবা বইয়ের দোকানে, আমি দূরে, আলো বাঁচিয়ে, একলা, অন্ধকারে অনেকক্ষণ চলে গেছে, বাবাকে আর দেখছি না। ল্যাম্প পোস্টের নীচ থেকে একটা লোক

.এসে আমার পাশে দাঁড়াল। কেউ আসতে, সরে গেল, চলে যেতে আবার এল। কী যেন এবার বলল, আর তখন আমার কী যে হল, হঠাৎ আমি ছুটতে লাগলাম। কেন যে ছুটেছিলাম ঠিক জানি না, তবু বুঝেছিলাম ছুটতে হবে।

আচমকা কেবিন গুলোর পেছন থেকে ঠক ঠক করে নিতাই বেরিয়ে এল। ঘর-মুখো যাচ্ছিল, ঈশ্বর জানেন কেন ফিরল, ফিরেই আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খট করে কংক্রিটে লাঠি থমকে দাঁড়াল। ওকে এখানে দেখব ভাবতে পারি নি। ভাবা উচিত ছিল। ঠাণ্ডা একটা সরীসৃপ আমার পিঠ বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। আমি আড়ষ্ট, একই জায়গায় একই ভাবে দাঁড়িয়ে। নিতাইও হতভম্ব। ওর পাথুরে মুখ আস্তে আস্তে জীবন্ত হয়ে উঠল। জ্বালাধরা দুটো চোখ জ্বলছে। সাঁড়াশির মতো দু-হাতে ক্রাচটাকে চেপে সামনে এগুচ্ছে।

শাড়ির আঁচল দিয়ে গলা ঢেকে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম! গাছের ওপাশে সূর্য যেতে অন্ধকার হয়ে গেল। আমি এদিক ওদিক তাকালাম। কাছাকাছি কেউ নেই। দারোয়ান অনেক দূরে। নিতাই এগিয়ে আসছে। আমি একই জায়গায়, একই ভাবে। নিতাই সামনে এসে দাঁড়াল, ক্রাচটাকে দাঁড় করিয়ে বলল, 'হাওয়া খেতে এলেন ?'

এতখানি স্পর্ধা! ওর কথার জবাব দেবার প্রবৃত্তি আমার কোনোদিনই হয় নি। আর আজ আমাকে করতে হবে জবাবদিহি ? সমস্ত শরীর আমার কাঁপছে। হাতের মুঠি শক্ত করে রইলাম। সময়ের হিসেব নেই। যুগ যায় বলে একটা উক্তি আছে। জানা হল।

এক সময় ভিতর থেকে সুমন্ত বেরিয়ে এল। নিতাইকে দেখে ভ্রূকুটি করল, 'এখানে কী করছ ?'

এগিয়ে যাওয়ার জন্য নিতাই ক্রাচটাকে প্রস্তুত করল। কাঠের ঠ্যাং দুটো লাগিয়ে থেমে গিয়ে বাঁকা করে হাসল, 'দিদিমণিকে বাগান দেখাতে নিয়ে এলেন ?'

সুমন্ত আমাকে কৈফিয়ত দিচ্ছিল, 'দেরি করে ফেললাম, ফুল দেখলেন ? ভালো লাগল ?'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আঁচল পেছনে ঠেলে চলতে শুরু করলাম। জানি আমার পিঠে তখন দুটো চোখ পুড়ছিল।

বাইরে বেরুতেই ট্যাক্সি মিলল। একপাশে হেলান দিয়ে বসলাম। অবসাদে নয়, শরীর তবু ভেঙে যাচ্ছিল। চোখ বুজে আছি। ডক, গঙ্গার ধার, ইডেন গার্ডেন ছাড়িয়ে কখন যে চৌরঙ্গি চলে এলাম। সারাক্ষণ সেই চোখ দুটোও

যেন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। পেছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ঐ চোখ দুটোই খালি দেখছি। স্প্যান ম্যাগাজিনের ঐ ছবিটা : লম্বা ঘাসের ভিতর প্রায় অদৃশ্য একটা শরীর, ডোরাকাটা, কান দুটো খাড়া, সামনের পা মুড়ে গুটিয়ে বসেছে। ঘাসের ভিতর প্রায় অদৃশ্য শরীরটায় শুধু ধ্বক ধ্বক করছে দুটো চোখ।

আমি ঐ লোকটাকে ঘৃণা করি।

আমার কাঁধে হাত রেখে সুমন্ত বলল, 'ঘুমুচ্ছিলেন? পাশ ফিরলেই যুবক। এর মানে বোঝেন?' কথার খেলা আমার তখন ভালো লাগছিল না। রসিকতায় কান না দিয়ে মাথা নাড়লাম, 'কোথাও বসি চলুন।'

সুমন্ত কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পার্ক স্ট্রীট এসে গেছে। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল।

ভালোই হল। এমনি বসে থাকতে আর পারছিলাম না। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। 'মোনালিসা' এখানকার এক খাবার ঘরের নাম। দোর গোড়ায় লাল কালো পোশাকে দ্বাররক্ষী দাঁড়িয়ে। ঢুকতেই ঠাণ্ডা হাওয়া আমায় খানিকটা জুড়িয়ে দিল। নীচু সিলিং; ঝুলন্ত স্বল্প আলো, একটানা ঝম ঝম বাজনার আওয়াজ, অনেক লোকের হাসি, গান, কথা, এতক্ষণের কয়লা, কংক্রিট আর জ্বলন্ত অঙ্গারের দু-চোখের হাত থেকে আমায় বাঁচাল। ছোট্ট একটু নাচের জায়গা। তার পাশ দিয়ে কার্পেট মোড়া সিঁড়ি ভেঙে বড়ো থামের আড়ালে খানিকটা ওপরে দুজনের ছোটো একটু জায়গা করে বসলাম। সুমন্ত ভিতরে গেল। আসা আর যাওয়া, এখানে টেবিলের চাদর কেবল পাল্টেই যাচ্ছে, সামনে সব জোড়ায় জোড়ায় বসে আর আমি টেবিলে কনুই রেখে একপাশ হয়ে দেখছি। মেয়েটি হালকা হাতে কাঁটায় এক টুকরো মাংস গেঁথে ছোট্ট হাঁ করে মুখে ফেলে বাজনার তালে তালে পা নাচাচ্ছে। গলার উঁচু হাড়ের নীচে আলগা ব্লাউজের তলায় বুকের দোলানি চোখে পড়ে। মেয়েটি দুলছে। ঝম ঝম বাজনা বাজছে। আমার শরীরে মনে সুর আসছে। বাজনার তালে তালে পা ঠুকছি। সবাই পা ঠুকছে। শরীর দোলাচ্ছে। সবাই কাঁপছে। মেয়েটি ত্রস্ত হাতে ব্যাগ খুলে আয়নায় চোখ রেখে সন্তর্পণে ঠোঁটের পাশ মুছে দাঁড়াল। পুরুষটিও উঠে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটির পিঠে হাত রেখে নাচের ফ্লোরে গিয়ে নামল। আরও অনেকে।

রুমালে মুখ মুছতে মুছতে সুমন্ত এসে দাঁড়াল। সিগ্রেটের প্যাকেট খুলে চেয়ার টেনে বসে বুঝি আঘাত করল, 'মেজাজ ফিরল?'

বললাম, 'দেখছি।'

কথা ঘোরাল, 'কী দেখলেন?'

আমিও ঘোরালাম, 'ভয়। ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়।'

বলতে গিয়ে মনে হল আমার যেন সত্যি ভয় করছে। সুমন্ত ফ্লোরে তাকাল। জোরে জোরে বাজনা বাজছে। সবাই বিচিত্র ভাবে আপন ভঙ্গিতে ঘুরছে।

ঠাট্টায় বলল, 'যা মরিয়া, তাই মারাত্মক, ভয়ের কথাই বটে।'

ফ্লোরে তাকিয়ে আমি আবার জোর দিলাম, 'আমার আজ কেমন মনে হচ্ছে এ সবই ভয়ের প্রকাশ।'

সুমন্ত আমার মুখ নিয়ে এবার চিন্তা করছে। চোখে চোখ পড়তে বলল, 'আজ আপনি বড্ড আপসেট্ হয়ে গিয়েছেন, কারখানায় ঐ খোঁড়াটাকে দেখার পর থেকেই আমি লক্ষ করছি। এতটুকুতেই বিচলিত হলে হয়? একটা খোঁড়া ফ্রাসট্রেটেড লোক, ওকে এত দাম দেবার কী আছে?'

মমি যে সব জানবে একথা স্মরণ করানোর মতো অহংকারের অভাব আমার নেই। মেনু-বুকটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে লাগলাম। একসময় সমন্ত হাত থেকে মেনুটা টেনে নিল। একটু দেখে বলল, 'কী খাবেন? তন্দুরি চিকেন ভালোবাসেন নিশ্চয়। অন্য ভালোবাসার কথা তো আর জিজ্ঞেস করতে নেই। গোড়ায় গলদ হয়ে যাবে।'

এবার সহজ হব বলেই বললাম, 'আপনার অন্তিমটা শুনি। ডেসার্ট কী নেবেন?'

'টুটি ফুটি আইসক্রীম'

হাসলাম, 'এই আপনার ভালোবাসা?'

সুমন্ত তক্ষুনি জবাব দিল, 'নিশ্চয়। দুজনের ভালোবাসাই দেখতে হবে তো।'

ঝুলন্ত বাতিটা দুলছে। আমার বুকের ভিতরও দুলে উঠল।

সুমন্ত ঝুঁকে এল, 'আপনি নাচ জানেন?'

নাচ? বাংলাদেশের গরিবের মেয়ে আমি জানব নাচ? তবে বাইরে বিভুঁয়ে জোর জবরদস্তিতে সেই এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে হাত পা নাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম। এমনি এক সন্ধ্যা, এমনি এক ঝুলানো বাতির নীচে বসে ভদ্রলোক নীল নীল চোখ তুলে বলেছিলেন, 'অড়িটি নাচ জানো না এ আবার কী? বাজনার সঙ্গে আমার সঙ্গে পা ফেলে ফেলে এগুবে পিছুবে, এই তো নাচ।'

বলে বিরাট থাবায় হিড় হিড় করে টেনে নাচতে নামিয়েছিল। আমি না একদিন ফুলে পা ফেলতাম! বড়াই করছি না, বড়াই করার মুখও নেই, কেন না যে কথা তক্ষুনি মনে এল, কেন না ঝট্ করে অন্য একটি ছবি মনে জেগে উঠল : সুইজারল্যাণ্ডের শ্যালেতে একরাত। শীতে আর রক্তে কেমন জমছিল, দোলা খাচ্ছিল। সুমন্তকে বললাম, 'একদিন কী নাচ নেচেছিলাম জানি না, তবে বাঁদরও নাচে, ঐ সান্ত্বনা। ভদ্রলোকের সঙ্গে কদিন খুব লাফিয়েছিলাম।'

সুমন্ত লাফ দিয়ে উঠল, 'তাতেই হবে। লাফালেই লাভ।'

আমারই মন বিশ্রী। শেষ কথাটা বিলিতি করে শুনলাম।

ছোটো জায়গাটা ঠাসাঠাসি ভর্তি। বাঁচা গেছে। ভিড়ের চাপে সুমন্ত আমায় আর আলাদা করে দেখতে পাবে না। ওর হাত আমার পিঠ জড়িয়ে, ব্লাউজের ওপর দিয়ে বুকের পাশে ওর আঙুলের ছোঁয়া। সুমন্তর পায়ে পা জড়িয়ে আমি এগিয়ে চললাম। বাজনা বাজছে।

১১

কথা হয়েছে সাড়ে-সাত থেকে আটটার ভেতর মমিরা আমায় তুলে নেবে। নিজেকে তুললাম অনেক আগে। জেগে দেখি রাত চারটে। ঢের সময় আছে। পাতলা চাদর মুড়ে পাশ ফিরে শুলাম। জানালার ওপারে সবুজ পাতার ভেতর আকাশের রং বদলাচ্ছে। নীল রাত্রি গলে গলে স্বচ্ছ আভার জল ছিটিয়ে আকাশ কেমন ছড়ানো উঠান। খুব মোলায়েম ভাবে মাদার গাছের পাতা নড়ছে। কাক চড়ুই এখনও পড়ে নি। ক্বচিৎ কয়েকটা পাতা নড়ে এক একটা পাখি এ ডাল থেকে ও ডালে ওড়ে, গা ঝাড়া দেয়, সরু গলায় চিক্‌চিক্ করে। ঐ অব্দি। ক্রমে ওরা জাগছে। ভেতরটাও ফর্সা হচ্ছে। হেঁয়ালির তবু শেষ নেই। ওদিকের চেয়ারে ছাড়া কাপড়টা দেখে মনে হচ্ছে কেউ বসে, এদিকে আমাকে দেখছে। উঠে পড়লাম। জানতাম,. তবু চেয়ারের পাশে গিয়ে হাত বাড়ালাম। কেউ না।

একা ঘর কেমন হা হা। শূন্য। কেমন নিঃসঙ্গ ফাঁকা। গা ঝাড়া দিয়ে হাসলাম। শেষ রাত্রে জাগলে হয়তো এমনি হয়। এমনি হঠাৎ মন খারাপ, একা একা। কাপড়টা ভাঁজ করে রেখে দরজা খুলে বাথরুমে চলে গেলাম। বেরিয়ে ঘরে ঢুকছি মোক্ষদার তলব, 'বাবু এসেছেন।'

বিরক্তিকর। তাড়াহুড়োর মধ্যে ঠিক একটা ফ্যাচাং বাধাবে। নির্ঘাৎ মার কর্ম। কাল বাড়ি যাই নি তাই সাতসকালে মার দূত হাজির। চিরুনিটাই বা গেল কোথায়? বই ঝাঁকিয়ে, টেবিল হাতড়ে, সব উল্টেপাল্টে শেষে মোক্ষদার স্মরণ নিলাম, 'মোক্ষদা, একটু খুঁজে দেখ তো, আমি নীচটা ঘুরে আসছি।'

আঁচল তুলে, সিঁড়ি ভেঙে, একছুটে ওয়েটিং রুমে ঢুকেই বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচি। সুমন্ত বসে কাগজ পড়ছে। রোববারের কাগজ এ ঘরে থাকে। আমাদের সুপারিন্টেনডেন্ট প্রতিমাদি এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন। রোববার কাগজ ভিজিটিং রুমে থাকবে। পুরনো কোনো ম্যাগাজিনও টেবিলে থাকে। জানালা দরজা খোলা। টান করে পর্দা টানা। ঘর সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে। আমাদের হোস্টেল রোববারে হোস্টেস।

প্রতিমাদির এই আমিরি ঘরে ভিজে কাকের মূর্তি নিয়ে আমি বিমূঢ়তা ঝাড়ছিলাম। আধ জড়ানো শাড়ি, ভিজে চুল চিপসে লেপ্টে আছে, হাঁ করা কপাল, তেল চিট্‌চিটে মুখ সব নিয়ে আমি এমন বেসামাল যে কাগজ থেকে মুখ তুলে সুমন্ত আমায় এক নজর দেখে নিজেও অপ্রস্তুত।

লজ্জায় পরে বলল, 'অসুবিধে করলাম?'

ততক্ষণে আমি খানিকটা সামলে নিয়েছি। বললাম, 'আপনি? আমি ভেবেছিলাম রানাঘাটের কেউ হবে।'

'হতাশ হলেন তো?' সুমন্ত এবার হেসে কাগজটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, 'চট করে তৈরি হয়ে নিন। আমার সঙ্গে এক্ষুনি বেরুতে হবে।'

সুমন্ত কি ভুলে গেছে মমিরা আসছে, আমায় ওরা এখান থেকে তুলে নেবে? আজ পিক্‌নিক্। সে কথা ওকে জানালাম।

সুমন্ত নির্বিকার, 'জানি, তবু ধরতে এলাম। আপনাকে আমার ভয়ানক দরকার। বসন্ত এক লম্বা ফর্দ পেশ করেছে। আজ সে একহাত দেখাবেই। মালমশলার আমি কী বুঝি? আপনি না হলে কে আমায় বাঁচাবে?' শেষ কথাটায় আমার উপর এমন নির্ভর। বুক মোচড় দিয়ে উঠল। ছুটতে ছুটতে ওপরে এলাম, 'মোক্ষদা পেয়েছ?'

'পাব না মানে? মোক্ষদা তোমার সব জানে কে কী করে, কে কী ভাবে। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া, চিরুনি আর কোন ছার!'

মরি বাঁচি করে চুল আঁচড়াতে লাগলাম। ব্লাউজটা যদি কেউ একটু ইস্ত্রি করে দিত? ভাগ্য সুপ্রসন্ন। এই সকালেই অরুণা এসে চোখ রগড়াচ্ছে। হাত ধরে বললাম, 'আমার ব্লাউজটা ইস্ত্রি করে দাও না ভাই।'

ব্লাউজ হাতে সুযোগ নিল, 'কোথাও যাচ্ছ নাকি? নীচে দেখলাম কে বসে আছে।' চোখ রগড়াচ্ছিল, এবার চোখ টিপল, 'বলি কে? মিগল না কি?'

'পরে বলব, তুমি আমার ব্লাউজটা তাড়াতাড়ি ইস্ত্রি করে দাও।'

চুলে যে কী জট। দুজনে রাস্তায় যখন বেরিয়ে এলাম তখন রাস্তা নাইছে। ভিজে গলি পেরিয়ে, শাড়ি বাঁচিয়ে, চৌমাথায় এসে দাঁড়ালাম। ট্যাক্সি নেই, ট্রাম ধরলাম। ভিতরটা ফাঁকা। পেস্তা বাদাম জাফরান আর আর সব মোগলাই চিজ্ কিনে মমিদের বাড়ি পৌঁছেছি, ওদের বারান্দায় তখন থার্মফ্লাস্ক টিফিন কেরিয়ার জলের বোতল সব সাজানো হয়ে গেছে।

ঢুকে সোজা মমির ঘরে। সুমতি ওকে তৈরি করে দিচ্ছিল। কথা মাফিক আমাকে এখন আশা করার নয়। দেখে অবাক। খুশিও হল, 'এসে গেছিস? হোস্টেল থেকে তোকে তুলব ভেবেছিলাম।' ড্রেসিং টেবিল মুখোমুখি। চুল ঠিক করতে করতে বললাম, 'সুমন্ত এসে ধরল। বসন্তের কী সব কেনাকাটার ছিল। মেয়েলি জিনিস, মশলা। তাই সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। দেখিস বসন্ত তার হাতযশ আজ এক চোট দেখাব।' বলে ওর মুখোমুখি ফিরলাম। হাত দুটো দুদিকে ফেলে মমি আমাকে দেখছে। একটা পা দুমড়ে কোলে গোঁজা, অন্য পাটা ঝুলন্ত সোজা খাটের ধার ধরে। পাজামা তোলা। শুকনো পা। নীল নীল শিরা গালের পাশে, ঠোঁটের কাছে দপদপ করে কাঁপছে। মুখ ফ্যাকাশে!

'কী হল, মমি?' চিরুনি ফেলে ছুটে গেলাম।

সুমতি কাজ ছেড়ে আমার কথা শুনছিল। আমি ছুটতে সংবিৎ এল। হকচকিয়ে অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে খুকু?'

মমি সামলে নিয়েছে। হাসি দিয়ে ঢাকল, 'ও কিছু না, তোকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, তাই দেখছিলাম।'

'বাবা! যা ভয় খেয়ে গিয়েছিলাম।' চিরুনি খাটের নীচ থেকে তুলে ড্রেসিং টেবিলে রাখলাম।

সুমতি আমাকে একবার দেখে নিল। ওর শুকনো মুখে খট খটে চোখে কী জানি জিজ্ঞাসা।

হুইল চেয়ারে ঠিকঠাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'সুমন্তকে তোর কেমন লাগে অদিতি?'

যদি ওর চোখাচোখি চাই, ধরা পড়ব। যদি কথা এড়াই, বুঝবে। ছোট্ট করে বললাম, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

নিচু হয়ে পা ঢেকে মমি বলল, 'এত কথাবার্তা দেখাশুনা হল, নিশ্চয় একটা মতামত হয়েছে। তাই জানতে ইচ্ছে করে।'

'তুই যাকে পছন্দ করেছিস তাকে খারাপ লাগার কথা কি?' চোখ এবার সোজা করলাম। খুব খোলাখুলি যেন সব।

মমি তেরছা করে চেয়ে হাসল। 'তুই বেশ ঘুরিয়ে কথা বলতে শিখেছিস, অদিতি। আরও অনেক কিছু। তাক লাগার মতো সাজতেও শিখেছিস। এটা কী শাড়ি? নতুন বুঝি?'

যথাসম্ভব সংযত মুখে বললাম, 'হ্যাঁ বুধবার স্কুলের পর নিউমার্কেট গিয়েছিলাম, সেখানে কিনেছি। কোটা শাড়ি।'

'খুব সুন্দর।'

'রীনার জন্য একটা কিনে আনব?'

মমি কেমন আনমনা হয়ে গেল। কী ভাবতে কী ভাবল। বলল, 'রীনা বড়ো হয়ে যাচ্ছে। না জানি দুদিন পর কত কী করবে।'

বসার ঘরে সবাই ওরা জটলা করছে। মেসোমশাই ব্যস্ত বেশি। আমরা ঢুকতেই তাড়া দিলেন। 'এবার তোমরা বেরিয়ে পড়। রোদ বাড়লে মমির কষ্ট হবে।'

চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে মমি জানতে চাইল, 'নিতাই আসে নি?' এমন একটা খেয়াল করার কথা নয়। সুপ্রিয়া এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, 'সত্যিই তো।'

মমি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'সুমতি ভেতরে দেখে এসো তো, ঠাকুরের ওখানে আছে কিনা?'

মেসোমশায়ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন, 'রমেশ, দেখ তো নিতাইয়ের কী হল? দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

বাইরে, ভেতরে সব জায়গায় রমেশ ঘুরে এল, 'আসে নি বাবু।'

বলতে বলতেই নিতাই এসে ঘরে ঢুকল। হাতে কাগজ মোড়া একটি প্যাকেট, ঢুকেই সবাইকে দেখে নিতাই কেমন জড়োসড়ো। প্যাকেটটা কোথায় রাখবে ভেবে পাচ্ছে না।

সুপ্রিয়ার সবতাতেই কথা, 'কী এনেছ নিতাই?'

লজ্জায় কাঁচুমাচু, নিতাই বলল, 'কাল মাইনে পেয়েছি।'

থেমে গিয়ে প্যাকেটটা সুপ্রিয়ার হাতে তুলে দিল।

মমি যেন বাচ্চা হয়ে গেছে, খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল, 'দেখি দেখি কী আনলে?'

সুপ্রিয়া কাগজ খুলে বাক্স বের করল, 'রসকদম্ব?' একটা মুখে পুরে বাক্সটা বাড়িয়ে ধরল, 'রীনা খাবি?'

ক্রাচে হাত রেখে নিতাই মাটিতে মিশে যাচ্ছে, 'বাবুর জন্য কটা রাখুন দিদিমণি।'

অযথা দেরি হচ্ছে। মেসোমশায় তাড়া দিয়ে উঠলেন, 'না, না, রাখতে হবে না, গাড়িতে রেখে দে, তোরা তাড়াতাড়ি ওঠ তো রীনা, রোদ চড়ে যাচ্ছে।' বলতে বলতে মেসোমশায় বেরিয়ে সোজা গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিতাইও সিঁড়ি ভেঙে নীচে গেল।

রীনা তখনও বাক্স হাতে দাঁড়িয়ে, আস্তে আস্তে বলল, 'ঠাকুরকে বলব দিদি রেখে দিতে?'

দূরে দাঁড়ানো নিতাইয়ের দিকে মমি একবার তাকাল। নতুন বুশশার্ট গায়ে। মিলের ছাপ রয়েছে। দূর থেকে কোন মিল বোঝা যাচ্ছে না। শুধু সোজা লাইনে কালো ছাপের একটা কিছু মনে হচ্ছে। কালিটা খুব গাঢ় কালো।

স্লোপের দিকে এগিয়ে মমি বলল, 'দরকার নেই রীনা, তুই গাড়িতে গিয়ে বোস।'

এক গাড়িতে জায়গা হবে না, তাই একটা ট্যাক্সিও ডাকা হয়েছিল। জিনিসপত্র, বসন্ত, নিতাই ট্যাক্সিতে উঠল। বাকি আমরা সব বাড়ির গাড়িতে।

বসন্তের শুরু। মাঠে ঘাটে খোলা আকাশে রোদে জ্বালা ধরছে। শহর ছাড়িয়ে গাড়ি আসতেই চড়চড়ে রোদ। সুপ্রিয়া আর রীনা গান ধরল, 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।' এই কাঠফাটা রোদে এখন জোছনাই বটে, তবেই না পিকনিক! গাড়ির গতিতে রোদ ঝিলিক মারছে। এক ঠ্যাং তোলা ঘাড় গোঁজা বক ধারের জলায় হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উড়ছে। রীনা গান ভুলে মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছে, 'দিদি দেখ দেখ,' সুপ্রিয়া ধমকাচ্ছে, 'এ কী হচ্ছে রীনা?'

লক্ষ্মী মেয়ে রীনা আবার গান ধরে। এভাবে খানিক এগিয়ে সুর কথা দুই-ই ভুলে এ ওর মুখ চেয়ে দুজনেই হেসে উঠল।

সামনে, প্রতাপের পাশে সুমন্ত। পেছন ফিরে বলল, 'মমি একটা গান করবে ?'

মমি মাঠ ঘাট দেখছিল। সুমন্তর কথায় মুখ ভেতরে আনল, 'আমাকে বলছ ?' তারপর আপন মনে আওড়াল, 'কত বছর ছেড়ে দিয়েছি। পারব কি ? আচ্ছা করছি।'

প্রায় দু-বছর পর মমির গান শুনলাম। ও যখন খোলা গলায় গেয়ে ওঠে আমার সম্মুখ থেকে সব মুছে যায়। গলাটা কেঁপে কেঁপে দূরে দূরান্তে দূর দেশের এক রোদ্দুরে ধূ ধূ মাঠে খেজুর গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়ায়। ডানা ছড়িয়ে অনেক দূরে চিল ভাসে। শিসের আওয়াজ তুলে বাতাস বয়ে যায়। ওর শাড়ি অজস্র ফ্রিলে প্রায় গোড়ালি অব্দি ঘাগড়া হয়ে ঝুলে পড়ে। ব্লাউজ ছোটো কাঁচুলি হয়ে টান টান বুকে চেপে বসে। ওর খোঁপা লম্বা বিনুনি হয়ে সাপের দোলায় পিঠে ঝোলে। ঐ গান আমায় দূরের এক মুক্ত মেয়ে, যে ধূ ধূ মাঠে ঝরনার স্বাদ আনে, কথায় কথায় খিল খিল হাসি তাচ্ছিল্যে হাওয়ায় ওড়ায়, সেই মেয়ের আসা ঘরে আনে। আমি বসে বসে তাকে দেখছিলাম। কখন গান থেমেছে, কতক্ষণ সবাই চুপ করে আছে, কিছুই জানি না।

সুপ্রিয়া চোখে মুখে হাত বুলাল, 'ঘুম পাচ্ছে। কোন ভোরে যে উঠেছি।'

রীনার অন্য কথা, 'বড্ড খিদে পেয়েছে।'

হ্যাঁ। এটাই মোক্ষম কথা। সবাই তৎপর হয়ে উঠল। 'ঠিক বলেছিস। প্যাকেটগুলো কোথায় ? ও গাড়িতে চলে গেছে কি ?' ব্যস্ত হয়ে রীনা পেছনে ঝুঁকে পড়ল। সিটের পেছন থেকে সুমতি মস্ত একটা ঠোঙা এনে রীনার হাতে দিল।

রীনা এক খাবলা মুখে পুরে প্রচার করল, 'ফিশ চপ।' নিমেষে শেষ। আর একটা হাতড়ে বলল, 'মাছে সবচেয়ে বেশি ফস্‌ফরাস্‌। মাছ খায় তাই বাঙালির এত বুদ্ধি।'

'সে তো তোমার রিপোর্টেই দেখতে পাচ্ছি,' মমি মনে করাল, 'বিশেষ করে তোমার অঙ্কের নম্বরে।'

'মাছ অঙ্ক জানে সুমন্তদা ?' রীনার এবার জ্ঞানের পিপাসা।

সবাই হেসে উঠলাম। সুমন্ত বলল, 'এবার দেখলে তো মাছ খাওয়া বুদ্ধি।'

মাছ হাতে হাতে ঘুরতেই পথ ফুরল। এখানে আমাদের চড়ুইভাতির শুরু।

কাঠের নড়বড়ে রং-চটা গেটের ভেতর ঢুকতেই মিষ্টি সোঁদা সোঁদা গন্ধ নাকে এসে লাগল। বড়ো ছোটো গাছ, আগাছা, ঘাস, দুর্বার ভেতর পুরনো একতলা বাড়ি। অনেক বছর কলি ফেরানোর অভাবে শ্যাওলার পাঁশুটে প্রলেপ। দালানের ওপাশে মালির ঘর। এককালে মালিক গাড়ির গ্যারেজ তৈরি করেছিলেন, আজ মালির কুঠি। মালি, মালির বৌ, বাচ্চা চারটে আজ সকাল থেকে হাঁ করে আছে, কলকাতার বাবুরা আসবে!

গাড়ি ঢুকতেই গেটের পাশ থেকে চারটে বাচ্চা চাকার পেছন পেছন ছুটতে লাগল। মালি উঠোনেই ছিল। বৌ জানালা খুলছিল, ঘোমটা টেনে এসে দরজার আড়ালে দাঁড়াল। গাড়ি থামতে কেরিয়ার থেকে মমির হুইল চেয়ার বের করে প্রতাপ বাইরে রাখল। বাচ্চাগুলো চাক বেধে হুইল চেয়ারের চারদিকে দাঁড়িয়ে। ততক্ষণে নিতাইদের ট্যাক্সিও এসে গেছে। এবার ক্রাচ হাতে নিতাইকে নামতে দেখে ছুটে গিয়ে বাচ্চাগুলো ওকে ঘিরল। ছোটোটা আবার ছুটছে মাকে ডাকতে।

আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। মমির সিটের পাশে সুপ্রিয়া হুইল চেয়ার এনে রাখল। বাচ্চাগুলো ফের এদিকে। অস্বস্তি লাগছে, মমি বলল, 'ওদের সরতে বলো।'

নড়তে কি চায়? মালি পাশেই ছিল। দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এল, 'গেলি শুয়োরের পাল!' হাতটা এমনি করে তুলল যেন ছোটো একটা লাঠি দিয়ে জানোয়ার তাড়াচ্ছে। বাচ্চাগুলোও অভ্যস্ত। ইজের টেনে নাগালের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

কাঠের পাটাতন, হুইল চেয়ার ও গাড়ির সিটে রেখে মমি নামার বন্দোবস্ত করছে। একটা হাত গাড়ির দরজায় অন্যহাত হুইল চেয়ারের হাতলে। পাটাতনের ওপর দিয়ে পিছলে এসে মমি চাকাগাড়িতে বসল। বাচ্চাগুলো এক পা এক পা করে এগুচ্ছে। মালির মুখ হাঁ, মালির বৌ দালানে ছিল, অজান্তে উঠোনে নেমে এসেছে।

উঠোনের পুবে কয়েকটা আমগাছ। আমের বোল আসতে শুরু করেছে। রোদ, গাছের পাতা, হলদে বোল, তিন আর এক। ছড়া মেলাতে কোণে একটা জাম গাছও। ডালে থোকায় থোকায় কচি ফল। আম জাম হল, এবার কাঁঠালের বদলে মালির ঘর ঘেঁযে একটা সজনে গাছের ব্যতিক্রম। সারা গায়ে অজস্র শাদা ফুল। চারপাশে আগাছা, সীমানায় ছোটো ছোটো ঝোপ ঝাড়। গেটের পাশে কামিনী ফুলের বাহার। মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে।

ঘাসের উপর দিয়ে সুপ্রিয়া মমিকে নিয়ে উঠানে এল। মালি এসে দাঁড়াল, 'দিদিকে দালানে তুলে দেব ?'

রীনা বাদে আমরা সবাই উঠানে। কোথায় যে মেয়েটা উধাও। মমি মাথা নাড়ল, 'এক্ষুনি দালানে কি ? তার চেয়ে চলো ওদিকটায় ঘুরে আসি।'

ওদিকটায় পুকুর। পুকুরপারে রীনার পাত্তা মিলল। আকন্দ বনতুলসীর ঝোপের ধারে দাঁড়িয়ে হাঁসের খেলা দেখছে। বাচ্চাগুলো ঢিল ছুড়ছে। প্যাক্ প্যাক্ করে হাঁসগুলো ঝাঁক বেঁধে জলে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। আমাদের দেখে রীনা মুখ তুলে চেঁচাল, 'কেমন সাঁতার কাটছে দেখ, সুমন্তদা।' মমি ওকে সাবধান করল, 'এত ধারে যাসনে রীনা।'

বসার কিছু একটা চাই। খানিকপর মালি, মালির বৌ, আর সুমতি মিলে সতরঞ্চি, মমির ফলের রস, চা একগাদা খাবার সব এনে বেশ গুছিয়ে গাছের নীচে আমাদের বসিয়ে দিয়ে গেল।

আরাম করে বসেছি। বাচ্চাগুলো ঘুর ঘুর করছে। সুপ্রিয়া ডাকল 'পুকুরে সাপ আছে খোকন ?' এই শুনে চারটে বাচ্চাই হেসে কুটি কুটি।

পুকুরপাড় থেকে সুমন্ত ও রীনা এসে দাঁড়াল। সুপ্রিয়ার পাশে বসে পড়ে রীনা। জিজ্ঞেস করল, 'ওরা এত হাসছে কেন প্রিয়াদি ?'

আমরাও তাই ভাবছি।

ওদের হাতে খাবার দিয়ে মমি বলল, 'এত হাসছ কেন খোকন ?'

ওদের হাসি আরও বেড়ে গেল। ছোটোটা মেজোর ঘাড়ে মুখ লুকিয়ে খিল খিল করে হাসছে। সুমন্ত দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। সিগারেট বার করে প্যাকেটে ঠুকতে ঠুকতে বলল, 'খোকন বলে ডাকলে হাসি পাবে না ? শোনো নি ওদের বাবা কী বলে ডাকছিল ?'

'যা বলেছেন, যেখানে যা,' সুপ্রিয়া চোখ তুলল।

ওদের হাসিটা একটু কমেছে। এর মধ্যে বড়োটি, যে একটু ভবিব্যসব্যি, ছোটোদের এ বেয়াদপিতে সে ধমকে উঠল, 'এই নেড়া, তাহু চাটি খাবি, চুপ কর।' তারপর বিজ্ঞের মতো বলল, 'সাপ আবার নেই ? কত চাই ?' বাকি তিন ভাই আর অপেক্ষা নয়। তর তর করে সোজা নীচে নেমে কলমির দামটাকে খুঁচিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখল, যদি একটাও মেলে। না, পেল না। মন খারাপ করে তিন ভাই উপরে উঠে এল। 'নেই, সব শালা ডুব মেরেছে।'

রীনা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কীর্তিকলাপ দেখছিল। শুকনো মুখে বলল, 'জলে নেমে কাজ নেই প্রিয়াদি।'

সুপ্রিয়া হেসে বলল, 'ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে যে। দেখুন, সুমন্তবাবু, রীনার চেহারাখানা দেখুন।' হেসে রীনার গাল টিপে দিল। দিয়েই সুপ্রিয়া এবার সুমন্তকে ধরল, 'বারে! চান করবেন না? চটপট তৈরি হোন।' রীনার ভয় আর কৌতূহল, 'সুমন্তদা সত্যি চান করবে?'

সুমন্ত ওর কাঁধ জড়িয়ে কাছে টানল। 'ভয় কি রিনি, একে গেঁয়ো সাপ, তায় ভীতু, দেখ না কেমন দেখেই চম্পট, আর আমিও সঙ্গে থাকব।'

রীনা মাথা নেড়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল, 'আমি জলে নামছি না বাবা।'

মমিও তাড়াতাড়ি যোগ দিল, 'ও থাকুক। তোমরা যাও।'

গাছতলায় বসে খানিক আড্ডা মারা গেল। মমিকে ঠেলে সুপ্রিয়া পুরো বাড়িটা ঘুরে এল। রীনার কিন্তু এক তাড়া, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে যে, কখন জলে নামবে?'

আমি উঠে বাড়ির দিকে এলাম। একতলা বাড়ি। ভিত উঁচু, বেশ ক-ধাপ সিঁড়ি ভেঙে তবে দরদালান। পর পর তিনটে বড়ো কোঠা। বাঁহাতি দু-তিন ধাপ নেমে রান্নাঘর। পাশেই মালির ঘর। রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম। সুমতি, বসন্ত, মালির বৌ তোড়জোড় করে রান্না করছে। একটা উনুন থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চোখ জ্বালা করতে থাকল। বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে সুমতিও এল, 'কিছু চাই দিদিমণি?' বললাম, 'না। এমনি দেখতে এলাম।'

'খুকু কি ওখানেই?' খবর নিয়ে সুমতি আবার রান্নায় গেল।

চান করব। চুল খুলতে খুলতে টানা বারান্দার ধারে এসে দাঁড়ালাম। পাঁচিল ঘেঁষে জবা গাছটা ঘিরে ঘাসের ওপর ছোটো ছোটো হলদে প্রজাপতি। ঝাঁক বেঁধে আসছে আবার চলে যাচ্ছে। রাস্তাটা অনেক দূর দেখা যায়। রোদে কাঁপছে। হাওয়ায় কামিনী ফুলের গন্ধ, মিষ্টি আর তেতো তেতো। চোখ ছোটো করে রোদ-ভরা দূর রাস্তার দিকে চাইলাম। একটাও লোক নেই। শব্দ নেই।

পরে সুমন্ত এল বলল, 'একা একা?'

রেলিং-এ কনুইয়ের চাপ, হেলান দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম, 'দেখছি।'

কয়েকটা শালিক বারান্দার এদিক ওদিক ঘুরছে। হঠাৎ সবকটা এমন ঝগড়া বাধিয়ে ফেলল। এ ওর ঘাড়ে, একটাকে চিৎ করে ফেলে বুকে চেপে বসেছে, কুরুক্ষেত্র!

সুমন্ত বলল, 'কয়েক মাইলের তফাত আর দেখুন কত তফাত। কলকাতায় বসে এ ভাবতে পারতেন? মাঝে মাঝে বাইরে বেশ লাগে, তাই না?' আবার বলল, 'আপনি লোকজন ভিড় ভালোবাসেন?'

মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম, মুখ সরিয়ে ভেবে বললাম, 'ভিড় ভালো লাগে, পছন্দও করি, তবে অচেনা ভিড়। কেউ আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবে না, অথচ সবার ব্যস্ততায় ছড়িয়ে থাকব।'

সুমন্ত হাসল, চুল পেছনে ঠেলে দিল, 'এর মানে আপনি নিজে নিঃসঙ্গ, অথচ নিঃসঙ্গতাকে আপনার ভয়।'

পুকুরের ওধার থেকে রীনা চেঁচিয়ে ডাকল, 'সুমন্তদা, অতুদি চান করতে এসো।'

সুমন্ত বলল, 'ঠিক কিনা বলুন?'

রীনা আবার ডাকল, 'সুমন্ত দা'

সিঁড়িতে নেমে সুমন্ত বলল, 'কিছু বলছেন না যে?'

হেসে বললাম, 'কী বলব? যেদিন আমাকে ভালো করে জানবেন সেদিন আপনিই প্রশ্ন থামাবেন।'

রীনা চেঁচাচ্ছে, 'সুমন্তদা, অতুদি!'

বললাম, 'আপনি যান। আমি আসছি।' তোয়ালে আনতে ভেতরে গেলাম। একাকিত্বে আমার ভয়? জীবনভোর যে একা! মনে মনে হাসলাম।

রীনা দৌড়ে এল, 'সবাই জলে নেমে গেছে, তুমি আসছ না অতুদি।'

উঠোনে নামতে নামতে বললাম, 'তুই একা থাকতে ভয় পাস রীনা?'

রীনা অবাক হল, 'কী বললে? একা থাকতে ভয় পাই কিনা?' তারপর ভেবে বলল, 'না, একা থাকতে আমার ভয় করে না। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার ভীষণ একা লাগে। বিশেষ করে যখন দিদি কাছে থাকে।' তারপর মুখে তাকিয়ে শুধাল, 'একথা কেন জিজ্ঞেস করছ?'

বললাম, 'এমনি, একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল।'

হাঁটতে হাঁটতে রীনা হঠাৎ কথা রাখল, 'দিদিকে তুমি খুব ভালোবাসো অতুদি।'

উঠোন থেকে পুকুর দেখা যায়। সুপ্রিয়া জল তোলপাড় করছে। সুমন্তও মাঝপুকুরে।

রীনা প্রায় ছুটতে ছুটতে বলল, 'অতুদি শিগগির চল। ওরা জলে নেমে গেছে।'

বেলা হয়েছে। জল বেশ গরম। আমি গিয়ে জলে নামলাম। হাঁটু কোমর, বুক একটু একটু করে ডুবিয়ে গলা জল অবধি এসে আরাম করে দাঁড়িয়ে রইলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলের তলায় শরীরটাকে দোলাতে লাগলাম।

জলে শরীর হালকা হয়ে যায়। আর একদিন হোটেলের নিচু সিলিং-এ ঝোলানো বাতির তলায় সুমন্তর হাতে হাতে দোলানো শরীরটাকে এমনি হালকা মনে হচ্ছিল। এত হালকা ও বেওয়ারিশ যে সুমন্তর ইচ্ছায় আর টানাপোড়েনে ঘুরে ফিরছিল। আমার নিজের কোনো হাত ছিল না। এমনি মাঝে মাঝে আমার ঘুমের ভিতর হয়। বুঝতে পারছি কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধরতে আসছে, পালাতে চাইছি কিন্তু ছুটতে পারছি না।

তলার মাটি থেকে পা তুলে ভাসতে লাগলাম। সুপ্রিয়া ফিরে আসছে। কাছে এসে হাঁপাচ্ছে, 'একটু জিরিয়ে নি। অনেক দিন সাঁতার কাটি নি। বড্ড হাঁফ ধরেছে।'

ধরবেই তো, মনে করালাম না, বাজি ধরছিল কিনা।

আমি খানিক এগিয়েই সুমন্তকে ধরলাম। চিৎপাত স্থির হয়ে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে বললাম, 'কী, আকাশ দেখছেন?'

উল্টে উপুড় হয়ে জানাল, 'না, অপেক্ষা করছি।' পাশাপাশি সাঁতার কাটতে কাটতে গল্প চলল, 'অনেকদিন জলে নামি নি। একবার বর্ধমানে এক বন্ধুর বিয়েতে সবাই মিলে সাঁতার কেটেছিলাম, তাও কয়েক বছর হবে। আপনি?'

'আমি? আমি প্রায়ই সাঁতার কাটি। রানাঘাটে গেলেই হল। রোববারও জলে নেমেছি। জল আমি ভীষণ ভালোবাসি! একবার আপনি রানাঘাট চলুন। আপনার খুব ভালো লাগবে। মস্ত পুকুর আছে। বাড়িতে কেউ নেই। শুধু মা। যাবেন?'

সুমন্ত ডুব দিল। উঠে হাঁফ ছেড়ে বলল, 'যাব। ডুবতে যাব।'

এগিয়ে যাচ্ছি। সুপ্রিয়াও এল, ছোটো পুকুর। তিনজন পুকুর পেরিয়ে ওপারের ঘাটে গিয়ে বসেছি। ওপার থেকে রীনার আওয়াজ ভেসে এল, 'সুমন্তদা চলে এসো, বড্ড খিদে পেয়েছে।'

সত্যি বড়ো দেরি করে ফেললাম। ভিজে কাপড় গুছিয়ে উঠছি, সতরঞ্চির একপাশে বসে নিতাই, এদিকে তাকিয়ে আছে।

লোকটার ঐ চাউনি। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে কী দেখে নিতাই? বুকের ভিতর অবধি আড়ষ্ট হয়ে যায়, শরীরে জ্বালা ধরে যায়। উঠে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর

যাচ্ছি। শুনতে পেলাম নিতাই মমিকে বলছে, 'সরলার ওপর আমার আর রাগ হয় না দিদি। সব এক। ওর আর দোষ কী? আর দোষ যদি বলি তবে সে এই কাটা পা দুটোর।'

লম্বা বারান্দা ধুয়ে মুছে কলাপাতা বিছিয়ে মালি খাবারের জায়গা করছিল। রীনা মহাখুশি, 'নেমন্তন্ন অতুদি।' কোথা থেকে একটা কুকুরও এসে জুটেছে। সিঁড়িতে জিব বের করে বসে দেখছে।

নেমন্তন্নই বটে। এইটুকু সময়ের মধ্যে বসন্ত কী করে যে এত করল! দইমাছ, মুড়ো দিয়ে মুগডাল, কত রকম ভাজা, আমড়ার টক। মিষ্টি—কলকাতা থেকে আনা।

খাবার থেকে মুখ তুলে বললাম, 'এ যে বিয়েবাড়িকে হার মানায়!'

প্রত্যুত্তরে গুচ্ছের বেগুনভাজা এনে বসন্ত আমার থালায় ঢেলে দিল।

'কী করছ?' দু-হাতে পাতা ঢেকে প্রায় উপুড় হয়ে পড়লাম।

অপ্রতিভ মুখে বসন্ত বলল, 'সেদিন আপনাকে কিছুই খাওয়াতে পারি নি। হঠাৎ করে এলেন, কী করব, বাড়িতে সব বাড়ন্ত, কিছুই ছিল না। বলেছিলেন বেসন দিয়ে বেগুনভাজা ভালোবাসেন, তাও দুটোর বেশি দিতে পারি নি।'

সব কলরব একসঙ্গে থেমে গেল। আমার পাশে সুপ্রিয়া, রীনা, রীনার পর সুমন্ত। সামনে ছোটো টেবিলে মমি। আমাদের থেকে খানিক দূর বারান্দার শেষ মাথায় নিতাই ও বাচ্চা চারটে।

রীনার কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর চুপচাপের প্রথম। বাচ্চা চারটেও দূর থেকে একসঙ্গে মাথা কাত করে কী হল দেখছে। সুমন্তই ভাঙল গুমোট, 'তাই বলে আজ সব ওর একার পাতে উজার করে দিও না বসন্ত। আমরাও রয়েছি। কী বলিস রিনি?'

রীনা সুমন্তর দিকে নয়, খাওয়া বন্ধ করে আমার দিকে চেয়ে ছিল। মুখ ওর থমথমে, অভিমান, রাগ-গম্ভীর। সুমন্তর কথা শুনলই না। আমাকে অভিযোগ, 'তুমি সুমন্তদার বাড়ি গিয়েছিলে অতুদি? আমাকে বললেও না, এত করে বলেছিলাম নিয়ে যেতে।'

মমি হাত তুলে তাকিয়েছিল, তীক্ষ্ণ, সন্দিগ্ধ চোখ। অনেকদিন পর ওর চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে উঠল। কুঁচকানো ঠোঁটের একপাশ বেঁকে গেল। ঘেন্না না

বিদ্রূপ, এমন সব খুঁটিয়ে দেখার সময় এখন আমার নয়। দুটোর একসূত্রতা, কি পরিপূরকতা পরে ভাবব। আমার সময় মাত্র, একটু সময়, যা মমি নিল। তারপরই খেতে খেতে বলল, 'সুমন্তর বাড়ি কেমন লাগল রে অদিতি?'

রীনা বলল, 'বেশ তুমি অতুদি।'

মমি রেগে রীনাকে ধমকে উঠল, 'বড্ড হ্যাংলা হয়েছিস রীনা। সব জায়গায় সবাই তোকে নিয়ে যাবে? হ্যাংলা কোথাকার!' জলের গ্লাস তুলে মুখের সামনে ধরল।

নিতাই বেদম কাশছে।

মুখ না তুলে মমি বলল, 'ওকে জল দাও সুমতি।'

সুপ্রিয়া এতক্ষণ আমাদের লক্ষ করছিল। রীনা, মমি, আমি, আমাদের। নিতাইয়ের বিষম খাওয়া তবু খানিকটা ছেদ আনল। কিছু একটা পেয়েছে, তৎপর হয়ে উঠে গিয়ে সুপ্রিয়া নিতাইয়ের মাথায় থাবড়া মেরে কব্জি চেপে ধরল। আস্তে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'জল খাও।'

নিতাই একটু সুস্থির হতে সুপ্রিয়া ফের খেতে বসে গল্প ফাঁদল: 'ছোটো বেলায় আমার একবার এমন বিষম লেগেছিল যে বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল। আমাকে উপুড় করে ফেলে পিঠ চাপড়ে জল ঢেলে মাথা নীচু, পা উঁচু, যার যা জানা ছিল সব এক্সপেরিমেন্ট চলল, অবশেষে ডাক্তার ডাকাও হয়েছিল। কিন্তু বেচারা ডাক্তার,' সুপ্রিয়া নিশ্বাস ফেলল, 'হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে দেখে, আমি দিব্যি থালা সাজিয়ে বসে বসে খাচ্ছি!' সুপ্রিয়া চারদিকে তাকাল, কেউ হাসছে না।

খেয়ে দেয়ে উঠতে উঠতে দুটো বেজে গেল। তারপর মিনিট পনেরো সবাই একথা সেকথা বলে কাটাল। পাশের ঘরে সুমতি মমির বিছানা করে রেখেছিল। মমি বিছানায় চলে গেল।

আমগাছতলায় সতরঞ্চি এনে সুপ্রিয়া ঢালা শোবার ব্যবস্থা করছে। সতরঞ্চির উপর গড়িয়ে বলল, 'অনেকদিন পর সাঁতরে বড্ড ক্লান্ত লাগছে। আপনার লাগছে না?'

সতরঞ্চির একপাশে বসেছিলাম। বললাম, 'আমার অভ্যেস আছে। রানাঘাটে আমি সাঁতার কাটি।'

সুপ্রিয়া হাঁই তুলল, 'ও তাই বুঝি! কচিৎ আমি কলকাতার বাইরে পা দিয়েছি। আর যাবই বা কোথায়? আপনজন বলে তো আর কেউ কোথাও

নেই, তাও স্টুডেন্ট লাইফে মাঝে মাঝে দল বেঁধে বাইরে যেতাম, পিকনিক করতাম। এখন তাও না।' বলতে বলতে ওর কথা জড়িয়ে এল, ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুপ্রিয়ার পাশে শুয়ে রীনা বই পড়ছিল। একটু সরে আমায় জায়গা করে দিয়ে বলল, 'শোবে ?'

রীনার পাশে শুয়ে পড়লাম।

কী একটা আওয়াজ হতে ধড় ফড় করে উঠে বসেছি। তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। রীনা ঘুমুচ্ছে। বইটা হাতের নীচে বুকের উপর চাপা। থেমে থেমে নিশ্বাস পড়ছে।

উঠে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কোথাও সাড়াশব্দ নেই। ও ঘরে সুমতি মমি ঘুমিয়ে। উঠোন ভর্তি ঝাঁ ঝাঁ রোদ। চারদিক নিস্তব্ধ। আমগাছের ওপর দিয়ে হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। ঝুর ঝুর করে আমের বোল মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। থেমে থেমে কোথায় একটা পাখি ডাকছে কুক কুক। যেন নিশির ডাক। পুকুরের ওদিক থেকে এক দমকা হাসির আওয়াজ কানে এল। পাখিটা তেমনি থেমে থেমে ডাকছে। আমি খালি পায়ে উঠোনে নেমে এলাম। পায়ে পায়ে সরু একটা রাস্তা পুকুর অবধি গিয়েছে। দুধারে ছোটো আগাছা, ঘাস দূর্বা। পায়ের পাতা উঁচিয়ে ওদিকে এগিয়ে গেলাম।

ঘাসের ওপর সুমন্ত চেপে বসে আছে। আর বাচ্চা চারটে ডানা ধরে হাঁসগুলোকে দুলিয়ে দুলিয়ে পুকুরে ছুড়ে মারছে। মোটা থপথপে হাঁসগুলো উড়ে গিয়ে ঝপাং করে জলে পড়ে। জল ছল্‌কে ওঠে। কখনো হাসি ওঠে।

ঘাড় ফিরিয়ে সুমন্ত হাতে ঝেড়ে হাসিমুখে আমায় পাশে বসতে জায়গা করে দিল। বসে পড়ে বললাম, 'খাওয়া দাওয়ার পর সেই তখন থেকে হাঁসের খেলা ?'

দুঃখ দুঃখ মুখ করে সুমন্ত জানাল, 'খেলার আর সঙ্গী কোথায় ? তাই হাঁস-ই সই।'

সত্যি মাথা খারাপ ক'রে না, এমনিই বললাম, 'ডাকলেই পারতেন।' তারপর তাড়াতাড়ি কথা চাপাতে যোগ করলাম, 'কী ঘুমই যে পেয়েছিল !'

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে সুমন্ত হিসেব দিল, 'কতক্ষণ আর, আধ ঘণ্টাও না।'

'মাত্র! তাহলে বেশিক্ষণ ঘুমোই নি। ভাবছিলাম অনেক ঘুমিয়েছি।' দুহাত দিয়ে মুখ চোখ রগড়ে তাকাতে সুমন্তর চোখে চোখ পড়ল।

'বাকিরা কী করছে ?' সুমন্ত জিজ্ঞেস করল।

'ঘুমুচ্ছে।'

'সবাই ? রিনি ?'

'আপনি আর হাঁস বাদে সবাই।'

'অবাক করল রিনি। রিনি ঘুমুচ্ছে ? এই পাঁচ বছরে ওকে দুপুরে ঘুমোতে দেখি নি কি শুনি নি।' কী মনে করে সুমন্ত আপন মনে যে হাসল আগেই তা আমি জানি। বলল, 'মধুপুরে, বিহারের ঐ পাথুরে রোদে সারাদুপুর মমি রিনি বাগানে রাস্তায় টো টো করে ঘুরে বেড়াত।'

আমি ভাষ্য করলাম, 'আর ওদের সঙ্গিটি তখন নাকে তেল দিয়ে নাক ডাকাতেন না নিশ্চয় ?'

হো হো করে সুমন্ত হেসে উঠল। আচম্‌কা জানান না দিয়ে এমনি সে হেসে ওঠে। থেমে বলল, 'ঠিক ধরেছেন। আমারও ঐ দুপুর রোদে ভারি বেড়াবার সাধ জাগত। মমি আর আমি রিনিকে এড়িয়ে কী করে বেরুব। চেষ্টা থাকত একটা। রিনিরও থাকত, কী করে নেবে পিছু। না নিয়ে গেলে মাকে বলে দেবে বলে শাসাত।' সুমন্ত হাসতে লাগল।

এই হাসিটা আমি ভালোবাসি নি। এই হাসিটা আমি ছুড়ে ফেলতে চাইলাম। একটা নুড়ি কুড়িয়ে পুকুরে ছুড়ে মারলাম। নুড়িটা জলে পড়তে ছোটো একটা বৃত্ত, তারপর ছড়িয়ে আর একটা, আরো একটা তারপর সব থেমে গেল। আর একটা নুড়ি তুলে আরো জোরে ছুড়লাম। টুপ্‌ করে শব্দ, অনেক বেশি গভীর, অনেক বেশি বৃত্ত তৈরি হয়ে হয়ে সমস্ত পুকুরটায় ছড়িয়ে গেল। আর একটা তুলব, সুমন্ত কী বলতে চাইল। 'দেখুন! দেখুন!' আমি বুঝি খামোখা ডেকে উঠলাম।

সুমন্ত জলের দিকে তাকাল। জলটা তখনও বৃত্তের পর বৃত্তে থির থির করে কাঁপছে। কী ভেবে বলল, 'একটু পরে দেখবেন সব মিলিয়ে যাবে। তাই হয়।'

আমার মনের মতো অর্থ করলাম, 'সব ক্ষেত্রেই তাই ?'

দায়িত্ব নেই, কি আমল দেবে না, উত্তর না দিয়ে সুমন্ত তাকিয়ে রইল।

'কী দেখছেন ?'

সুমন্ত চোখ না সরিয়েই বলল, 'কী দেখছি! দেখছি ক্ষেত্র। আপনাকে। আপনি যখন আসছিলেন মনে হচ্ছিল রোদ জমাট বেঁধে এগুচ্ছে। পরশু যে শাড়ি পরেছিলেন, কোত্থেকে ঐ রঙ জোগাড় করলেন ? আপনার সাজ, চেহারা নিয়ে কেউ কিছু বলে না ?'

'আগে বলেন নি তো!'

'কেন, আপনার সেই নীলচোখ ভদ্রলোক, হাতের থাবায় চেপে যে আপনাকে নাচিয়েছিল ? বলে নি ?'

জোরে হেসে উঠলাম, 'হিংসে হচ্ছে ?'

'হিংসে হওয়াটা সুলক্ষণ। মূল্য বাড়ছে।'

ঘাড় কাত করে আড়চোখে বললাম, 'মূলও তো শুকিয়ে যেতে পারে।'

'আমি যা নিই তা নির্মূল করেই নিই।' সুমন্ত খাড়া হয়ে প্রচার করল।

'খুব অহংকার!'

'দেখতে চান ?'

'উঁহু, সময়ে দেখব।'

সুমন্ত এগিয়ে বলল, 'এখনও সময় হয় নি ?'

মাথা নাড়লাম। রোদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না। এখন সবে দুপুর।' বলে মনে মনে নড়েচড়ে উঠলাম। না, আর নয়। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বাচাল বনে যাচ্ছি। নিজেকে শাসাতে মনস্থ করলাম। মমির কথা মনে করলাম। বললাম, 'আপনার বন্ধুর খবর কী ?'

'কোন বন্ধুর ?'

'সেই যে অসুখ ছিল যার ? বিছানায় পড়ে আছে বলছিলেন, ওষুধ দিয়ে এলেন ?'

'সুব্রত ! ওকে ছেড়ে দিন !'

'কেন ? কী করলেন উনি ?'

'কিছুই না। কী বলছিলেন ?' সুমন্ত কথা ছাড়ছে না।

বললাম, 'আজ কী বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল।'

'কী হয়েছে ?' সুমন্ত ফাঁকা গলায় বলল।

'সেদিন আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম, ওরা তা বসন্তর মুখে শুনল।'

'তাতে কী হয়েছে ? কারো কাছ থেকে শুনলেই হল।' বলে মুখ ফেরাতে গিয়ে হঠাৎ ফিরে সুমন্ত আমার কাঁধে পিঠে হাত রাখল। আচমকা বলেই লাফিয়ে উঠেছি। সুমন্ত হাত চেপে বসিয়ে দিল, 'বসুন।'

ভাবতে হাসি পায় এমন এক সামান্য জিনিসে এত কিছু হয়। হাসির পিছনেও ফের অন্য এক হাসি পায় ভাবতে এ সামান্য যা তা নয়। এ মাত্র উপলক্ষ কি মুখোশ কি রূপক যার নীচে আর এক ইচ্ছা গোপনে ঘুরে-ফিরে, ঘুরিয়ে কাজ করে। সুমন্ত আমার কোথাও বা গ্রীবা, কাঁধ কি পিঠ কি মাথা

থেকে যদি একটা শুকনো পাতা কি তার বোঁটা ফেলে দিতে চায়, কেননা পাতায় কি তার বোঁটায় কাচ কি শুঁয়োপোকা বা কিছুই না, আর আমি লাফিয়ে উঠি, আর সে আমায় হাত ধরে বসিয়ে দেয়, আর এখন আমার হাত ওর হাতে, আমার তবে কী করার, আর, আমি নাচার আমি নিরুপায়।

আমার হাত এখন ওর হাতে আকস্মিকতায়, আমার হাত সমর্পণে ওর হাতে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

হাত কাঁপছে। বাচ্চাগুলো আমাদের কথার ফাঁকে কোথায় চলে গেছে। নিস্তব্ধ দুপুর। বসন্তের শুরু। বন-তুলসীর ঝোঁপের পাশে বসে আছি। ঝোঁপে ঘাস দূর্বায় সবকিছুতে ছোটো ছোটো বনজ ফুল। এই দুপুরে সবকিছু থেকে গুন গুন আওয়াজ উঠছে।

'অদিতি!'

'হুঁ'

'কিছু বলো'

'কী বলব?'

'অনেক কথা'

হঠাৎ ওপাশে ধুপ করে কিসের আওয়াজ হল। বাচ্চাগুলো বোধ হয়! ওখানে চোখ ফেলতে ঐ প্রথম দিনের মতো আজও আঁতকে পিছিয়ে আসতে হল। সেদিন আচমকা বীভৎস কিছু দেখে আমার ইন্দ্রিয় কেমন বিকল হয়ে গিয়েছিল। আমি দিশেহারা হয়ে ছুটেছিলাম। আজ ন্যক্কারে পিছিয়ে এলাম।

নিতাই কাটা পা নিয়ে দলা পাকিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। চাড় দিয়ে ওঠার চেষ্টায় জড়পদার্থ নয় বলে ভুল ভাঙে। হাতের থাবায় মাটি। পাশে ক্রাচ। আর্টিফিশিয়াল পা পড়ে আছে। দেহের নিম্নভাগে ভারসাম্য নেই। মাথা অনেক নীচু। আচমকা পড়ে যাওয়ায় ওঠার চেষ্টায় বনতুলসীর ঝোঁপ ঘাস মাটিতে দাপাদাপির আক্ষেপ। সুমন্ত পাশে দাঁড়িয়ে, আমি অনড়। নিতাইয়ের ছটফটানি বাড়ছে। এক সময় সে উঠে বসল। মুখময় মাটি।

শক্ত মুখে সুমন্ত সংক্ষেপে বলল, 'কী করছিলে?'

গ্রাহ্য নেই। বাঁ হাতে মুখ মুছে থুতু ফেলল। গা থেকে ঘাস দূর্বা ঝাড়ল। ভুজোড়া চোখের নীচে ধীরে পা লাগাচ্ছে। ডান পায়ে স্ট্র্যাপ বেঁধে বাম উরু তুলে ধরল। কোঁচকানো এবড়ো খেবড়ো কাটা দাগের পাশে একটা ঘা, খানিকক্ষণ দেখে তার উপরেই প্লাষ্টিকের পা লাগিয়ে নিল।

এতক্ষণে মুখ তুলে বলল, 'বাবু কী বলছিলেন, কী করছিলাম ? আপনাদের পেয়ার দেখছিলাম। দিদিমণি মায়া করে জানতে চেয়েছিলেন আমার বৌ কোথায়। আমার নাদুস নুদুস বৌটাও পেয়ারের লোকের সঙ্গে ভেগেছে। এসব বেজন্মাদের কুত্তা লেলিয়ে দিলে ঠিক হয়। আয় তু তু, ছুঃ লে লে লে ভাঁগ।' নিতাই চিৎকার করতে লাগল।

আমি যাব বলে পা বাড়িয়েছি, সুমন্ত আমার হাত চেপে ধরল, 'যাবেন না।'

রীনা ছুটে এসেছে। পেছনে স্রোত, সুপ্রিয়া মালির বৌ, মালি, বসন্ত, প্রতাপ। আচমকা ঘুম ভেঙে সবাই এসে জড়ো হয়েছে। সবাই হতভম্ব। নিতাইকে দেখছে। নিতাই তখনও সমানে চেঁচাচ্ছে, 'লে লে লে ভাগ ভাগ ফুঃ !'

হুইল চেয়ারে মমি আসছে, সুমতি পেছনে। এসে একমিনিট সবাইকে তারপর আমাকে সুমন্তকে দেখল। আমি কিছু দেখতে পারছি না, কিছু ভাবতে পারছি না। শুধু একটা বুনো জানোয়ারের গোঙানি শুনছি গোঁ গোঁ গোঁ।

মমি ধমকে উঠল, 'নিতাই !'

আচমকা নিতাই থেমে গেল। গরুর চোখ দিয়ে ও মমির দিকে তাকিয়ে আছে। মাটি কাদা ঘাসে নতুন বুশশার্ট জব্‌জবে। টপ্‌ টপ্‌ করে মুখ চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তারপর হঠাৎ বীভৎস গলায় চিৎকার করে কাঁদতে লাগল, 'দি-দি-দি !'

চেয়ারের হাতল দুহাতে চেপে ধরে ঢোঁক গিলে মমি চেঁচিয়ে উঠল, 'যাও এখান থেকে !' দুহাত দিয়ে দুই অচল পা চেপে ধরল।

কে কী বলবে ; সবাই দাঁড়িয়ে দেখছে। ক্রাচ তুলে বুশশার্টে মুখ মুছে নিতাই দাঁড়াল, চলে যাচ্ছে। সিগারেটের টুকরো ফেলে সুমন্তও চলে গেল।

রীনা সুপ্রিয়া বসন্ত ওরা সবাই এদিক ওদিক দাঁড়িয়েছিল। এক এক করে সবাই চলে গেল।

হুইল চেয়ারে মমি বসে আছে। আমিও বসে আছি। অনেকক্ষণ আমি ও মমি কাছাকাছি বসে রইলাম। মমি খানিকটা পেছনে আমার বাঁ পাশে, আমি সামনে মমির ডান পাশে। ফিরে আমি তাকিয়ে দেখছি না। কথা ফুরিয়ে যাওয়া নয়। আমরা কেউ আরম্ভই করি নি কথা ! কেউ আমাদের মাঝখানে এখন এসে পড়লে কী হত ? কী ভাবত ? ভাবতে পারছি না। কেন যে তবু উঠে যেতে পারছি না, তারও উত্তর নেই। আমি যতদূর পারি দূরে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করছি। পুকুরের ওপারে কয়েকটা ঘুঘু খুটে খুটে কী খাচ্ছে।

ওপারের গাছগুলো অদ্ভুত লম্বা হয়ে পুকুরে ডুবে আছে। সামনের জলহাওয়া কাঁপছে। জলের তলায় গাছগুলোও কাঁপছে, কলমির দামে চোখ পড়ল। রোদে সোনায় সবুজে কেমন জ্যান্ত দেখাচ্ছে। হাওয়া দেয়, পুরো দামটা গা ঝাড়া দিয়ে নড়ে চড়ে ওঠে। হঠাৎ গাটা শিরশির করে কেঁপে উঠল। প্রায় অদৃশ্য কালোয় শাদায় চক্রা চক্রা একটা সাপ দামটার লতায় পাতায় জড়িয়ে আছে।

১২

কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষদা হন্তদন্ত হয়ে আমাকে ঠেলে তুলল, 'শিগগির নীচে যাও, বাবু এসেছেন।'

চোখ খুলে আমি আবার পাশ ফিরে শুলাম, রাজ্যের তৃপ্তি আমার মুখে। ঘুমের অচেতনেও আমি এ জানতাম। আমি জানতাম সুমন্ত আসবে। সারারাত আমি ওর অপেক্ষায় রয়েছি। রাতে বাড়ি ফিরে বাতি জ্বালি নি। সুমন্ত আমার পাশে। ওর হাতের ছোঁয়া আমার হাতে, আর এ জানতাম এখনই ও আসবে। সকাল আর সুমন্ত। খাট থেকে নেমে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। খোলা গলা, ব্রা-হীন রাত্রিবাসের ফ্রিলে বুক ঢাকা। বিনুনি খুলে ছোটো ছোটো চুল এদিক সেদিক, কপালে কানের পাশে চোখে চমক, ঠোঁটে তৃপ্তি, ক্রিমে গলা মুখ চক্‌চকে। আমি সব ঠিক করে নিলাম। রাত্রিবাসের ওপর শাড়ি জড়িয়ে মুখ মুছে নিলাম। ও আমাকে দেখে কী বলবে? ঘুম ভেঙেছে কি ভাঙে নি, বুঝি কথা হারিয়ে ফেলবে। ও আমাকে কি নাম ধরে ডাকবে?

নীচে নেমে এলাম। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে চুলে হাত বুলিয়ে নিলাম। কেমন সংকোচ যেন, সময় নিচ্ছি। মাথা নীচু করে বসে সুমন্তও চুলে হাত বুলোচ্ছে। আমি যে এসেছি বুঝতে পারে নি, ছুঁয়ে দেব নাকি? শব্দ না করে গিয়ে পাশে দাঁড়ালাম।

অনেক সময় নিয়ে সুমন্ত মুখ তুলল। চুল উসকো খুসকো, চোখ রাঙা,

তলায় কালচে দাগ, শ্রীহীন রাত জাগার ছাপ। বুঝলাম এসেছি জেনেও চুপ করে ছিল, না জানি কী হয়েছে! এত সব যে আমার ভাবনা, নিমেষে চুরমার হয়ে পায়ে পড়ে গেল। বুক ধড়ফড়িয়ে উঠল। কী বলতে যাচ্ছিলাম, সুমন্ত কখন উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্রেমে দুই মুঠি। মাথা ঠেকানো শিকে। আশঙ্কায় পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। না জানি কী হয়েছে। আমার হাত তখন ওর কাঁধে নেই। তবু মনে মনে আমার হাত ওর কাঁধে। আমার ছোঁয়া ও ঠিক পেয়েছে। এসেছি যে বুঝেছে। একটু না নড়ে, তেমনি মাথা রডে রেখে, ঠাণ্ডা নিস্তাপ গলায় সুমন্ত আমাকে বলল, 'কাল রাতে নিতাই আত্মহত্যা করেছে।'

পাথর হয়ে গেলাম।

রাত্রির বাসন ঘিরে এক উঠোন কাক। কা কা করে সব উড়ে গিয়ে কলতলা পরিষ্কার হয়ে গেল। দেয়াল টপকে একটা বেড়াল উঠোনে নামল।

নিতাই আত্মহত্যা করেছে, আমার কী তাতে!

দেয়াল ধরে আচ্ছন্নের মতো বললাম, 'সুমন্ত আমরা ওকে খুন করেছি!'

ভোরের ফাঁকা একতলায় সুমন্ত আর আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ক্রাচে লাথি মেরে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়ে নিতাই ঝুলছে খিদিরপুরের এক ঘরে। খিদিরপুরের ঘরের বাইরে ফুলের কেয়ারিতে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিতাইয়ের দুটো চোখ আমাদের জরিপ করছে। মরা মুখ বলছে, 'যে প্রতারণা তোমরা করলে, তোমরা যারা সুমন্ত অদিতি গুপিন সরলা, তার দায় আমি শোধ করলাম।'

নিতাই চলে গেল। ওকে মেরেছি আমরা। আমরা ওকে খুন করেছি। চক্রাকারে আমার মাথায় এই এক কথা ঘুরতে লাগল। এই এক কথা আমার শরীরে থর থর করে কাঁপতে লাগল। চক্রাকার কথা ঘুরল। মমির নীরব বড়ো বড়ো চোখে কথা থামল। 'এ আমি অনেকদিন থেকে জানতাম অদিতি। নিতাইকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম. তুই দিলি না। না-না-না-না!' চক্রাকার কথা ঘুরল। 'তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম অদিতি, রাখতে পারলে না। মাঝ থেকে নিতাইটা মরল!' মেসোমশায় হাঁটতে থাকলেন। 'বেচারা বোকা নিতাই!' সুপ্রিয়া হেসে গড়িয়ে পড়ল।

এমনি সবাই। সবাই দেখাবে। এমনি সবাই আমাকে দেখাবে। এমনি সবাই আমাকে দেখাবে—নিতাইকে আমি খুন করেছি। এ হত না, কাল

দুপুরে আমি ঘুমিয়ে পড়লে এ হত না। কাল দুপুরে রীনার পাশে আমি ঘুমিয়ে পড়লে এ হত না। কাল দুপুরে রীনার পাশে আমি ঘুমিয়ে পড়লে আজ নিতাই এ প্রতিশোধ নিতে পারত না। আমার সব শেষ হয়ে গেল। সব। স্কুল, হোস্টেল, মমি, মমিদের বাড়ি, আমার মুখ। আমি আর মুখ দেখাতে পারব না। কোথাও আমার জায়গা নেই। কোথাও আমার মুখ ঢাকবার জায়গা নেই। দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লাম। অদ্ভুত একটা নিঃসঙ্গতা আমায় আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা শীতল করে দিতে লাগল। দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি ভেঙে বসে পড়েছিলাম। সুমন্তই নিশ্চয় আমায় বসিয়ে দিয়েছিল। জানালার পাশে বসার কিছু ছিল না। সুমন্তই আমায় নিশ্চয় দুহাতে জড়িয়ে ধরে জানালার থেকে সরিয়ে এনে এখানে বসিয়ে দিয়েছিল। সুমন্ত আমায় সান্ত্বনায় যেন বলছিল, 'কেন ভাবছ! আমি তো আছি। এ কিছু নয়। চলো বাইরে চলো। মমিদের ওখানে চলো। আমিও ওখানে যাচ্ছি। তুমিও চলো। নিতাই মমিকে একটা চিঠি রেখে গেছে। আমি দেখেছি। থানার লোক মমিদের বাড়ি চিঠি নিয়ে যাচ্ছে। আমিও যাচ্ছি। তুমিও চলো।'

ওপরে এসে শুয়ে পড়েছিলাম। আমার মুখ ছিল মাদার গাছটার দিকে। আম গাছটায় কিচির মিচির শুরু হয়েছিল।

আজও যখনই আমার জানালার পাশে মাদার গাছটায় কাক চড়ুইছানা ধরে, আমি সেদিনের সেই মমিকে শুনতে পাই।

কাঁটায় ভর্তি গাছটার থোকা থোকা সবুজ পাতার আড়ালে সারাদিন কিচির মিচির, চড়ুইভাতি মাঝে মাঝে আর একটা আওয়াজ শোনা যায় চিঁ হি চিঁ হি। ভাঙা চেরা আওয়াজটা শেষের দিকে চাপা কান্নার মতো দু-একবার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে থেমে যায়। কাক চড়ুই ধরে। মমিও সেদিন খানিকপর নিশ্চয় থেমেছিল। মেসোমশায় আর থাকতে পারলেন না। নিশ্চয় ছুটে গিয়েছিলেন। সুমতি, ঠাকুর, রমেশ সব নিশ্চয়। শুধু আমি না। আমি যাই আমার এমন অবস্থা ছিল না। মমির মুখোমুখি দাঁড়াতে আমার সাহস ছিল না, আমার মনে পাপ ছিল। সুমন্ত এসেছিল আমায় ডাকতে আমি যাই নি।

এত ভোরে সুমন্ত গিয়ে যখন কড়া নেড়েছিল, কে তখন দরজা খুলে দিল? মেসোমশায়? রমেশ? ঠাকুর? সবাই এক জোটে? এ জানায় কোনো অর্থ নেই, তবু আমি ভাবি কে? আমার বুকে ভয়, আমার মাথা খালি, তাই এমনি নিরর্থ সব আমি ভাবি। ভাবি মেসোমশায়কে নিয়ে সুমন্ত বারান্দার শেষ মাথায়

স্লোপের ওদিকে চলে গিয়েছিল, আর মমি সুমতিকে ডাকছিল। ওঠার ক্ষমতা নেই, কী যেন বুঝতে পারছে, কারও সাড়া না পেয়ে বার বার শুধু ডাকছিল, 'সুমতি, কী হয়েছে ? তোমরা সব আসছ না কেন ? সুমতি ? রীনা ?'

কেউ এল না। ওরা সবাই তখন বসার ঘরে। চুপ করে দাঁড়িয়ে। মেসোমশায়ও ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে। মমির ডাক শুনছিলেন। কে বলবে মমিকে ? 'সুমতি !' চিৎকার করে মমি ডাকছে, আমি যেন শুনতে পাই।

আরও ভাবি, সব ভার তখন সুমন্তর। প্রথম থেকে সব ভার তো সুমন্তই নিয়েছিল। এই ভোরে ছুটে এসেছে, পাগল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। সব করছে। সুমন্ত নিশ্চয় বলেছিল, 'কাকাবাবু আপনি বসুন, আমি যাচ্ছি।' একদিন মমির সমস্ত দায়িত্ব সুমন্ত নেবে, এই তো ঠিক ছিল, সুমন্ত নিশ্চয়ই এগিয়ে যাবে, এই তো ঠিক।

সবাই অপেক্ষা করছে। ময়লা ভাঁজ করা নিতাইয়ের চিঠিটা পুলিশ ইনসপেক্টারের হাতে। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে চাইছে। একটা রিপোর্ট লিখতে হবে। নিজেই যেত, রুগ্না একটি মেয়ের মুখ চেয়ে সময় দিচ্ছে।

সুমন্ত গিয়ে মমির দরজায় দাঁড়াবে। কী তখন করছিল মমি ? নতুন কিছু আমি ভাবতে পারি না। হাতে চাড় দিয়ে বিছানা থামচে উঠতে চেষ্টা করল, আমার মনে এমনি সব আগের দেখা ছবি। দু-হাত দিয়ে যত্ন করে সুমন্ত ওকে বসাবে। যেন অনেক বছর আগেকার এক সুমন্ত বলবে, 'ঠিক হয়েছে মমি ? না সুমতিকে ডাকব ?'

সুমন্তর হাত ছাড়িয়ে মমি অস্থির হয়ে উঠবে, 'কী হয়েছে বলছ না কেন ? হঠাৎ তুমি এমন অসময়ে এখানে ?'

'বারে, আমার কী আসতে নেই ?' হালকা হতে গিয়ে সুমন্ত হাসল। খাটে ওর পাশে বসল, মমির চুলে হাত রাখল, 'তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন, মমি।'

'তোমরা কী যেন লুকোচ্ছ !' মমি শক্ত হয়ে বলল।

'কী যা তা ভাবছ, মমি !'

'তোমরা লুকোচ্ছ। তোমরা না বললেও আমি জানি।'

'কী যে ছেলেমানুষ তুমি মম্।' এবার ভয় সুমন্তর।

মমির দৃষ্টি অন্য কোথাও। সুমন্তকে আর দেখছে না। 'আমি জানি সে নেই !'

'তুমি থামবে মমি !' সুমন্ত চিৎকার করতে চাইছে।

'আমি জানতাম সে মারা গেছে !'

'মমি মমি!' সুমন্ত অন্ধ। কথা হাতড়ে মরছে সুমন্ত।

'জানতাম!'

সমস্ত চুপ।

এ জায়গায় এসে আমার দ্বিধা। ভাবনা আমার দু-পথ নেয়। মমি কি ভেঙে পড়ল? ঘরটা ফেটে গেল মমির আর্তনাদে? না নিঃস্পৃহ চোখে মমি সুমন্তর দিকে না তাকিয়ে চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বলেছিল, 'তুমি বেরিয়ে যাও।'

কান্না এল তারপর।

আমার ভাবনার এ দ্বিধা থেকে যায়। মাদার গাছটায় এক সময় সব পাখি থেমে যায়।

দিন যায়। মমিদের দিনও যায়। এমন যাওয়াই নিয়ম। একটু আধটু হাসিখুশি যা ওদের বাড়িতে ফিরে এসেছিল, তাও বন্ধ হল। এখন গুমোট। যে যার কাজ করে যায়। রমেশ আর ঠাকুর মাঝে মাঝে রান্না ঘরে বসে ফিসফিস করে, সুমন্তর এমনিতেই কথা কম, বাকি ওরা তিনজন আর আমি। আমি যাই যেন পা টিপে টিপে। না গেলে চোখে ঠেকবে, তাই যাই। কারো সঙ্গে ক্বচিৎ দেখা হয়, বিশেষ করে মমির সঙ্গে। যখনই যাই, ওর ঘরের দরজা দেয়া। স্বেচ্ছায় কিনা সে প্রশ্ন তুলি না। দোষ দেয়া বৃথা। সময় নিতে হবে। আস্থা ফিরে পেতে সময় চাই। মাঝে মাঝে ভাবি, না পেলেও চলে। মমিকে চাই।

রীনা প্রায় অদৃশ্য। খুব নাকি পড়ায় ব্যস্ত। সুমতি এড়ায়। বুঝি আমরা দুজনেই এক পাপে পাপী, একই গোপনতায়। সুমন্তর তো আমারই অবস্থা। তাছাড়া সুমন্ত টুরে। এক ওদের বাবা। আজকাল আমিই বুঝি মেসোমশায়ের একমাত্র অবলম্বন। আর লুকোচুরি, এখানেও। যেদিন দেখা হয় বলেন, 'ছেলেটার উপর বড্ড মায়া পড়ে গিয়েছিল। কী হতে কী যে হল।' বারান্দার এ মাথা ও মাথা করেন। আবার বলেন, 'শিক্ষার অভাব। বড্ড একগুঁয়ে ছিল। শিক্ষা পায় নি, তাই এই পরিণতি। মেয়েটা বড়ো আঘাত পেল।' দু-হাত পেছনে পায়চারি করেন। আবার মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছিল অদিতি, কিছু জান?' আমি কখনও চুপ করে থাকি, কখনও মাথা নাড়ি, 'না।'

আরো কিছুদিন পর। সুমন্ত ফিরে এসেছে। মমি কদিন থেকে আবার বাগানে বসতে শুরু করেছে। এত যে ঘটে গেল, বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। একে রোগা,

তায় এমন চাপা। পরিবর্তনের ছাপ পড়ে না। শুধু আজকাল যেন অনেক বেশি দায়িত্বশীল। বাবা রীনা ওদের সুবিধে অসুবিধে নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের মাঝে যদি বসে, থাকে ঠোঁট চেপে। না বললে নয় তবেই শুধু বলে। বসে বসে শার্টের বোতাম লাগায়, রীনার জামা সেলাই করে। সেলাইকল অকেজো পড়ে থাকে, কাজ করে হাতে। তারও বেশি চোখে পরে রীনাকে। রীনা, ঐ আবোলতাবোল রীনা একরাতে কেমন পাল্টে গেছে। যতটুকু সৌষ্ঠব রেখে যতটা সম্ভব দূরে, ততটাই মাত্র কথায় ও ব্যবহারে। আমাকে সুমন্তকে দেখে আর ছুটে আসে না। দূর থেকে কেমন আড়চোখে দেখে, চোখে চোখ পড়লে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। জিজ্ঞেস করলে বলে, 'পরীক্ষা এসে গেছে।'

মেসোমশায়ই কেবল হঠাৎ অনেক ব্যস্ত, অনেক চঞ্চল, তৎপর। আজকাল রোজই গাড়ি পাঠিয়ে সুপ্রিয়াকে আনিয়ে নেন, চুপিচুপি কী সব আলোচনা করেন। শহরের বড়ো বড়ো ডাক্তারের আনাগোনা আবার শুরু হয়েছে। মমি অনুযোগ করে, 'এ কী নতুন ঝামেলা শুরু করলে?'

মেসোমশায় স্নেহে হাসেন। 'নার্ভের পরিবর্তন আমি কী বুঝব? ও বুঝতে হলে ডাক্তারের প্রয়োজন। তাই ওদের ডাকতে হয় মমি।'

নতুন এক অর্থপিডিক ডাক্তার এসেছেন। নতুন চিকিৎসা হচ্ছে। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ার ডাক্তারও আসছেন। সারাদিন মমিকে নিয়ে টানাপোড়েন। বিকেলে থেরাপিস্ট এক্সারসাইজ মালিশ ইনজেকশন কত সব থাকে। বাইরের লোকের জায়গা কমই। সুপ্রিয়া সন্দীপবাবু, আরো সব থেরাপিস্ট। ওরা মমির ঘর জাঁকিয়ে থাকে। ট্রিটমেন্ট নিয়ে আলোচনা হয়। আমি ওখানে অপাঙক্তেয়। তাছাড়া সবচেয়ে যা বড়ো সত্য, মমি আমাকে চায় না।

এমনি করে মাসখানেক কাটার পর একদিন মমি আমায় আবার ডেকে পাঠাল। হোস্টেলে ফিরে, টুকিটাকি কাজ সেরে, ধীরে সুস্থে দেরি করে গেলাম। রীনা ও মমি বসে বসে ছবি আঁকছে। যেমনি আমরা সবাই ছেলেবেলায় ছবি এঁকেছি। জল, যার এপার ওপার নেই, অর্থাৎ পুরো স্লেট জুড়ে। অপার জলেও কিন্তু রাজহংস ঘোরে, নৌকা তো চলবেই। কাছেই তিনটে সুপুরি গাছ। দূরে স্লেটের অপর কোণে এক ঝোঁপ। বাঘ আঁকা মুশকিল। তাই বাঘ বেরোয় না। আর সুপুরি গাছের মাথায় এক আকাশ গোল চাঁদ। বাকি আকাশটা খালি খালি মাঠে মারা যাবে? তাই সেখানে পাখি ওড়ে কিন্তু রাত্তির যে? পাখি

কোথেকে ? রীনা বেজায় ভাবনায়। 'বাঁদুড় আঁকব দিদি ?' যাক, বাঁচোয়া। দুজনেই খুব হাসছে।

মমি পেন্সিল রেখে মুখ তুলে বলল, 'আজকাল আসিস না যে ?'

এক পাশে জায়গা করে নিলাম। 'তুই ব্যস্ত থাকিস তাই।'

ও ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, 'ভারি তো ব্যস্ত! সারাদিন খালি টানা হ্যাঁচড়া আর মালিশ। যাচ্ছেতাই। আমি আর রীনা কী ঠিক করেছি, জানিস ?' মুখ সামনে এনে যেন ভারি মজা, জানান দিল, 'পালাব। রোজ দুপুরে বেরিয়ে যাব। ডাক্তার আর থেরাপিস্ট এসে বসে থাকবে।' গালে হাত দিয়ে মমি দেখাল, 'এমনি করে। বেশ হবে।' মমি বেদম হাসছে।

অনেক আগের মমি যে কলেজ পালাত, তাকে যেন পেলাম। উৎসাহে যোগ দিলাম, 'আমিও স্কুল পালাব।'

রীনা লাফিয়ে উঠল, 'খুব মজা হবে।' মমি যেন নিজেই পা সরিয়ে আনল। নীচ থেকে পায়ের পাতা ঠিক করে বলল, 'বিকেলে কী করিস ?'

চমকে বললাম, 'মমি, পা যেন নড়ল ?'

কাপড় টেনে পা ঢেকে মমি প্রশ্ন এড়াল, 'ও কিছু না।'

বিশ্বেস হচ্ছে না। অনেকক্ষণ ধরে ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পাটাতনের উপর দু-পা স্থির পড়ে আছে, তেমনি নিঃসাড়। অকারণেই আমি বিচলিত হয়েছিলাম।

'আজ এক্সারসাইজ দিতে আসে নি ?'

'এসেছিল, চলে গেছে। বিকেলে কী করিস বললি না তো ?'

কী করি ? স্কুলের কাজ থাকে, তাই করি। সুমন্ত এলে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে হেদোয় যাই। চলে গেলে, হোস্টেলে চলে আসি। এই তো।

বললাম, 'কী আর করব ? স্কুলের কাজ থাকে, তাই করি। মাঝে মাঝে অরুণার সঙ্গে বেরুই। শনিবার রানাঘাট যাই। আর এখানেও তো আসি।'

একটা হাসির ওপিঠে কী থাকে, ভেবেছি। আরেকটা হাসি। দেখি নি। মমি দেখাল। তেমনি আরেকটা হাসি দিয়ে বলল, 'আমি একদিন তোর হোস্টেলে গিয়েছিলাম, অদিতি। আমি আর রীনা। পালানো শিখছি কিনা ? অরুণার সঙ্গে কথা হল। জানাল, বেড়াতে গেছিস। কাছেই তো ছিল। এমনিই ঘুরে এলাম হেদোয় সেদিন নামতে তো পারি নি। চারদিক খালি ঘুরেছি।'

আমি তখন মরে যাচ্ছি দেখে মমি বসে বসে হাসছিল। আরেকটা হাসি।

তারপর মমির চোখ আর আমার চোখ মুখোমুখি হল, ঘা খেয়ে জ্বলে উঠল। দুজনেই বুঝেছি।

রান্নাঘরের পেছনে ঠাকুর কয়লা ভাঙছে, খট খট খট খট। বাগানের কল থেকে জল গড়িয়ে গড়িয়ে একটানা একটা নষ্টের আওয়াজ তুলছে। আমাদের মনে মুখে তখন শ্রী চলে গেছে। জানি কেন মমি বিরক্ত। বলল, 'কল খুলে মালি চলে গেছে রীনা, রমেশকে বল কল বন্ধ করে দিতে। আর ঠাকুরকে বলে দিস শব্দ করে কয়লা না ভাঙতে।'

'ঠাকুরকে কিছু ভেজে দিতে বলব দিদি ?' রীনা ফিরে বলল।

মমি আমাকে দেখছে। ঠোঁটের এক কোণ বেঁকে গেল। 'তুই তো তা ছাড়া বেগুনিও খুব ভালোবাসিস, অদিতি। বলব ?'

খোঁটাটা এমন ভাবে না দিলেও পারত। কোন ভালোবাসার অনুষঙ্গ মমি যে আনতে চায় 'তা ছাড়া, বেগুনিও,' দুজনেই জানি। জানি কী প্রেমের মর্যাদায় মমির বিদ্রূপ। হোক, তা তবে অসহ্য হোক। এমন অভিমানে কে তবে দোষ দেবে ? আমার কী হল আমি জানি। প্রার্থনা করি মমিও যেন তা একদিন বুঝতে শেখে। পাল্টা আক্রোশে আঘাত দিতে পরিষ্কার বললাম, 'ঠাকুরকে বলে দে রীনা বেশি করে ভাজতে। হয়তো সুমন্তও এক্ষুনি এসে যাবে। আমি হোস্টেলে সুমন্তর জন্য খবর রেখে এসেছি।' তারপর রীনাকে ডেকে ওর আঁকা কাগজটায় ঝুঁকে পড়লাম, 'রীনা আয় তোর রাজহাঁস ঠিক করে দি।'

'আসছি' বলে রীনা ছুটে ঠাকুরকে খবর দিতে চলে গেল।

ঘরে মমি আর আমি। আমি গভীর মনোযোগে আঁকার ভান করছি। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। চোখে সব ঝাপসা। মুখ তেতে উঠেছে। সুমতি ধুনো হাতে ঢুকল। বাতি জ্বালিয়ে ধুনো দিয়ে চলে গেল। বাতির আলোয় ধুনোর ধোঁয়া জালি কেটে কেটে ওপরে উঠছে।

ধাঁ করে উঠে দাঁড়ালাম। পরিষ্কার হয়ে যাক। মমির দিকে সোজা তাকিয়ে বললাম, 'তুই আমাকে কেন ডেকেছিস মমি, আমি জানি। আরেকদিনও তুই ডেকেছিলি। সেদিন বলেছিলি, তুই কিছুই গুছিয়ে করতে পারিস না। আমাকে গুছিয়ে দিতে বলেছিলি। আমি কী করতে কী করেছি, সব জট পাকিয়ে ফেলেছি।'

জল লুকোতে মমি চোখ ঘুরিয়ে রেখেছে। আমার ঠোঁট কেটে যাচ্ছিল। কাঁদব না বলে দাঁতে ঠোঁট চেপে রেখেছি। কেউ কাউকে দেখছি না। দুজনেই ঝাপসা দেখছি।

রীনা এসে অবাক হয়ে গেল। 'এ কি অতুদি, বেগুনি খেয়ে গেলে না? আমি যে ভাজতে বলে এলাম।'

আমি তখন দরজায় পৌঁছে গেছি। দেয়ালের দিকে মুখ রেখে মমি শুধু বলছিল, 'আমার খাতাটা ফিরিয়ে দিয়ে যাস অদিতি।'

চলে এলাম। একদিন চলে আসতেই হত। নিজেই পা বাড়ালাম। অভ্যেসে দাঁড়িয়েছিল, ছেঁটে ফেলতে কতক্ষণ? তাছাড়া অজুহাত তো হাতের নাগালে। ঝড়ের মাস। আর এবারের ঝড়ের রূপও আলাদা। প্রস্তুতি চোখে পড়ে না, বিকেল এলেই তবু মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়। অসময়ে সূর্য ডোবে, উপরে দূরে মেঘ ডাকে, তারপরই প্রচণ্ড ঝড়। এ প্রায় নিত্যকার রূপ। সেদিন বিকেলে আবার শিলাবৃষ্টিও হল।

আরো সব আছে। ওরা সবাই এখন ব্যস্ত। সুমন্ত পারতপক্ষে বলে না, তবু খবর ঠিক পেয়ে যাই। মেসোমশায় ছুটি নিয়েছেন। বাড়ি আর হাসপাতাল করছেন। যেন পুরনো দিনের মেসোমশায়কে আবার দেখি, মিতবাক্, ঋজু, সংকল্পে স্থির। উত্তেজনায় কারো আর কারো দিকে তাকানোর সময় নেই। আশা আশঙ্কায় আত্মস্থ সবাই। ডাক্তার এসে গেছেন অস্ট্রেলিয়া থেকে। অপারেশান নাকি যে কোনো দিন। সেদিন মাইলোগ্রাম না কী যেন ছিল। সুমন্ত সেদিন আসে নি। পথ চেয়ে চেয়ে আমার তখন কী দুর্ভাবনা। ভাবছিলাম আবার ডায়মণ্ড-হারবারের কথা। কী হত যদি সুমন্তরই তেমন কিছু হত। মমিও লিখেছিল, কী আর হত! মমি নাকি খুব কষ্ট পেয়েছিল। কী নাকি ওরা খুঁজে পেয়েছে মমির। শিরদাঁড়ায় চারবার সুঁচ ফুটিয়েছে। তবেই না কি পেয়েছে খুব এক কাজের স্পট্। ওখানটায়ই নাকি মমি থেমে রয়েছে। ভারটিব্রার ভাঙা হাড় স্পাইনাল কর্ডে চেপে মোটর নার্ভ আর সেন্সর নার্ভের চলাচল ওখানটায় নাকি আটকে আছে। ওখানটায়-ই নাকি মমি আর হাঁটে না, নড়ে না। সুমন্তর মুখে শুনছিলাম ডাক্তারের মন্তব্য, 'ওয়েল, উই শুড ট্রাই। গুড্ চান্সেস আর দেয়ার, দেন লাক।' ডাক্তার নাকি হাত কপালে ঠেকিয়েছিলেন। রোমান ক্যাথলিক নিশ্চয় ডাক্তার।

বিকেল না পড়তেই সুমন্ত সেদিন জানাল আজ তাকে একটু আগে যেতে হবে। সন্ধেয় ছাড়াছাড়ি হতে রোজই কোথায় যায় জানি। জানি বলেই জিজ্ঞেস

করি না কোথায়। সেদিনের ব্যতিক্রম আমাকে অসাবধান করেছিল। প্রশ্ন করলাম, 'কোথায়?' জানলাম মমি হাসপাতালে। অপারেশান শুক্রবার। শুনলাম মঙ্গল, বুধ, বেস্পতি, শুক্র। আজ থেকে চারদিনের মাথায়। আজ আমি যেতে চাইতাম। সুমন্ত চলে যেতে এ কথাটাই বারবার মনে এল, মমির জীবনে এতবড়ো তোলপাড় আর তার থেকে আজ আমি-ই বাদ। এ ভাবা যায় না! যা ভাবা যায় না, আজ আমি মমি সুমন্ত তারই শিকার। আজ আমি যেতে চাইতাম, তবু সুমন্ত ডাকতে পারে না, আর আমি মুখ ফুটে বলতে পারি না। নিজেকে কেমন অসহায় মনে হচ্ছিল, মমিকে দোষী আর সুমন্তকে মনে হচ্ছিল নিতান্তই বাইরের বাধা। আবার শুনলাম। মাত্র চারদিন বাদে, শুক্রবার সকাল।

সকালেই এসব হয়। অপারেশন, ফাঁসি, এসব। আমার অ্যাপেনডিক্স্ অপারেশনও সকালেই হয়েছিল। পুরো রাত ঘুমুতে পারি নি। বারোটা, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে সব গুনছিলাম। চারটের পর আস্তে আস্তে ফর্সা হতে লাগল। নার্সদের ঘোরাঘুরি শুরু হল। একতলায় শুয়েছিলাম। তাই সব রকম আওয়াজই শুনতে পাচ্ছিলাম। কানে ঘা দিয়ে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল। বুক ধড়াস করে উঠল, ডাক্তার এসে গেছে। গলা কাটা হয়েছে কিন্তু ফাঁসি হয় নি। ভয় একই দুইয়ে। শুধু অপারেশনে দ্বন্দ্ব, ফাঁসিতে নিশ্চয়।

সারারাত ঘুমে কি জেগে ঠিক বুঝতে পারি নি। ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বিছানায় গিয়েছিলামও অনেক দেরি করে। দুদিন থেকে সুমন্তর জ্বর। অসুখে সুমন্ত বড্ড অবুঝ, ওষুধ ছোঁবে না। কী সব আকাশ পাতাল ভাবছিলাম, কেন এমন ছন্নছাড়া। ঘুম আসছিল না। ভোরের দিকে শুধু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুমিয়ে একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। অনেক দিন পর মমির সঙ্গে দেখা। মমি এসে বলল, 'অদিতি মনে আছে?' 'সে কোন কবেকার কথা,' আমি বললাম। 'কী যায় আসে তাতে?'

মমি হাসছে। ওর মুখ ফোকলা, গাল ঝুলে গেছে, হাসিতে মাংস থেঁতলে যাচ্ছে। দেখে আমি হাসছি। মমিও হাসছে, 'আমরা দুজন থুথুরে দুই বুড়ি হয়ে গেছি অদিতি।' হাসতে হাসতে দুজনেই আমরা গড়িয়ে পড়ছি। হাত, বুক, পা দুজনের জড়িয়ে যাচ্ছে। 'আমাদের ছাড়াছাড়ির আর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে কথা হচ্ছে, দুই বুড়িতে বসে বসে চিনেবাদাম খাচ্ছি,' মমি বলছে। ওদিকে দাঁত নেই! কথা শেষ করতে পারল না। গড়াচ্ছে।...

ধড়ফড়িয়ে উঠেছি। উঠতে অনেক দেরি হয়ে গেল। মমি না জানি কেমন আছে? আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এক্ষুনি হয়তো অপারেশন হবে। হয়তো হচ্ছে। মোক্ষদা চা দিয়ে গিয়েছিল কিনা, তাও দেখি নি। মিটারটা দেখি নি। কত দিয়েছি ট্যাক্সিকে তাও দেখি নি। নেমে আট নম্বর বিল্ডিং-এর দিকে ছুটছি। সুমন্তর জ্বর, সুমন্ত আসবে না, সুমন্তর কাছে কালই জেনে নিয়েছি। আসব যে কালই ভেবেছি।

দূর থেকে বারান্দায় রীনাকে দেখতে পেয়েছি। মেসোমশায় পাশে। সুমন্ত নেই। থাকবে না জানি। হয়তো সিঁড়িতে দ্বিধায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম, হয়তো ওরাও আমায় দেখে কেমন হয়ে গিয়েছিল বলে। রীনা আমার দিকে বড়ো চোখ করে চেয়েছিল। তাকিয়ে থাকতে দেখে ওর পাশে বসলাম। কাঁধে হাত রাখলাম। রীনা নড়ল না। মেসোমশায় চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ছিলেন। সুমতি চুপ করে ছিল। সুমতির কাছে এক মহিলাকে ঘিরে কারা পাঁচ-ছজন কাঁদছে। আরো অনেকে চারদিকে। সুপ্রিয়া নেই। নিশ্চয় অপারেশন থিয়েটারে। সাতটায় অপারেশন শুরুর কথা, এখন পৌনে আট। সুমন্ত এলে ভালো ছিল। নিশ্চয় জ্বর ছাড়ে নি। বসে ভাবছি। শাদা কাপড়ে ঢাকা স্ট্রেচার নিয়ে চারজনে ওপর থেকে নামছে। ঝট করে রীনা উঠে দাঁড়াল। মেসোমশায় তেমনি চোখ বুজে পড়ে আছেন। স্ট্রেচার নিয়ে কথা বলতে বলতে ওরা মাঠে নেমে গেল। বুকের ধ্বক ধ্বক কমতে উঠে পায়চারি করতে লাগলাম। সুমন্ত এলে ভালো ছিল। নিশ্চয় জ্বরটা বেড়েছে।

একসময় কখন জানি ওপরে উঠে এলাম। সামনে কাচে ঘেরা মস্ত ঘর। রেলিং-এ হেলান দিয়ে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে আছি। ভেতরে কজন থাকে? সরু টেবিলের ওপর সিলিং-এ ঝোলানো মস্ত গোল আলো। নীচে শাদা অ্যাপ্রনে শরীর মোড়া, শাদা টুপি, শাদা কাপড়ে মুখ ঢাকা, দস্তানায় দু-হাত, হাতে ছুরি, চামড়া মেদে মাংসে লম্বালম্বি ফালি টানা, চারদিকে অনেক হাত। উপুড় করা উলঙ্গ মমিতে এখন হিজিবিজি আঁচড় কাটা, কিছু হলে কী হয়? সরু টেবিলেই উল্টে নেয়? শাদা কাপড়ে ঢেকে দেয়? শব্দে চমকালাম। শব্দ, হাত হাড়। কিসের আওয়াজ? ভাঙছে। কী ভাঙছে? মেরুদণ্ড? মমির হাড়? অসহ্য। থাকতে পারলাম না। নীচে ছুটে চলে এলাম।

সুমন্ত এল না। রীনা সিঁড়িতে। সিঁড়ির নীচে চাতাল, পরপর দুটো

অ্যাম্বুলেন্স চাতালে এল। থামল, দুজন নামল, দরজা খুলল। এক মহিলা অ্যাম্বুলেন্স থেকে আছড়ে এসে নীচে পড়ল। স্ট্রেচারে কাকে নামিয়ে নিয়ে দুজন ওদিকের বিল্ডিং-এ গিয়ে ঢুকল। মহিলা উঠল, পিছন পিছন চলল। কে মহিলা ? কেমন ছিলেন দেখতে ? গেট অবধি দেখা যায়। লোক আসে যায়। পায়চারি করছি। চেয়ারের মাথায় মাথা রেখে মেসোমশায় তেমনি চোখ বুজে আছেন। রোদের ঝাঁঝ চিবুকে গলায়। দিনের প্রথম রোদ। রোদ ওদিকেও। সুমতির পায়ে। সুমতির পায়ের কাছে ওরা কাঁদছে। মাঝখানে এক মহিলা কাপড় ঢাকা।

উপরে যাব আবার ? সিঁড়ির মাথায় কে ও রানা ? সুপ্রিয়া ? না। দুজন ডাক্তার। মুখ নাড়ছে। স্টেথোসকোপ দোলাতে দোলাতে নীচে নামছে। হুড়মুড় করে ওদের ধাক্কা মেরে সুপ্রিয়া ছুটে নেমে এল। ওর শাদা অ্যাপ্রন রুমাল উড়ছে। ও হাঁপাচ্ছে।

'আপটু টো মমির ব্লাড সারকুলেশন হচ্ছে, মমি ভালো হয়ে যাবে !'

মেসোমশায় উঠে দাঁড়ালেন। গলার কোঁচকানো চামড়া থরথর করে কাঁপছে। হাত বাড়িয়ে রাখলেন। কী যেন চাইছেন।

সুপ্রিয়া ছুটে গিয়ে মেসোমশায়কে জড়িয়ে ধরল।

কী ভাবছে কে ? জানি না। কিন্তু এ জানি যে আমি বসে আছি। আমি আছি। সুপ্রিয়াকে দেখছি। মেসোমশায়কে ধরে আছে সুপ্রিয়া। রানা ছুটছে। কেন ? জানি না। সুমতিও উঠে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ আমার ভেতরটা ছটফটিয়ে উঠল। কোথায় একটা মাদার গাছ থেকে একঝাঁক পাখি উড়ে গেল। মমি ভালো হয়ে যাবে। মমি ভালো হয়ে গেছে। আপটু টো ব্লাড চলছে। মমির আজ যা কিছু ভালো যা কিছু সুস্থ, এ-জানা আমার শিরায় শিরায় ছলকে ছলকে উঠছে। আমার ভেতর তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। কী করে যে দুজনের মাঝে ব্যবধান, মন নিয়ে ছেদ, নাড়ীতে নাড়ীতে বিস্বাদ এক লহমায় নাকচ হয়ে যায়, কী করে আমি তা আগে থেকে বুঝব ? আমার গলার নীচে কণ্ঠায় যে কথাটা এখন আটকে আছে, আমার শ্বাসরুদ্ধ করে দিচ্ছে, তা মমি ভালো হয়ে যাবে, মমি ভালো হয়ে গেছে। কাউকে এ কথা চিৎকার করে বিশ্বাসে সোচ্চার হয়ে না বলতে পারলে, আমার আর স্বস্তি নেই। আমার দম আটকে যাবে। সমস্ত শরীরে নাড়া দিয়ে আমার আগ্রহ যেন স্থির থাকতে পারবে না। হাসপাতাল, এই চিলতে বেঞ্চি, অনেকগুলো সিঁড়ির পাদানিতে

রাস্তা, সিঁড়ি স্বর সব পেরিয়ে যেন আমাকে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে, অথচ আমি ঠিক তেমনি একঠায় এই কাঠের পাটাতনে বসে আছি। শুধু আঙুল গুলো খুলছে, বুজছে পায়ের নীচে মাটি সরছে, চলছে। কোথাও কাউকে বলার জন্যে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

কখন একসময় আমি উঠে দাঁড়িয়েছি। যত তাড়াতাড়ি ভাবা যায়, বা ক্ষণমুহূর্তে যা ভাবা না যায় তার চাইতে দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেছি। নীচে থেকে সে উঠে আসছে। আমি জানতাম সে আসবে। ঠিক সময়ের সন্ধিক্ষণে সিঁড়ির নীচ থেকে সে আর সিঁড়ির ওপর থেকে আমি ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে সেই অন্তরঙ্গ কথা যা আমার একান্ত প্রিয়জনের যা মমির মমতার মর্মবাণী, আর আমার রুদ্ধশ্বাস তার মুক্ত বিনিময়ে সব বলিয়ে নেয়। আমায় বাঁচিয়ে দেয়। সিঁড়ির একধাপ নীচে দাঁড়ানো সুমন্তর মাথা আমার মাথার সমান, আমার সমস্ত মাধ্যাকর্ষণ এখন সুমন্তর শরীরে, দুই বাহু ওর কাঁধের দু-পাশে, সুমন্ত দু-হাতে আমায় সোজা করে দিচ্ছে। ওর বুক আমার আরো কাছে ঘেঁষে আসছে। আমার বুক ঠেলে কথা বেরিয়ে আসছে। কথা শেষ করার জন্য নয়, কথার বেশি কিছু শুরু করার জন্য যেমন আমি এখন সুমন্তর শরীরে ভার সমর্পিত। এ সমর্পণ না ভেঙে যায়, আমি চোখ বুজে আছি। সুমন্তর গলা জড়িয়ে আমার দু-হাত থর থর করে কাঁপছে। আমার অনুচ্চারিত কথা সে ঠিক বুঝতে পেরেছে। আমাকে আবরণে জড়িয়ে ধরেছে, কাছে টেনে নিচ্ছে। এ ছোঁয়ায় আগুনের তরল। আমার দেহমন গালিয়ে দিচ্ছে, সব ভাসিয়ে দিচ্ছে। আমি ভেসে যাচ্ছি। মমি ভেসে যাচ্ছে। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। যেমনি ছেলেবেলায় কাগজের নৌকো ভাসাতাম, নৌকো ভেসে যেত, দূরে মিলিয়ে যেত। মমি, হাসপাতাল, সিঁড়ি, পথ, স্বর সব সরে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে যেন বহুদূর কোনো অন্ধকারে আমি আর সুমন্ত একান্ত একাত্ম্যে হাতড়িয়ে চলেছি। একধাপ ওপরে দাঁড়ানো আমার ললাট, ঠোঁট, বুক, জঙ্ঘা উরু সুমন্তর শরীরে মিশে যাচ্ছে। ওর ঠোঁট আমার ঠোঁটের ফাঁকে, চওড়া বুক আমার স্তন ঢেকে দিয়েছে, ওর শরীরের তলায় আমার দুপা একবার ছটফটিয়ে উঠল, নিবিড় করে চেপে ধরল। সে আমাব আচ্ছাদন, অভিসার, অন্ত।